SKETCHES OF ORISSA

OR

AN ETHNOGRAPHICAL STUDY OF ORISSA.

"FACT DRAPED WITH FICTION."

JATEENDRA MOHAN SINHA.

MEMBER, BENGAL PROVINCIAL CIVIL SERVICE ;
LATE ASSISTANT SETTLEMENT OFFICER,
ORISSA ; AUTHOR OF "SAKAR-
O-NIRAKAR-TATTWA-
BICHAR."

CALCUTTA :

1903

উড়িষ্যার চিত্র।

(উপন্যাস)

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ
প্রণীত।

"*That statement only is fit to be made public,*
which you have come at in attempting
to satisfy your own curiosity."

—EMERSON.

কলিকাতা,
সন ১৩১০ সাল।

মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র

ভূমিকা।

১৮৯২ সালের এপ্রিল মাসে যখন রাজকার্য্যোপলক্ষে প্রথম উড়িষ্যায় যাইতে বাধ্য হই, তখন নিজকে নির্ব্বাসিতের ন্যায় নিতান্ত দুর্ভাগ্য মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু সেই মনোমুগ্ধকর প্রদেশে অধিকদিন বাস করিতে গিয়া, তাদৃশ মনের ভাব বেশী দিন থাকিল না। তাহার পরবর্ত্তী সাত বৎসর কাল উড়িষ্যার নানা স্থানে অবস্থান করিয়া, সেই দেশের প্রতি মমতাকৃষ্ট হইয়া পড়িলাম। এমন কি, সর্ব্বশেষে উড়িষ্যা পরিত্যাগ করিবার দিন, নিতান্ত দুঃখিত-হৃদয়ে সে দেশের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলাম।

এই সাত বৎসরে নানাস্থান দেখিয়াশুনিয়া ও বহুবিধ লোকের সহিত আলাপ ব্যবহার দ্বারা আমার নোট-বুকে অনেকগুলি তথ্যসংগ্রহ করিয়াছিলাম। আমার আত্মীয় ও সাহিত্যানুরাগী বন্ধু শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র বসু (ইনি এখন যশোহরে উকীল) তাহার কতকগুলি দেখিয়া আমাকে বিশেষ উৎসাহিত করেন। পরে মনে হইল, এগুলি দিয়া কি করিব? একজন বন্ধু পরামর্শ দিলেন—"উড়িষ্যার একখানি ইতিহাস লেখ।" কিন্তু আমি ত উড়িষ্যার প্রাচীন কাহিনী সংগ্রহ করি নাই, কেবল বর্ত্তমান সময়ের কতক কতক বিবরণ যাহা নিজ চক্ষে দেখিয়াছি, তাহাই সংগ্রহ করিয়াছি। সুতরাং তাঁহার সেই পরামর্শ নামঞ্জুর করিলাম। পরে উড়িষ্যার একটী চিত্র লিখিয়া কোন এক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত করিলাম। সেই চিত্রটী প্রখরদৃষ্টি-সম্পন্না ভারতী-সম্পাদিকা শ্রীমতী সরলাদেবীর সানুকম্প দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরে তাঁহারই অনুরোধে, উদ্যোগে ও উৎসাহে এই চিত্রাবলী ক্রমশঃ রচিত হইয়াছে।

এই সকল চিত্রে উড়িষ্যার বর্ত্তমান সময়ের অবস্থা সকল যতদূর সম্ভব অবিকল অঙ্কিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। চরিত্রগুলির মধ্যে কয়েকটী বাস্তব নর-নারীর প্রতিকৃতি, আর কয়েকটী আমার কল্পনা-প্রসূত, কিন্তু তাহাদের উপাদান সত্যমূলক। যে বন্ধু আমাকে ইতিহাস লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন তাঁহার সান্ত্বনার জন্য বলি, সমাজের যথাতথ চিত্র যদি ইতিহাসের অঙ্গ হয়, তবে এ গ্রন্থও উড়িষ্যার বর্ত্তমান সময়ের ইতিহাস-প্রণয়ন পক্ষে সহায়তা করিবে, আশা করি। এই হিসাবে সমাজ-চিত্র-বহুল উপন্যাসকে ভবিষ্যৎ ইতিহাসের পথ-প্রদর্শক বলা যাইতে পারে।

মদীয় উৎকলবাসী বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু রাজকিশোর দাস বি. এল. ডেপুটী কালেক্টর মহোদয় আমাকে উড়িষ্যার আচার-ব্যবহার-ঘটিত অনেক বিবরণ প্রদান করিয়া উপকৃত করিয়াছেন। সাহিত্যরথী সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন এই পুস্তকের মুদ্রাঙ্কনবিষয়ে ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

পরিশেষে সানুনয় নিবেদন, উড়িষ্যা আমার জন্মস্থান নহে। অনেক স্থলেই অন্যের নিকট শুনিয়া আমাকে বিবরণ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। সুতরাং ইহাতে আমার ভুল-ভ্রান্তি হওয়া আশ্চর্য্য নহে। এরূপ কোন ভুল-ভ্রান্তি কেহ দেখিলে আমাকে অনুগ্রহ-পূর্ব্বক জানাইবেন, আমি তাহা সংশোধন করিতে যত্নশীল হইব।

মাণিকগঞ্জ,
৪ঠা আশ্বিন, ১৩১০। } শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

উড়িষ্যার চিত্র।

প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

নীলকণ্ঠপুর।

খোড়দহ বা খুড়দহ পুরী জেলার একটী মহকুমা। এই দেশটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈলমালা-সমাকীর্ণ; সেজন্য ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বড়ই মনোরম। সেই ছোট ছোট পাহাড়গুলি প্রায়ই বনে আবৃত; এই জন্য দূর হইতে গাঢ় নীলবর্ণ দেখায়। যখন চারি দিকের ক্ষেত্রসকল শ্যামল-শস্যরাশিতে পরিপূর্ণ থাকে, তখন এই সকল পাহাড় দেখিয়া দূর হইতে মনে হয়, ইহারা কাহার ঢেউ?—নীল আকাশের ঢেউ, না সেই শ্যামল-শস্যরাশির ঢেউ?

খোড়দহ মহকুমার পূর্ব্ব প্রান্তে এইরূপ একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের পাদদেশে নীলকণ্ঠপুর গ্রাম অবস্থিত। গ্রামটীর দক্ষিণাংশ নিবিড় জঙ্গলে আবৃত, তাহার মধ্যস্থলে সেই ক্ষুদ্র পাহাড়টী মস্তক উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে। জঙ্গলের উত্তরে, গ্রামের মধ্যস্থলে সুবিস্তৃত ক্ষেত্ররাজি; এবং তাহার উত্তরে, গ্রামের পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত বসতি বা "বস্তি"। বাসগৃহসকলের চারিদিকে বিরল-সন্নিবিষ্ট দুই চারিটী আম, বাঁশ, তাল, তেঁতুল গাছ। মাঠ হইতে গ্রামে প্রবেশ করিবার পথে একটী প্রকাণ্ড বটগাছ; তাহার তলে একটী সিন্দূরলিপ্ত প্রস্তর-মূর্ত্তি বিরাজমান রহিয়াছেন। এটী গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা "বটমঙ্গলার" মূর্ত্তি।

গ্রামের গৃহগুলির সন্নিবেশ সম্বন্ধে বাঙ্গালীর চক্ষে একটু নূতনত্ব আছে। উড়িষ্যার একটী গ্রাম যেন সহরের একটী ক্ষুদ্র গলি। প্রত্যেক গ্রামের মধ্য দিয়া একটী রাস্তা বা গলি আছে, তাহাকে "রাজদাণ্ড" বা "গ্রামদাণ্ড" বলে। ঘরগুলি তাহার দুই পার্শ্বে এরূপভাবে পরস্পর সংলগ্ন হইয়া চলিয়াছে যে, এক ব্যক্তির বাড়ী কোথায় শেষ হইয়াছে ও অন্যের বাড়ী কোথায় আরম্ভ হইয়াছে, তাহা স্থির করা দুরূহ। তবে প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীর সম্মুখে একটী সদর দরজা আছে বলিয়া তাহা বুঝা যায়। এই গ্রামের "রাজদাণ্ড"টীর পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে আর একটী শাখা "দাণ্ড" বাহির হইয়া উত্তর দিকে গিয়াছে; কিন্তু বেশী দূরে যায় নাই, ২।৪ খানা বাড়ীর পরেই শেষ হইয়াছে। গ্রামদাণ্ডের মধ্যস্থলে এবং গ্রামবসতিরও প্রায় মধ্যস্থলে একখানি ক্ষুদ্র কুটীর; ইহা গ্রামবাসিগণের "ভাগবত-ঘর"। এই ঘরে প্রত্যহ সন্ধ্যার পর ভাগবত পাঠ শুনিবার জন্য এবং আবশ্যকমত পরচর্চ্চা করিবার জন্য গ্রামের লোকেরা মিলিত হইয়া থাকে। যে গ্রামে অন্ততঃ একখানি ভাগবত-ঘর নাই, তাহা গ্রামের মধ্যেই গণ্য নহে। এই গ্রামের প্রায় সমস্ত ঘরগুলিরই মাটীর দেওয়াল ও খড়ের ছাউনি।

নীলকণ্ঠপুর গ্রামে প্রায় একশত ঘর লোকের বাস। তাহার মধ্যে

চারি ঘর "ব্রাহ্মণ," দুই ঘর "করণ," সাত ঘর "গউড়," দুই ঘর "তেলী," এক ঘর "ভাণ্ডারি," দুই ঘর "বঢ়ই," এক ঘর "ধোপা," আর অবশিষ্ট প্রায় সকলেই "খণ্ডাইত" এবং "চাষা" বা "তসা"। ব্রাহ্মণের ব্যবসায় পৌরহিত্য ও ঠাকুর-সেবা। করণের ব্যবসায় লেখাপড়া করা, সাধারণতঃ জমিদার ও মহাজনের গোমস্তাগিরি ও অন্যান্য চাকরি। করণ জাতি বাঙ্গালার কায়স্থের অনুরূপ। গউড়ের ব্যবসায় দধিদুগ্ধের কারবার, গরু মহিষ-চরাণ এবং পাল্কী-"কান্ধান"। অনেক সময়ে, বিশেষতঃ বিদেশে ইহারা চাকরের কাজও করে। কিন্তু "ভাণ্ডারি" বা নাপিতেরই তাহা প্রকৃত ব্যবসায়, অবশ্য ক্ষৌরকার্য্য বাদে। বঢ়ই জাতি ব্যবসায়ে সূত্রধর ও লোহার কামার; হয়ত এক ভাই লোহার কাজ করে, আর এক ভাই কাঠের কাজ করে। এইরূপে রজকেরও দুইটী ব্যবসায়, যথা কাপড় ধোয়া ও কাঠ চেরা। জ্বালানি কাঠের জন্য একটী আমগাছ কাটিতে হইলে, যদিও অন্য জাতি তাহার মূল ও ডাল ছেদন করিতে পারিবে কিন্তু তাহা চিরিতে হইলে রজকের শরণাপন্ন হইতে হইবে। ধোপা ভিন্ন অন্য জাতি তাহা করিলে তাহার জাতি যাইবে। উড়িষ্যার এই সকল জাতি-গত ব্যবসায়ের বড়ই কড়াকড়ি নিয়ম; এক জাতি অন্য জাতির ব্যবসায় অবলম্বন করিলে জাতিচ্যুত হয়। তবে আজকাল এই নিয়ম অনেকটা শিথিল হইয়াছে।

"খণ্ডাইত" শব্দ "খণ্ডা" বা খাঁড়া (খড়্গ) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই জাতি এক সময়ে, বোধ হয় মারাট্টাদের আমলে, যুদ্ধব্যবসায়ী ছিল। কিন্তু তাহারা অনেক দিন হইল, সেই খণ্ডা ভাঙ্গিয়া লাঙ্গলের ফাল গড়াইয়াছে। এখন ইহাদের অধিকাংশই কৃষিজীবী; তবে যাহাদের বেশী টাকাকড়ি হয়, তাহারা করণের সঙ্গে বিবাহাদি সম্বন্ধ দ্বারা ক্রমে করণ জাতিতে উন্নীত হইতে পারে। যখন খণ্ডাইত থাকে তখন ইহাদের মধ্যে বিধবা বিবাহ চলে, পরে করণ হইলে তাহা রহিত হইয়া যায়।

উল্লিখিত জাতি ছাড়া, এ গ্রামের দক্ষিণ ভাগে মাঠের দিকে আরও কয়েক ঘর লোক আছে। তাহার মধ্যে এক ঘর জাতিতে "কণ্ড্রা"—ইহাদের ব্যবসা চৌকিদারী ও সুযোগ পাইলে চুরি। (তবে সকল কণ্ড্রাই চোর, এ কথা আমি বলি না)। অন্য দুই ঘর "বাউরী"; ইহারা "মূল লাগার"—অর্থাৎ মজুরি খাটিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। সাধারণতঃ প্রতিদিন /০ আনা কি /১০ আনা কিংবা সেই মূল্যের ধান্য পাইয়া মজুরি খাটে। আর দুই ঘর "চামার"। চামার জাতির ব্যবসায় জুতা-সেলাই নহে; উড়িষ্যায় তাহা মুচির কাজ। চামার জাতি তালগাছ ও খেজুরগাছের কারবার করে। তালগাছের কারবার অর্থে তালপাতা কাটিয়া, তাহা দিয়া "টাটী" প্রস্তুত করা ও অন্য কাজের জন্য তালপাতা বিক্রয় করা। খেজুরগাছের কারবার অর্থে খেজুরগাছের রস বাহির করিয়া, তাড়ি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করা। খেজুরের রসে যে গুড় হইতে পারে, তাহা উড়িষ্যায় আকাশকুসুমের ন্যায় অবিশ্বাস্য কথা। সেই তাড়িকে মদ বলে। এই খেজুরগাছ সম্বন্ধে উড়িষ্যায় একটী খুব কল্যাণকর সংস্কার আছে। বাস্তবিকই উড়িষ্যাবাসীর নিকট "মদ্যমপেয়মদেয়মগ্রাহ্যং"। সেই জন্য ইহারা সেই মদের জন্মদাতা খেজুরগাছকেও বড় ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে। খেজুরের রস খাওয়া দূরে থাকুক, একটু উচ্চজাতীয় লোকে খেজুরগাছও ছুঁইতে রাজি হয় না। একজন ব্রাহ্মণের বাড়ীতে দৈবাৎ একটী খেজুরগাছ জন্মিলে, সে একজন "চামার" কি "বাউরীকে" পয়সা দিয়া ডাকিয়া আনিয়া, সেই গাছ কাটিয়া ফেলিলে, তবে তাহার নিস্তার। "চামার", "বাউরী", "কণ্ড্রা" ইহারা অস্পৃশ্য জাতি; ইহাদের ছুঁইলে, স্নান করিয়া শুচি হইতে হয়। এইজন্য ইহাদের ঘর অন্য লোকের বাসস্থান হইতে একটু দূরে। ধোপাও তথৈবচ।

* * * * *

চৈত্রমাস পড়িয়াছে। বসন্ত-সমাগমে নীলকণ্ঠপুর গ্রামের জঙ্গলে ও

পাহাড়ে নানা জাতীয় বনফুল ফুটিয়া চারি দিক্ উজ্জ্বল করিয়াছে। যে সকল গাছে ফুল হয় নাই, তাহারা নবপত্র-ভূষিত হইয়া ঋতুরাজের সম্মান রক্ষা করিতেছে। মলয়ানিল বনকুসুম-সৌরভ গায় মাখিয়া, বনে সঞ্চরণশীল কলাপিকুলের কেকাধ্বনি লইয়া, গ্রামের দিকে মন্দ মন্দ বহিতেছে। বেলা প্রায় এক প্রহর, কিন্তু ইহারই মধ্যে রৌদ্রের তেজ অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। রৌদ্রের প্রখর তেজে মাঠের ঘাস ঝলসিয়া, শুকাইয়া গিয়াছে। চারি দিকে পরিব্যাপ্ত বালুকাকণাসকল জলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় উত্তপ্ত হইয়াছে। গ্রামের প্রান্তভাগে বটবৃক্ষটী স্নিগ্ধশ্যামল কিশলয়চয়ে সজ্জিত হইয়া এক অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে—যেন সেই বটবৃক্ষের গাঢ় শ্যামবর্ণ রবিতাপে গলিয়া, ঝরিয়া পড়িয়া এই স্নিগ্ধশ্যামলবর্ণে পরিণত হইয়াছে। সদাঃপ্রস্ফুটিত-কুসুমসুকুমার সেই অভিনব সমুজ্জ্বল পত্ররাজি রবিকর-সম্পাতে অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া, তাড়িদালোকে সমুদ্ভাসিত নৃত্যশালা-সঞ্চরণশীলা ইংরেজরমণীর স্নিগ্ধোজ্জ্বল সাটিনের পরিচ্ছদকেও পরাভব করিয়াছে।

ইতিমধ্যে মৃদু পবন-হিল্লোলে সেই বটবৃক্ষের শাখা-প্রশাখা আন্দোলিত হওয়াতে, আলো ও ছায়ার নব নব সমাবেশে তাহার রূপ যেন উছলিয়া পড়িতে লাগিল। সেই পবন সঞ্চালনে, পার্শ্বস্থিত আম্রবৃক্ষের পরিণত মুকুল সকল ঝর্ ঝর্ করিয়া ঝরিয়া পড়িল; বাঁশগাছের পত্রভারনত অগ্রভাগ হেলিয়া দুলিয়া নাচিতে লাগিল; তেঁতুলগাছের দীর্ঘ বিলম্বিত কুন্তলকলাপে ঢেউ খেলিতে লাগিল। গগনস্পর্শী তাল-তরুর একটী ঊর্দ্ধসমুন্নত নবপত্র তর্ তর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

হে তালবৃক্ষ! তোমার এ দুর্দ্দশা কেন? বঙ্গদেশে তোমাকে কবিগণ জটাজূটধারী সন্ন্যাসীর সহিত তুলনা করিয়া থাকেন, কিন্তু এ দেশে তোমার মস্তক মুণ্ডিতপ্রায় কেন? অথবা এ দেশে তোমার জন্ম বলিয়া, তুমি এই দেশের লোকদিগকে অনুকরণ করিতে ভালবাস কি না, তাহা

নহে। তুমি সকলের উপরে মস্তক উন্নত করিয়া অনন্ত আকাশ পানে তাকাইয়া আছ, তোমার আকাঙ্ক্ষাও কত উচ্চ। তোমার কি কখনও ক্ষুদ্র মানবের অনুকরণ করা সম্ভবে? তোমার মস্তক মুণ্ডিত, ইহাও তোমার সেই মহত্ত্বের পরিচয়! তুমি অকাতরে অম্লানচিত্তে তোমার অঙ্গের পত্রসকল বিতরণ করিয়া উৎকলবাসীর মহোপকার সাধন করিতেছ! তোমার পত্র তিনটী জাতির উপজীবিকাস্বরূপ। চামার জাতি তোমার পত্র কাটিয়া তদ্দ্বারা "টাটী" প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে—সে সকল টাটী আবার কুলকামিনীগণের লজ্জাশীলতার বহিরাবরণস্বরূপ। করণজাতি তোমার পত্র লেখা পড়াতে কাগজের ন্যায় ব্যবহার করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ব্রাহ্মণজাতি তোমার পাতার পুঁথি পড়িয়া, লোকদিগকে ধর্ম্মকথা শুনাইয়া, তাঁহাদের চাউলকলার সংস্থান করিয়া থাকেন। তোমার পত্র না পাইলে "জমিদারের জমা-ওয়াশীল-বাকী", মহাজনের দাদনের হিসাব, প্রজার "পাউতি" (দাখিলা), পঞ্চায়েতের ফয়সালা, বালকের লেখন শিক্ষা, * বৃদ্ধের ভাগবত পাঠ, বিষয়ীর বিষয়-লিপি ও প্রেমিকের প্রেমলিপি কোথা হইতে আসিত? ঐ যে কৃষক শ্রাবণের মূষলধারার মধ্যে, তাহার ক্ষেত্রে জলরক্ষা করিবার জন্য, আলি বাঁধিতে বাঁধিতে মনের উল্লাসে উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেছে, উহার সে স্ফূর্ত্তি সে উল্লাস কোথায় থাকিত, যদি উহার মস্তকের উপরে তোমার পত্র নির্ম্মিত "পখিয়া" বিলম্বিত না থাকিত? কেবল তাহা নহে,—উৎকলের প্রসিদ্ধ কবি উপেন্দ্র ভঞ্জ † যে আভিধানিক কবিত্বের গর্ব্বে স্ফীত হইয়া একদিন বলিয়াছিলেন :—

* উড়িষ্যাবাসীরা তালপত্রের উপর যে লোহার কলম দিয়া লেখে বা খাঁড়ে (engrave করে) তাহাকে লেখন বলে।

† উপেন্দ্র ভঞ্জ উৎকলের সর্ব্বপ্রধান কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি এই সকল কাব্য রচনা করিয়াছেন,—চৈতন্যচন্দ্রোদয় (সংস্কৃত), বৈদেহীশ-বিলাস, লাবণ্যবতী, রসিক-

কালিদাস দীনকৃষ্ণ * চরণে শরণ।
আউ সবু কবিঙ্কর মস্তকে চরণ॥ †

তাঁহার সে অহঙ্কার কোথায় থাকিত, যদি তোমার পত্রের উপর তাঁহার সে কবিতা লেখা না চলিত? উৎকলের কাশীরাম দাস, কবিবর জগন্নাথ দাস ‡ সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের যে পদ্যানুবাদ প্রণয়ন করিয়া প্রাসাদবাসী রাজা হইতে কুটীরবাসী কৃষক পর্য্যন্ত সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ভক্তিমাহাত্ম্য প্রচার করিয়া চিরযশস্বী হইয়াছেন, সেই অমূল্য গ্রন্থ কোথায় থাকিত? আর্য্যজাতির জ্ঞানবিজ্ঞানের অক্ষয়-ভাণ্ডার, আর্য্য-সভ্যতার পূর্ব্বতন ইতিহাসের একমাত্র আকর, আর্য্য-ধর্ম্মের একমাত্র ভিত্তি বেদবেদান্ত তোমারই পত্রে লিখিত হইয়া দুর্দ্দমনীয় কালের হস্ত অতিক্রম করিয়া এপর্য্যন্ত পরিরক্ষিত হইয়া আসিতেছে; হে তালবৃক্ষ! ইহাও তোমার কম গৌরবের কথা নহে। তাই তুমি ধন্য, তুমি সকল বৃক্ষের মধ্যে অশেষ গৌরবান্বিত। ঐ যে একটী কাক তোমার মস্তকরূপ

হারাবলী, প্রেম-সুধানিধি, রসপঞ্চক, কোটী-ব্রহ্মাণ্ডসুন্দরী, সুভদ্রা-পরিণয়, রাসলীলামৃত, সুবর্ণরেখা ইত্যাদি। ইহার মধ্যে "বৈদেহীশ-বিলাস"ই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

* দীনকৃষ্ণদাস আর এক জন প্রধান কবি। তিনি "রসকল্লোল" "রসবিনোদ" "আর্ত্তত্রাণ চৌত্রিশা" ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

† আর সব কবিদের মস্তকে চরণ। উক্ত কবিতাটীর প্রথম দুই চরণ এই—

উপ ইন্দ্র ভঞ্জ কুহে টেকি বেণী বাহুকু।
রবিতলে কবি বোলি না কহিবু কাহিকু॥

অর্থাৎ উপেন্দ্র ভঞ্জ দুই বাহু তুলিয়া বলেন, রবিতলে (এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে) আর কাহাকেও কবি বলিয়া স্বীকার করি না; অর্থাৎ বাল্মিকী, ব্যাস, হোমার প্রভৃতি কবি-গণও তাঁহার নিকট কবিনামের যোগ্য নহেন!

‡ ইনি একজন শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময়ের কবি। চৈতন্য মহাপ্রভু ইঁহাকে নাকি প্রেমালিঙ্গন দিয়াছিলেন। ইনি শ্রীমদ্ভাগবতের উড়িয়া ভাষায় পদ্যানুবাদ করিয়া-ছিলেন। এই ভাগবত গ্রন্থ উড়িষ্যার 'গস্‌পেল'।

মানমন্দিরের চূড়াতে বসিয়া চারি দিকে তাহার আহারের অন্বেষণ করিবার জন্য, আস্তে আস্তে তোমার দিকে আসিতেছে, উহাকে তুমি বসিতে দাও।

দেখিতে দেখিতে কাক আসিয়া তরুশিরে উপবেশন করিল ও কি যেন দেখিয়া "কা কা" রবে চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার সেই কর্ণভেদী রব শুনিয়া, একটী কোকিল বটবৃক্ষের শ্যামল পত্ররাশির মধ্যে তাহার উজ্জ্বল কাল দেহ লুকাইয়া রাখিয়া, কুহু কুহু রবে পঞ্চম তানে ডাকিয়া উঠিল। সেই কুহুধ্বনি, গাছের পাতা কাঁপাইয়া, ধরাতল প্লাবিত করিয়া, বায়ুস্তরে সুধাসিঞ্চন করিয়া, নীল আকাশে প্রতিধ্বনির তরঙ্গ তুলিয়া লীন হইয়া গেল। পার্শ্ববর্ত্তী আম্রশাখায় উপবিষ্ট হইয়া একটী মর্কট আম্রের মুকুল ভাঙ্গিয়া মহানন্দে ভোজন করিতেছিল। সে সেই কুহুধ্বনি শুনিয়া চকিতের ন্যায় "হুপ্ হুপ্" শব্দ করিয়া, সে গাছ হইতে অন্য গাছে লাফাইয়া পড়িল। গ্রামের বৃদ্ধ ষণ্ডটি (প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই একটি ধর্ম্মের ষাঁড় আছে) তাহার স্থূল-কৃষ্ণ ভীষণ শরীর বটগাছের শীতল ছায়ায় বিস্তৃত করিয়া অর্দ্ধনিমীলিত-নেত্রে রোমন্থন করিতেছিল; সে সেই "কুহু কুহু" রব শুনিয়া চক্ষু মেলিয়া তাকাইল ও ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ করিয়া, সেই কোকিলের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে একত্র লাঙ্গলে বাঁধা দুইটী বলদ, লাঙ্গল টানিয়া হড়্ হড়্ শব্দ করিতে করিতে, সেই গাছের তলে আসিতে লাগিল। তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ একজন কৃষক একগাছা পাচন হাতে করিয়া "পিকা" (চুরট) খাইতে খাইতে, সেই বলদ দুইটীকে তাড়াইয়া নিয়া চলিল। এই কৃষকের নাম মণিনায়ক।

তীয় অধ্যায়।

চিন্তামণি নায়কের গৃহ।

"মলা—ম্লা—ম্লা—ছড়া—গোসাই-খিয়া—যোগিনী-খিয়া—ছড়া"—

লাঙ্গলে বাঁধা বলদ দুইটী, বটগাছের শীতল ছায়া দেখিয়া লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, কিম্বা সেই বৃদ্ধ শায়িত ষণ্ডের প্রতি স্বজাতিপ্রীতি-বশতঃ, গাছের তলে আসিয়া একটু দাঁড়াইলে, মণিনায়ক তাহাদিগের প্রতি উল্লিখিত সুমধুর সম্বোধন প্রয়োগ করিল। কিন্তু মূর্খ কৃষক বুঝিল না যে, তাহার অভিশাপ কার্য্যে পরিণত হইলে, তাহার নিজেরই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইত—এই গালাগালির চরম ফলটা তাহার নিজের ঘাড়েই পড়িত। উহার অর্থ এই—"রে মরা শালারা! তোরা তোদের গোঁসাইকে খা'স, (গোঁসাই = গোস্বামী = প্রভু = গরুর যিনি মালিক, অর্থাৎ বক্তা স্বয়ং)—যোগিনী (ডাকিনী) তোদের খা'ক"—(কিন্তু তাহা হইলে লোকসানটা কার?)

গালাগালির অর্থ যাহাই হউক, স্থূলবুদ্ধি বলদ দুইটী কিন্তু তাহা বুঝিল না। কৃষকের হাতের সেই "পাচন-বাড়ী" তাহাদিগকে গো-ভাষায় উহার অনুবাদ করিয়া বুঝাইয়া না দেওয়া পর্য্যন্ত তাহারা একটুও নড়িল না। এইরূপে মণিনায়ক গরু তাড়াইয়া নিয়া তাহার বাড়ী পৌঁছিল।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, নীলকণ্ঠপুর গ্রামের "বস্তি"টী পূর্ব্ব

পশ্চিম বিস্তৃত। মাঠ হইতে পথটী উত্তর দিকে গিয়া সেই বস্তির প্রায় মধ্যভাগে গ্রামদাণ্ডের সহিত মিলিত হইয়াছে। মণিনায়কের বাড়ী সেই 'বস্তির' প্রায় মধ্যস্থলে, গ্রামদাণ্ডের দক্ষিণ ধারে, 'ভাগবত-ঘরের' সন্নিকটে। মণিনায়ক তাহার বাড়ীর সম্মুখে গিয়া, গলির মধ্যে গরু রাখিয়া, 'নীলা' 'নীলা' বলিয়া ডাকিতে লাগিল। তাহার ডাক শুনিয়া একটী অষ্টাদশবর্ষীয়া বালিকা তাহার ঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। সে 'ঘসী' প্রস্তুত করিতেছিল, তাহার হাত গোময়-মাখা ছিল।

মণি বলিল—"নীলা, গরু বাঁধ—তোর বউ কোথায়?"

নীলা।—"হাটে গিয়াছে, এখনও ফেরে নাই।" (উড়িষ্যায় মাকে বউ বলে)।

এই কথা বলিতে বলিতে সে দৌড়াইয়া গিয়া লাঙ্গল হইতে গরু দুইটী খুলিয়া ছায়াতে একটা খোঁটার সঙ্গে বাঁধিল ও গরুর সম্মুখে কিছু খড় দিল। ইত্যবসরে মণি তাহার ঘরের 'পিণ্ডা'তে (বারান্দাতে) পা ছড়াইয়া বসিয়া, সেই চুরুটটী টানিতে লাগিল।

বেলা প্রায় দেড় প্রহর হইয়াছে। রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। সেই বিস্তৃত গলিটির কতক অংশে গৃহশ্রেণীর ছায়া পড়িয়াছে। মৃদু পবনসঞ্চালনে দুই একটী নারিকেল গাছের পাতা নড়িতেছে। গলির মধ্যস্থলে একটী কূপ হইতে একটী স্ত্রীলোক জল তুলিতেছিল। জল তুলিতে তুলিতে তাহার হাতের কাঁসার গহনাগুলি ঝন্ ঝন্ শব্দ করিতে লাগিল। চিন্তামণি তাহাকে বলিল—"রে রামার মা, একটু জল দাণ্ডতে ঢালিয়া দাও, বড় ধূলা উড়িতেছে"! রামার মা তখন দুই কলসী জল সেই গলির উত্তপ্ত ধূলিরাশির উপরে ঢালিয়া দিল। তখন একটু বাতাস বহিল, তাহা মণিনায়কের স্বেদগলিত গাত্রে লাগিয়া বড়ই মধুর বোধ হইল। ইতিমধ্যে নীলা এক ঘটী শীতল জল ও এক খানা গামছা আনিয়া দিল। কৃষক সেই শীতল জলে হাত, মুখ, পা ধুইয়া ও গামছা

দিয়া মুখ মুছিয়া, বড় তৃপ্তি অনুভব করিল। এই সময় তাহার স্ত্রী ঝুম্পা একটা ছোট ঝুড়ী মাথায় করিয়া, মুখে একটী চুরুট টানিতে টানিতে ঘরে আসিল। সেই ঝুড়ি বা টুক্‌রিতে দুইটা ছোট মাটীর ভাণ্ড বসান ছিল। তাহাকে দেখিয়া চিন্তামণি বলিল—

"হাট হইতে কি আনিলি ?"

ঝুম্পা। "আর কি আনিব, কিছু মিলিল না। মোটে দুই সের বিরি * নিয়া হাটে গিয়াছিলাম, তাহা বেচিয়া ছয় পয়সা পাইলাম। তাহার দুই পয়সার তেল, দুই পয়সার পানগুয়া, দুই পয়সার 'কলরা' (উচ্ছে) আনিয়াছি !"

চিন্তা। "আমাকে একটু তেল দে দেখি, আমি গা ধুইয়া আসি— উহু ! বড় গরম !"

এই সময়ে নীলা আসিয়া বলিল—"বউ ! কই আমার 'হল্‌দি' কোথায় ? গায়ে মাখিবার হল্‌দি একটুও নাই যে ?"

ঝুম্পা।—"আজ পয়সায় কুলাইল না—আর হাটে আনিব। মোটে দুই সের বিরি ছিল !"

এই কথা হইতে হইতে চিন্তামণি সেই ভাণ্ড হইতে একটু রেড়ির তেল ঢালিয়া লইয়া, তাহা সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া গামছা কাঁধে করিয়া "গা ধুইতে" গেল। "গা-ধোয়া" অর্থে বাস্তবিকই গা ধোয়া, জলে ডুব দিয়া স্নান করা নহে। কোন বিশেষ উপলক্ষ ভিন্ন (যেমন তীর্থ-স্নান, পিতৃ-শ্রাদ্ধ) প্রায় কেহ "মুণ্ড" ধোয় না। তবে রমণীগণ মধ্যে মধ্যে মাথা ধুইয়া থাকেন—সে কখন ? তাঁহারা কেশবিন্যাস করিয়া খোঁপার উপরে যে ঘৃত ঢালিয়া দেন, সেই ঘি যখন বড়ই দুর্গন্ধময় হইয়া পড়ে—তখন !

গ্রামের উত্তরে একটী ডোবা আছে; তাহার জল এই চৈত্রমাসে প্রায় শুকাইয়া গিয়াছে। সেই ডোবাতে মণিনায়ক গা ধুইতে গেল। গ্রামের

* বিরি—মাসকলাই বিশেষ।

গরু, মহিষ, মানুষ, সকলেই এখানে গা ধুইয়া থাকে। রমণীগণের গায়ের হলুদ লাগিয়া ইহার জল হলুদবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে। তাঁহাদের দন্তধাবনান্তে পরিত্যক্ত গাছের ডাল গুলি ঘাটে স্তূপাকার হইয়া রহিয়াছে। গ্রামের গলিতে তিনটী কূপ আছে ; সকলে সেই কূপের জল পান করিয়া থাকে ; তবে এই ডোবার জল পান করিতে যে তাহাদের বিশেষ কোন আপত্তি আছে, তাহা বোধ হয় না।

মণিনায়ক গা ধুইতে গেল, আমরা ইত্যবসরে তাহার বাড়ীঘর একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লই, ও তাহার পরিবারের একটু পরিচয় দিই।

চিন্তামণি নায়ক একজন সাধারণ কৃষক, জাতিতে "খণ্ডাইত"। তাহার ৩ মান (প্রায় ৩ একারের সমান) জমি চাষ আছে ; একখানি হাল, দুইটী বলদ। একটী গাভী আছে, তাহাতে প্রায় একপোয়া দুগ্ধ হইয়া থাকে। গরুগুলি নিতান্ত অস্থিচর্ম্মসার, উড়িষ্যার অধিকাংশ গ্রাম্য গরুই সেইরূপ। মাঠে ঘাস নাই—প্রায় অধিকাংশ ঘাসের জমি আবাদ হইয়াছে ; * বাড়ীতেও খড় খাইতে পায় না—খড় দিয়া ঘরের চাল ছাউনি হয়। সে বেচারাদের উপায় কি ? যাহা হউক, মণিনায়কের পরিবারের মধ্যে এই তিনটী গরু ছাড়া, একটি স্ত্রী, একটী কন্যা ও দুইটী পুত্র আছে। নীলার এখনও বিবাহ হয় নাই ; সে তাহার মাতার প্রথম বিবাহের কন্যা ; মণিনায়কের জ্যেষ্ঠভ্রাতা হরিনায়কের ঔরসে জন্মিয়াছিল। হরির মৃত্যুর পর, দেশাচার অনুসারে মণিই ভ্রাতৃজায়াকে বিবাহ করিয়াছে। তাহার ঔরসে দুইটী পুত্র জন্মিয়াছে, বড়টী রঘুয়া—বয়স আট বৎসর—সে গাভীটাকে লইয়া বনে চরাইতে গিয়াছে। ছোট ছেলের বয়স ছয় মাস, সে এখন মনের সুখে ঘরে শুইয়া নিদ্রা যাইতেছে।

* উড়িষ্যার বন্দোবস্তকর্ত্তা (Settlement Officer) মহানুভব শ্রীযুক্ত ম্যাডক্স্ (Maddox) সাহেবের যত্নে এই বন্দোবস্তে প্রতিগ্রামে কিছু কিছু (যতদূর পাওয়া গিয়াছে) ঘাসের জমি রক্ষিত হইয়াছে, তাহা কেহ ভবিষ্যতে চাষ করিতে পারিবে না।

বলা বাহুল্য, মণিনায়কের ঘরে মাটীর দেওয়াল ও খড়ের ছাউনি। তাহার বাড়ীটী উত্তর-দক্ষিণ লম্বা—সদর দরজা উত্তরে, গলির দিকে খোলা। দরজাটী নিতান্ত ক্ষুদ্র, প্রবেশ করিতে হইলে মাথা হেঁট করিতে হয়; তাহাতে কাঠের একখান কবাট; দরজাটী ঘরের ঠিক মধ্যস্থলে না হইয়া পূর্ব্ব দিকে সরান। সদর দরজার সম্মুখে, পিণ্ডার নীচে, দুইখানা পাথর ফেলান আছে, তাহারা সিঁড়ির কাজ করে। সেই সিঁড়ি দিয়া পিণ্ডাতে উঠিবার কথা, কিন্তু ঘরের দাবা এত নীচু যে সেই সিঁড়ির ব্যবহার প্রায়ই করিতে হয় না। সিঁড়ি দিয়া উঠিলে, বারান্দা বা "পিণ্ডা"র উপরে উঠিতে হয়; পিণ্ডাটী একহাত প্রস্থ ও বাড়ীর প্রস্থানুরূপ লম্বা। পিণ্ডাতে মাটীর দেওয়াল—তাহাতে সাদা লাল আলিপনা দেওয়া; ফুল, লতা, পাতা, মানুষ আঁকা। সদর দরজা দিয়া, বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিতে হইলে, ছোট একটী ঘরের মধ্য দিয়া যাইতে হয়, তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে বড় একটী ঘর। ছোট বড় দুইটী ঘরই শয়ন ঘর—বড়টী গৃহস্থের, ছোটটী গরুর; এই দুই ঘরের মধ্যে, একটী মাটির দেওয়াল; অথবা একটী ঘরকেই, মধ্যে দেওয়াল দিয়া দুইভাগ করা হইয়াছে বলিলে যেন ঠিক হয়। ছোট ঘরটীর মধ্য দিয়া বাড়ীর মধ্যের প্রাঙ্গনে বা উঠানে পড়িতে হয়। উঠানটী নিতান্ত ক্ষুদ্র—তাহার চারি দিকে মাটীর দেওয়াল, বাতাস আসিবার কোন পথ নাই, অবশ্য সেই সদর দরজা ও পশ্চাতের আর একটী ক্ষুদ্র দরজা ভিন্ন। সম্মুখের দুইটী শয়ন ঘর ছাড়া পশ্চাৎ-দিকের মাটীর দেওয়ালের সঙ্গে চাল দিয়া আর একটী ঘর করা হইয়াছে; সেটীও একটী শয়ন ঘর; সে ঘরে মণিনায়কের কন্যা নীলা থাকে, আবার কয়েকটী হাঁড়ীকলসীও থাকে। পূর্ব্ব দিকে দেওয়ালের সঙ্গে কোন ঘর নাই; তবে মাটীর দেওয়াল বৃষ্টির জলে পাছে ধুইয়া যায়, এইজন্য তাহার উপরে একখানা খড়ের চাল আছে; তাহার পূর্ব্ব দিকে আবার অন্য গৃহস্থের চাল লাগিয়াছে। পশ্চিম দিকের দেওয়ালের সঙ্গে আর

একখানি ঘর আছে ; সেটী "রস্থইঘর"; তাহার একটী পিণ্ডা বা বারন্দা আছে, সেখানে ঢেঁকি আছে ; এই বারান্দা শয়ন-ঘরের ক্ষুদ্র বারান্দায় সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। নীলার শয়নঘর ও রস্থই ঘরের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র দরজা ; উহা বাড়ীর দক্ষিণ ভাগের সঙ্গে মিলিত। চারি দিকে দেওয়াল বেষ্টিত গৃহকে "খঞ্জা" বলে।

এই সকল ঘরে প্রবেশ করিবার জন্য কেবল একটী করিয়া দরজা ; সেগুলি ভিতরের উঠানের দিকে খোলা। কেবল গরুর ঘরে প্রবেশ করিবার দুইটী দরজা—একটী উঠানের দিকে খোলা, আর একটী সেই সদর দরজা। ইহার কোন ঘরে বায়ুপ্রবেশের জন্য জানালার কারবার নাই। বায়ু ত সর্ব্বত্রই আছে, তাহার আবার প্রবেশের পথ থাকিবে কি ?

ঘরের ও উঠানের পশ্চাৎভাগের জমিখণ্ডকে "বারী" বলে। তাহা প্রায়ই লম্বা হইয়া পশ্চাতের দিকে গিয়া থাকে। সেখানে দুইটী ভস্মস্তূপ ; তাহার মধ্যস্থলে একটী গর্ত্তের মধ্যে পচা গোময় জমা হইয়া আছে। এই ভস্ম-মিশ্রিত গোময় দ্বারা জমিতে "খত" (সার) দেওয়া হয়। তাহার কৃষিবিষয়ক উপকারিতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু আপাততঃ তাহার স্বাস্থ্যবিষয়ক উপকারিতা স্বীকার করা সম্বন্ধে দুই মত আছে। সেই পচা গোময়ের গন্ধে বাড়ী আমোদিত হইয়া থাকে, বিশেষতঃ যখন দক্ষিণ দিক্ হইতে বাতাস বহে। বাড়ীর পিছনের দেওয়ালের গায়ে শুষ্ক গোময়ের চাপ্টা লাগান আছে—ইহা জ্বালানি কাষ্ঠের কাজ করে। এতদ্ভিন্ন এই পশ্চাৎ "বারীতে" তিনটী কদলী গাছ, চারিটী বেগুনের গাছ, একটী লাউ গাছ ও একটু পরিষ্কৃত স্থানে কিছু শাক হইয়াছে। এক সারি গাঁদাফুল গাছে ও একটি "নব-মল্লিকা" (বেল) ফুল গাছে কয়েকটি ফুল ফুটিয়া আছে। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে সেই গাছের ফুল কৃষকবালিকার কবরীশোভা বর্দ্ধন করিয়া থাকে।

মণিনায়কের স্ত্রী ঝুম্পার বয়স প্রায় ৪০ বৎসর হইবে ; বর্ণটী খুব

কালো—দেহ খর্ব্বাকৃতি, কিন্তু বেশ বলিষ্ঠ। তাহার দুই হাতে দুইটী কাঁসার "খড়ু" (বাউটী) শোভা পাইতেছে। প্রত্যেকটী ওজনে প্রায় দেড় সের করিয়া হইবে। শুনিতে পাই, আবশ্যকমতে এই অলঙ্কারটীর দ্বারা অস্ত্রের কাজও করা যাইতে পারে—অফেন্‌সিব্ ও ডিফেন্‌সিব্ দুই রকমেরই—অবশ্য স্বামীর সহিত যুদ্ধ বাধিলে। আমার বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে আর কোন রমণীভূষণের এইরূপ উপকারিতা নাই—আর সকল অলঙ্কার কেবল অলঙ্কারই। ঝুম্পার গলায় একছড়া পলার মালা, একপায়ে একগাছ "গোড় বালা" (বাঁকা মল,) দুই বাহুতে উল্‌কী। পরিধানে একখান দেশী মোটা সূতার সাড়ী, তাহার প্রায় আধহাত চৌড়া লাল পাড় ও এক হাত চৌড়া আঁচলা। সাড়ী খানা হাঁটুর উপরে তুলিয়া পরা, পিছনের দিকে এক কোণা গুঁজিয়া কাছা দেওয়া। বোধ হয় এই সাড়ীখানি তিন মাস কাল রজকের হস্তগত হয় নাই। কৃষক-পত্নীর মস্তকের খোপাটী মাথার মধ্যস্থলে পর্ব্বত শৃঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতেছে। উড়িষ্যার পুরুষদিগের খোপা horizontal, স্ত্রীলোকদিগের খোপা perpendicular, ইংরাজী না জানা পাঠক পাঠিকাগণ আমাকে মাপ করিবেন, আমি কোন ক্রমেই এই দুইটী ইংরাজী কথা ব্যবহারের লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। উহার বাঙ্গলায় অনুবাদ করিলে দাঁড়াইবে—স্ত্রীলোকের খোপা আকাশ পানে মাথা তুলিয়া থাকে, পুরুষের খোপা মাথার পশ্চাদ্ভাগে ভূমির সহিত সমান্তরাল ভাবে থাকে।

নীলার বর্ণটী কালোর উপরে মাজা ঘসা—তাহার উপরে ক্রমাগত তৈল হরিদ্রা মাখাতে আরও একটু ফরসা হইয়াছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গে যৌবনের শ্রী ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। তাহার কাপড়খানা ঠিক তাহার মাতার কাপড়ের ন্যায়, তবে তাহা হলুদ রঙের ছোপ দেওয়া; কাপড়ের এক অঞ্চল মাথার খোপা ঢাকিয়া, পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত হইয়াছে। (উড়িষ্যার অবিবাহিতা কন্যাগণও পিত্রালয়ে মাথায় কাপড় দেয়)। তাহার

হাতে খড়ু (বাউটী) ভিন্ন কতকগুলি করিয়া লাল মাটির (গালার) চুড়ী আছে; দুই পায়ে দুই গাছা "গোড়বালা", নাকে একখানা পিত্তলের "বেসর" (অর্দ্ধচন্দ্র) ঝুলিতেছে; দুইকাণে দুইটী কাঁসার বা পিতলের "কর্ণফুল"। গলায় তাহার মাতার ন্যায় মালা। দক্ষিণ হস্তের দুইটী অঙ্গুলীতে বড় বড় দস্তার "মুদী" বা আঙ্গটী; সে আঙ্গটীর উপরে একটা গোলছত্র।

মণিনায়ক গা ধুইয়া আসিল। দাণ্ডের একটা কূপ হইতে এক ঘটী জল তুলিল, এবং ঘরের সম্মুখস্থিত "তুলসী চৌরার" (মাটির তুলসী মঞ্চের) উপরে তুলসী গাছে, একটু জল ঢালিয়া দিয়া, হাতে তালি মারিয়া প্রণাম করিল। লীলাকে ডাকিলে, সে আসিয়া একখানা ময়লা মোটা, দেশী ধুতি ও "পূজা মুনিহি" (থলিয়া) আনিয়া দিল। চিন্তামণি সেই কাপড় পরিয়া, সেই পূজা মুনিহি খুলিয়া, জলের ঘটী নিয়া পিঁড়ার উপরে বসিল। প্রথমতঃ একটু তিলকমাটি বাহির করিয়া তাহা হাতে ঘসিল, ও কাণে, নাকে, ললাটে, বাহুতে, পৃষ্ঠে, দুই পার্শ্বে, ফোঁটা কাটিয়া একখানা ক্ষুদ্র আয়নাতে মুখ দেখিল। পরে হাত ধুইয়া ফেলিয়া সেই থলিয়া হইতে জগন্নাথ মহাপ্রভুর মহাপ্রসাদ কয়েকটা শুষ্ক অন্ন ও একটা শুষ্ক তুলসী পত্র বাহির করিয়া, "হে মহাপ্রভু! হে নীলাচল নাথ! দুঃখ দূর কর—হে গৌরাঙ্গ!" বলিয়া ভক্তি পূর্ব্বক মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিয়া, তাহা মুখে দিয়া খাইয়া ফেলিল। পরে উঠিয়া গিয়া জল দিয়া হাত ধুইয়া আসিল।

ইত্যবসরে কৃষক গৃহিণী হাট হইতে যে "কলরা" (উচ্ছে) তরকারি আনিয়াছিল, তাহার ব্যঞ্জন রাঁধিয়া ভাত বাড়িয়া, তাহাকে খাইতে ডাকিল। তাহার শয়নের ঘরে ভোজনের জায়গা হইয়াছিল, সে সেই ঘরে গেল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সেই ঘরটির একটি দরজা, তাহা ভিতরের দিকে

খোলা। এই দরজা খোলা থাকা সত্ত্বেও, সেই ঘরটি এই দিবা দুই প্রহরে অন্ধকারময় হইয়া রহিয়াছে। কেবল দরজার নিকটবর্ত্তী অংশ আলোকিত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে, ঘরের পশ্চিম ভাগে দেওয়ালের গায়ে একটা মোটা মাদুর ঠেসান দেওয়া আছে, দেখা যাইবে। সেখানে মেঝের উপরে প্রায় তিন হাত জায়গা একটু উচ্চ, প্রায় দুই হাত প্রশস্ত। উহার উপরে কিছু খড় দিয়া বালিশ করিয়া মণিনায়ক সস্ত্রীক এই মাদুরের উপর শয়ন করে। কেবল গ্রীষ্মকালে নহে, শীতকালেও সেই একই বিছানা; তবে শীতকালে একটা মোটা চাদর, কিম্বা পুরাতন কাপড়, কি একখানা কাঁথা, সেই মাদুরের উপর পাতা হয়, এবং আর একটা মোটা মাদুর লেপের কাজ করে। ইনি এখন শীত অতীত হওয়াতে কিছু দিনের জন্য ঘরের চালের সঙ্গে ঝুলান থাকিয়া বিশ্রামসুখ ভোগ করিতেছেন। ঘরের এক কোণে তিনটি "টুক্‌রি" (বাঁশের বা বেতের ঝুড়ি) ও কয়েকটি হাঁড়ী রহিয়াছে; আর কয়েকটি হাঁড়ী একগাছা শিকায় ঝুলিতেছে, আর এক কোণে একটী ছোট কাষ্ঠের বাক্স; এবং একগাছা দড়ীর উপরে তিন খানা পুরাতন কাপড় ঝুলিতেছে। ইহাই হইতেছে ঘরের আসবাব।

ঘরের পূর্ব্ব দিকে একখানা কাঁশার বড় থালায় ভাত বাড়া হইয়াছে; সে পান্তাভাতের ("পখাল") এক প্রকাণ্ড স্তূপ। তাহার উপরে একটু উচ্চের তরকারি;—আমি কালিদাস হইলে বলিতাম,—যেন পূর্ণচন্দ্রবিম্বের মধ্যে কলঙ্ক-রেখা শোভা পাইতেছে। তবে তাই বলিয়া সে ভাত চন্দ্রবিম্বের ন্যায় শুভ্র নহে; তাহা লাল রঙ্গের মোটা ভাত। সেই ভাতের এক পার্শ্বে একটু দেশী মোটা লবণ (করকচ) ও একটা কাঁচা লঙ্কা। থালার নিকটে একখানা ছোট তক্তা, উহা অনেক দিন যাবৎ পিঁড়ির কাজ করিয়া আসিতেছে ও আরো কত কাল করিবে তাহার ঠিক নাই। থালার বাম দিকে বড় এক ঘটী জল।

সেই ভাতের রাশি দেখিয়া পাঠকগণ বোধ হয় ভাবিতেছেন,—"মণিনায়ক, তাহার স্ত্রী ও কন্যা একত্র বসিয়া আহার করিবে।" কিন্তু সেটা আপনাদের ভুল। যদিও বিধবা-বিবাহ, যৌবন-বিবাহ, স্ত্রীলোকের হাট-বাজার করা ও চুরট-টানা ইত্যাদি কোন কোন বিষয়ে উড়িষ্যার চাষাগণ ইয়ুরোপের সুসভ্য জাতিদিগকে ধর ধর করিয়াছে, তথাপি স্ত্রী-পুরুষ একত্র বসিয়া আহার করা বিষয়ে এখনও ইহারা অনেক দূর পশ্চাতে পড়িয়া আছে। ঐ থালার ভাতগুলি, তিন জনের জন্য নহে, একা মণিনায়কের জন্য! উহাতেও তাহার পেট ভরিবে কি না সন্দেহের বিষয়।

মণি আসিয়া সেই পিঁড়িতে বসিল; ঘটী হইতে একটু জল দিয়া হাত ধুইয়া সেই অন্নরাশি উদর-বিবরে নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। এক গ্রাস ভাত মুখে দিয়া, একটু নুন মুখে দিতে লাগিল; কখন কখন সেই উচ্ছের তরকারি একটু মুখে দিতে লাগিল। নুন, ডাইল, তরকারি, ব্যঞ্জনাদি দ্বারা ভাত মাখিয়া খাওয়া উড়িষ্যা দেশের প্রথা নহে। তবে আমাদের দেশে সেই মিশ্রণ-ক্রিয়াটা থালার উপরে হয়, সেখানে উহা মুখের মধ্যে হইয়া থাকে, এইটুকুমাত্র প্রভেদ বলা যাইতে পারে। এইরূপে সেই তরকারিটুকু নিঃশেষিত হইল; কিন্তু ভাতের অর্দ্ধেকও উঠিল না। তখন গৃহিণী একখণ্ড কাঁচা-শুষ্ক আম (পূর্ব্ব বৎসরের) আনিয়া দিলেন। তাহার ও পূর্ব্বোক্ত লঙ্কার সাহচর্য্যে ও সাহায্যে সেই অবশিষ্ট অন্নগুলি তাহাদের গন্তব্য স্থানে গিয়া পৌঁছিল। পরে, যাহারা পথহারা হইয়া এদিক্ ওদিক্ পড়িয়াছিল, কিম্বা পথে দেরী করিতেছিল, সেই ঘটীর জল তাহাদিগকে নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছাইয়া দিল!

উড়িষ্যার অধিকাংশ লোকেই এইরূপ যৎসামান্য ব্যঞ্জন দিয়া ভাত খাইয়া থাকে। মাছ প্রায় কাহারও ভাগ্যে ঘটে না; তবে যে পয়সা দিয়া কিনিতে পারে, সে শুষ্ক মাছ খাইয়া থাকে। প্রত্যহ ডাইল-ভাত

খাওয়া কেবল বড় লোকের ভাগ্যে ঘটে, দুগ্ধের ত কথাই নাই। উড়িষ্যা-বাসিগণ প্রায়ই, বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে, দুই প্রহরে পান্তা ভাত (পূর্ব্ব রাত্রিতে পাক করা) খাইয়া থাকে, মধ্যাহ্নে কেবল তরকারি রন্ধন করে, তাহার আবার কিয়দংশ রাত্রির জন্য রাখিয়া দেয়, তখন কেবল ভাত পাক করে। এইরূপে ইহারা কেবল ভাত এক বেলা পাক করে ও কেবল তরকারি অন্য বেলা পাক করে। ডাইল, তরকারি, ব্যঞ্জনের অভাব কেবল ভাত দিয়াই পূরণ করিতে হয়; সেইজন্য অনেকগুলি করিয়া ভাত খায়। কিন্তু দুই বেলা পেট পূরিয়া খাওয়া অনেক লোকের ভাগ্যে ঘটে না।

আমরা মণির আহারের বিবরণ লইয়া এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলাম; আহারের সময়ে গৃহিণীর সঙ্গে তাহার যে কথোপকথন হইতেছিল, সে দিকে কর্ণপাত করি নাই। মণিও প্রথমতঃ বড় বেশী কথা বলিবার সময় পায় নাই, ভাতগুলি পেটের মধ্যে যাইবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়াছিল। যাহা-হউক, খাইতে খাইতে মণি বলিল,—"রঘুয়া কখন খাইয়াছে?"

গৃহিণী।—"তাহা নীলা জানে, আমি ত হাটে গিয়াছিলাম, জানি না।"

নীলা উঠানে দাঁড়াইয়াছিল, বলিল—"সে অল্পক্ষণ হইল খাইয়া গিয়াছে!"

মণি।—"আমাকে এত ভাত দিলে কেন? তোমাদের দু জনের ভাত রাখিয়াছ ত?"

গৃহিণী।—"তুমি খাও, আমাদের আছে।"

মণি।—"আজ হাটে ধান-চাউলের বাজার কিরূপ?"

গৃহিণী।—"দর ক্রমেই চড়িতেছে—আজ চাউল টাকায় ১৫ সের বিক্রী হইল।"

মণি।—(এক ঢোক জল গিলিয়া) "তাই ত, আমাদের ঘরে যে ধান আছে, তাহাতে আর ২।৩ মাসের বেশী যাবে না। তার পর কি হবে?"

গৃহিণী।—"একবার বিয়ালীটা * কাটা পর্য্যন্ত চলিলে হয়।"

মণি।—"তাহার ত এখন অনেক দেরী—ভাদ্র মাসের আগে বিয়ালী ধান কি কাটা যাবে? আর মোটে ছুই পোয়া † জমি বিয়ালী তাহাতে কতই ফলিবে? বোধ হয় গত বৎসরের মত এবারও মহাজনের নিকট হইতে ধান কর্জ্জ করিতে হইবে।"

গৃহিণী।—"তুমি কর্জ্জ কর, আর যা' কর, এবার কিন্তু নীলার "বাহা" (বিবাহ) না দিলে চলিবে না! আজ একজন গণক বলিল, এই বৈশাখ মাসে কাল শুদ্ধ আছে—তাহার পর এক বৎসর অকাল।"

মণি।—"তাই ত, কি করিব? এই সে দিন মা মরিয়া গেলেন, তাঁহার 'শুদ্ধ শ্রাদ্ধের' জন্য মহাজনের কাছ থেকে ১৫ টাকা কর্জ্জ করিয়াছি, আবার এখন কি রকমে টাকা পাইব?"

গৃহিণী।—"কিন্তু এ কাজও বড় ঠেকা—মেয়ে এই মাঘ মাসে ১৮ বৎসরে পড়িয়াছে, কখন কি হয় বলা যায় না—বরং এক মান জমি বাঁধা দিয়া টাকা কর্জ্জ কর।"

মণি।—"বাহা" ত মুখের কথা নয়, আর সে জমি বাঁধা দিলেই বা কি খাইব—দেখা যা'ক আজ একবার মহাজনের বাড়ী যাব।"

ইতিমধ্যে ছোট ছেলেটীর নিদ্রাভঙ্গ হওয়াতে সে কাঁদিয়া উঠিল। নীলার বিবাহের প্রসঙ্গ উপস্থিত হওয়ামাত্রই যেন নীলার উদরানল হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, সে রসুই ঘরে গিয়া খাইতে বসিয়াছিল। আর থালাও মোটে আর একখানা ছিল। গৃহিণী ছেলেটীকে কোলে করিয়া স্তন্য পান করাইতে লাগিল। তাহার বড় ক্ষুধা হইয়াছিল, গরুতে মোটে এক পোয়া দুগ্ধ দেয়, তাহা খাইয়া সে বাঁচিবে কেমনে?! কখন কখন চিড়া গুলিয়া তরল করিয়া তাহাকে খাওয়াইতে হয়।

---

* বিয়ালী = আশু ধান্য।

† দুই পোয়া = অৰ্দ্ধ মান বা একর (acre).

মণিনায়কও এই সময়ে ভোজন শেষ করিয়া আচমন করিতে পিছন বাড়ীর দিকে গেল। পরে পানের থলিয়াটী হাতে করিয়া আসিয়া পিঁড়ার উপরে একটা নারিকেল পাতার মোটা চাটাই পাতিয়া বসিল। গৃহিণী ইতিমধ্যে ছেলেকে নীলার কোলে দিয়া, স্বামীর পরিত্যক্ত থালায় ভাত বাড়িয়া নিয়া খাইতে বসিল।

মণি থলিয়া খুলিলে, প্রথমতঃ একটা টিনের লম্বা কৌটা বাহির হইল, তাহার এক দিকে কয়েক খণ্ড পান, অন্য দিকে কিছু চুণ ছিল। ছোট এক খানা জাঁতি ("গুয়াকাতি") বাহির করিয়া একটা সুপারি কাটিল; সে একখণ্ড পানে চুণ লেপিতেছে, এমন সময়ে একখানা গরুর গাড়ী লইয়া ভগী (ওরফে ভগবান) সুঁই আসিয়া তাহাকে ডাকিল।

ভগী সুঁইয়ের ঘর চিন্তামণির ঘরের পশ্চিম দিকে সংলগ্ন। চিন্তামণি তাহাকে সাড়া দিল; সে গাড়ী হইতে বলদ দুইটী খুলিয়া দিয়া তাহাদিগকে ছায়ায় বাঁধিয়া আসিয়া মণির কাছে বসিল। মণির কন্যাকে ডাকিলে, সে একটু আগুন দিয়া গেল; তখন ভগী কোমর হইতে একটী অর্দ্ধদগ্ধ চুরুট বাহির করিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া টানিতে লাগিল। এ দিকে মণিও সেই পানটী "গুয়া-গুণ্ডি" সহযোগে মুখে দিয়া, একটা চুরুট ধরাইতে ধরাইতে কথা আরম্ভ করিল—

মণি। "আজ হাটে গাড়ীতে করিয়া কি নিয়াছিলে ?"

ভগী। "মহাজনের কতকগুলি পুরাণ ধান ছিল, তাহা প্রায় পচিয়া গিয়াছিল; সেইগুলি গাড়ীতে নিয়া বিক্রি করা হইল।"

মণি। "কি দরে বিক্রি হইল ?"

ভগী। "টাকায় ৪ সের করিয়া সস্তা দরে বিক্রয় হইল। তুমি রাখিলেইত পারিতে ?"

মণি। "আরে ভাই, আমার টাকা কোথায়! এই সে দিন মায়ের "শুদ্ধ-শ্রাদ্ধ" করিলাম, তাহাতে প্রায় ২০৲ টাকা খরচ হইল; তাহার মধ্যে

১৫৲ টাকা মহাজনের নিকট কর্জ্জ করিয়াছি—মাসে টাকায় এক আনা সুদ—কখনও এ রকম শুনিয়াছ ?”

ভগী। “তা আর কি করিবে ? পঙ্কজ সাহুর নিকট টাকা পাইলে বলিয়া তোমার কাজ হইল, আর ত কেউ টাকা দেয় না। সে বৎসর দুর্ভিক্ষ হইল, তাহার কাছে ধান ছিল বলিয়া লোকে খাইয়া বাঁচিল; নচেৎ কি উপায় হইত বল দেখি ? কত লোক না খাইয়া মরিয়া যাইত! টাকা দিয়াও ধান কিনিতে পাওয়া যাইত না। এই রকম দুই এক জন মহাজন আছে বলিয়া লোকে প্রাণে মরে না, নচেৎ কত লোক বৎসর বৎসর মারা পড়িত। সে সুদ বেশী লয়—তা কি করা যাইতে পারে ? তাহার জিনিষ, লাভ-লোকসান তাহার। লোকসান দিয়া কে কারবার করিতে যায় ? তাহার কত ধান ও কত টাকা একবারেই আদায় হইতে পারে না, ডুবিয়া যায়। জান ত ?”

মণি। “আমার ত আরো এক বিপদ উপস্থিত; মেয়েটা খুব বড় হইয়া উঠিয়াছে, এবার তা’র বিবাহ না দিলে চলিবে না। তাই আরো কিছু টাকা কর্জ্জ পাওয়া যায় কি না, আজ দেখিতে যাইব। কি করিব, ভাই, তুমি ত জান মোটে ৩ মান জমি, তাহাতে সকল বছর সমান ফলে না। এবার তবু ভাল বৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া একরকম ভালই ফলিয়াছিল। তবুও বছর খরচ চলিবে না। গত বছরের কর্জ্জা ধান শোধ করিলাম, আর ২।৩ মাস পরেই বোধ হয় আবার কর্জ্জ করিতে হইবে। আমার “পাঁচ প্রাণী কুটুম্ব” তাহা ত জান ?”

ভগী। “তাত বটেই; আর জমিতেই বা ফলে কি! খুব ভাল ফলিলে গড়ে এক মান জমিতে দুই ভরণ * ধান ফলিবে; খুব ভাল

* উড়িষ্যা মাপে ৪ সেরে (স্থল বিশেষে ৩ সেরে) এক গৌণী হয়; ৮০ গৌণীতে এক ভরণ। ভরণ=৮ মোণ।

আউয়ল নম্বর জমিতে তিন ভরণ, মধ্যম জমিতে দুই ভরণ ও নীরস জমিতে বড় জোর এক ভরণ জন্মে—ইহার বেশী ত নয়?"

মণি। "ভাই, সে কথা বল কেন? আমার তিন মান জমি, তাহার দুই পোয়া বিয়ালী বিরি * আর মোটে আড়াই মান শারদ। খুব ভাল যে বন্দ, তাহার এক মানে ৩ ভরণ হইয়াছে; মধ্যম জমিতে এক মানে ২॥ ভরণ, আর নীরস জমি দুই পোয়াতে মোটে ৪০ গৌণী হইয়াছে। আমার এই আড়াই মান জমিতে মোট ৬ ভরণ ফলিয়াছে; আর সেই দুই পোয়া (অর্দ্ধ মান) বিয়ালী জমিতে মোট দশ গৌণী বিরি হইয়াছে, এখন বিয়ালী কত হইবে, তা প্রভু জানেন। গত বছর মোটে ৬০ গৌণী হইয়াছিল।"

ভগী। "ইহাই যথেষ্ট, এবার কি আর বেশী হবে মনে করিয়াছ?"

মণি। "না, তা কখনও নয়। তবে এখন বিবেচনা কর দেখি, শারদ ও বিয়ালীতে আমি মোটে পাইলাম ৬ ভরণ ৬০ গৌণী—প্রায় ৬॥ ভরণ; তাহাতে চাউল হইল বড় জোর ২৬ মোণ। জমিদারের খাজানা আমাকে দিতে হয় তিন মানের জন্য ৭৲ টাকা, বছরে আমাদের ৪ জনের কাপড় চোপড় কিনিতে লাগে ৭৲। ৮৲ টাকা; এই ১৫৲ টাকাও ত সেই ধান বেচিয়া দিতে হয়। এখন চাউলের মোণ ২॥০ টাকায় দাঁড়াইয়াছে, এই ১৫৲ টাকার জন্য ১২ মোণ ধান অর্থাৎ ৬ মোণ চাউল বেচিতে হয়। তাহা হইলে থাকিল কি! বছরে মোটে ২০ মোণ চাউল। তাহাতে আমাদের কয় মাস চলিবে? ৪ জনে দিন ৪ সের করিয়া খাইলে, মাসে ১২০ সের=৩ মোণ; অতএব ৬।৭ মাসের বেশী কোন ক্রমেই চলিতে পারে না।"

* জমি সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর; দোফসল ও এক ফসল। দোফসল জমিতে আগে বিয়ালী (আশু) ধান্য হয়, পরে বিরি কিম্বা কুলথী হয়। এক ফসল জমিতে শারদ অর্থাৎ আমন ধান হয়। শরৎকালে জন্মে বলিয়া শারদ। বিরি ও কুলথী দেখিতে কলাইয়ের মত।

ভগী। "তুমি যে খরচ ধরিলে, ইহা ছাড়া আর খরচ নাই কি? তেল-নুন আছে, পান-তামাক আছে, ঘর-মেরামত আছে, ধর্ম্ম-কর্ম্ম আছে, 'শুদ্ধ-শ্রাদ্ধ' আছে, বিবাহ আছে,—আরও কত রকম্ বাজে খরচ আছে।"

মণি। "সে সকল ধরিলেত কত হইবে। এত দিন নিধি দাসের একখান জমি "ধুলি ভাগে *" রাখিয়াছিলাম বলিয়া খোরাকি খরচ এক রকম চলিয়াছিল, সেজন্য কর্জ্জ করিতে হয় নাই, কিন্তু সে জমিটা সে গত বৎসর ছাড়াইয়া নিয়া নিজে চাষ করিতেছে; এখন আমার বছর বছর ধান কর্জ্জ না করিলে চলিবে না।"

ভগী। "আমারও ত ভাই ১৩।১৪ "প্রাণী কুটুম্ব"। ভাগ্যে আর দুই ভাই কিছু কিছু রোজগার করে—কপিলা কলিকাতায় চাকরি করিয়া মাসে ৩।৪ টাকা করিয়া পাঠায়, আর ধনিয়া রেলের রাস্তায় কাজ করে, সেও মাসে ১॥০।২৲টাকা দেয়; আর আমিও চাষবাস করিয়া অবসর মত এই গাড়ীখানা চালাই, সেজন্য আমাদের এক রকম চলিতেছে। কিন্তু তবুও 'শুদ্ধ শ্রাদ্ধ' কি বিবাহ উপস্থিত হইলে, কর্জ্জ না করিয়া উপায় নাই। আচ্ছা, তুমি জমির খাজানা ধরিলে, জমির চাষের খরচ ধরিলে না?"

মণি। "তাহা ধরিলে কি কিছু লাভ থাকে? আমরা শরীর খাটাইয়া খাই বলিয়া, এই চাষ আবাদে আমাদের কিছু লাভ দেখা যায়। কিন্তু যাহারা সব কাজ "মুলিয়া" (মজুর) দ্বারা করায়, তাহাদের বড় কিছু লাভ দেখা যায় না। থা'ক সে সব কথা। বেলা অনেক হইয়াছে, তুমি গিয়া ভাত খাও। আমি একটু শুই। বিকালে একবার মহাজনের বাড়ীতে যাইব।"

ভগী। "আচ্ছা! আমি ভাত খাইতে যাই।"—ইহা বলিয়া ভগী ভুঁই উঠিয়া গেল, মণিনায়ক শয়ন-ঘরে প্রবেশ করিল।

* ফসলের অর্দ্ধাংশ রায়ত ও অর্দ্ধাংশ ভূম্যধিকারী পাইয়া চাষ।

তৃতীয় অধ্যায়

উড়িষ্যার মহাজন।

নীলকণ্ঠপুরে পঙ্কজ সাহু একজন বড় মহাজন। কেবল নীলকণ্ঠপুরে কেন, সমগ্র পুরী জেলার মধ্যে তিনি একজন বড় মহাজন বলিয়া প্রসিদ্ধ। গত "ন-অঙ্ক" * দুর্ভিক্ষের সময় (Great famine of Orissa, 1867) তাঁহার অনেকগুলি ধান্য মজুত ছিল। তখন দেশের এরূপ অবস্থা হইয়াছিল যে, এক সের ধান্য এক সের রৌপ্য দিয়াও কিনিতে পাওয়া যাইত না! পঙ্কজ সাহু তখন সেই ধান্যগুলি বিক্রয় করিয়া প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা পাইয়াছিলেন। তৎপরে সেই টাকা অধিক সুদে কর্জ্জ দিয়া, টাকার পরিবর্ত্তে ধান্য উসুল করিয়া, সেই ধান্য আবার দাদন করিয়া, ক্রমে তাঁহার দুই লক্ষ টাকার সম্পত্তি হইয়াছে।

পঙ্কজ সাহু জাতিতে তেলী। উড়িষ্যায় তেলী জাতি খুব নিকৃষ্ট জাতি; উচ্চ জাতীয় লোকেরা তাঁহার জল গ্রহণ করিতে পারে না। কিন্তু জাতিতে নীচ হইলেও টাকার খাতিরে পঙ্কজ সাহুর সম্মান খুব বেশী। তাঁহার

---

* "ন—অঙ্ক" অর্থাৎ পুরীর মহারাজার রাজত্বের নবম বৎসর। উড়িষ্যায় সচরাচর পুরীর রাজার রাজ্য-প্রাপ্তি হইতে বৎসর গণনা হয়।

বয়স এখন ৬৫ বৎসর হইবে। জ্যেষ্ঠ পুত্র বিম্বাধর সাহুই এখন সংসারের কর্ত্তা। তাঁহার বয়স ৩০ বৎসর।

পঙ্কজ সাহুর বাড়ী-ঘর পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া সাধ্য কি কেহ তাঁহাকে একজন দুই লক্ষ টাকার মহাজন বলিয়া চিনিতে পারে? সেই দীন-হীন কৃষক মণিনায়ককে এই দুই লক্ষ টাকার মহাজনের পার্শ্বে দাঁড় করিয়া দিলে, কে মহাজন, কে কৃষক, তাহা সহজে চিনিয়া লওয়া দুষ্কর হইবে। তবে অবয়বগত কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে বটে। মহাজনের উদরটী কিছু বেশী মোটা; শরীরখানি অনবরত তৈল মর্দ্দন দ্বারা খুব মসৃণ; তাঁহার গলায় যে ৪।৫টি সোণার মাদুলী আছে, তাহা মণিনায়কের মাদুলীর অপেক্ষা কিছু বড় রকমের। মহাজনের গৃহখানিও মণিনায়কের বাড়ীর আকারে নির্ম্মিত; তবে পরিবারে লোকসংখ্যা বেশী বলিয়া মহাজনের "খঞ্জার" ভিতরে, একটির পর আর একটি মহালায় অনেক গুলি ঘর আছে। অর্থাৎ, মণিনায়কের বাড়ীর পশ্চাদ্‌ভাগে সেইরূপ আর একটি বাড়ী জুড়িয়া দিলে যেরূপ হয়, মহাজনের বাড়ীটা সেই রূপ। মণিনায়কের একটি আঙ্গিনা বা উঠান; মহাজনের একটির পশ্চাতে আর একটি আঙ্গিনা; সে আঙ্গিনার পশ্চাতে লম্বালম্বি বিস্তৃত "বারী"। এই দুইটি আঙ্গিনার চারি দিকে আটটি ঘর। ঘরগুলির বন্দোবস্ত মণিনায়কের ঘরের ন্যায় হইলেও একটু বিশেষ এই যে, মহাজনের সম্মুখ ভাগের ঘরগুলি একটু অধিক উচ্চ এবং প্রথম মহালার কয়েকটি মেঝে প্রস্তরাবৃত। আর "দাণ্ড" ঘরটিতে গরু রাখা হয় না; সেটি বৈঠকখানার মত ব্যবহার হয়; সেটি খুব উচ্চ এবং তাহার মেঝে প্রস্তর দিয়া বাঁধান। এ ঘরটিতে সচরাচর কেহ থাকে না; তবে গ্রামে কোন "সরকারী মনুষ্যের" (পুলিশ দারগা, কিম্বা ইন্‌কমট্যাক্স এসেসর প্রভৃতির) শুভাগমন হইলে, তিনি এখানে বাসা করিয়া থাকেন। বাড়ীর সম্মুখে একটী পুষ্করিণী, তাহার চারি ধারে কতকগুলি নারিকেল গাছ,

এবং ১২টী "পাল গাদা" *। উহার এক একটী 'পাল গাদায়' প্রায় চারি হাজার টাকা মূল্যের ধান্য রক্ষিত হইয়াছে।

অপরাহ্ণ কাল। বারান্দা-সংলগ্ন তুলসীমঞ্চের উপরে বৃদ্ধ পঙ্কজ সাহু একটী কুঁড়োজালি (মালার বোটুয়া) হাতে করিয়া মালা জপ করিতেছেন। তাঁহার পরিধানে একখানি মোটা, ময়লা দেশী ধুতি—তাহা ধুতি, কি গামছা, ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। তবে এ কথা নিশ্চয় যে তাহা ৩।৪ মাস রজকের হস্তগত হয় নাই। গায়ে একখানা ময়লা গামছা। সর্ব্বাঙ্গে তিলকের ছাপা। তাঁহার জিহ্বা মৃদু স্বরে "ক্রুষ্ণ" "ক্রুষ্ণ" উচ্চারণ করিতেছে (উড়িষ্যায় ঋ কে রু বলিয়া উচ্চারণ করে); কিন্তু তাঁহার হস্ত সেই কৃষ্ণনামের সংখ্যা করিতেছে কি টাকার সুদের সংখ্যা করিতেছে, এ সম্বন্ধে মত প্রকাশ করা কঠিন।

"পিণ্ডার" দক্ষিণ ভাগে একটী ময়লা শতরঞ্চ পাড়া। তাহার উপরে মহাজনের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিম্বাধর সাহু উপবিষ্ট। বিম্বাধরের শরীর কিঞ্চিৎ স্থূল। বর্ণটি কালো, কিন্তু উজ্জ্বল, বার্ণিশ করা। দুই কানে দুইটী বড় বড় সোণার "ঝুলী" (কুণ্ডল) ও গলায় একছড়া সোণার "কণ্ঠী"। অনবরত পান খাওয়াতে তাঁহার দাঁতগুলি পাকা কালো জামের শোভা ধারণ করিয়াছে। মস্তক কপাল পর্য্যন্ত মুণ্ডিত; তাহার উপরে দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থানে চুল ছোট করিয়া থাক্ কাটা; তাহার উপরে কুঞ্চিত কেশদামে মস্তকের পশ্চাদ্‌ভাগে খোঁপা বাঁধা। কপালের ঠিক উপরে একটা বড় তিলকের ফোঁটা। কোমরে একছড়া রূপার "অণ্টাসূতা" (গোট) ছাড়া একটি পানের বোটুয়া ঝুলিতেছে।

বিম্বাধরের নিকটে "ছামকরণ" (গোমস্তা) বিচিত্রানন্দ মাহান্তি বসিয়াছেন। তাঁহার সম্মুখে এক বস্তা লম্বা তালপত্র; তিনি বামহস্তের তলে

* খড়ের মধ্যে রক্ষিত ধান্যের স্তূপ। বাহির হইতে দেখিলে খড়ের পালা বলিয়া বোধ হয়।

একটি লম্বা তাল-পত্র রাখিয়া দক্ষিণ হস্তের পাঁচটী অঙ্গুলি দ্বারা একটি লোহার লেখনী সজোরে ধারণ করিয়া কর্ কর্ শব্দে লিখিতেছেন (বা খাঁড়িতেছেন)। হংসপুচ্ছের কলম দিয়া সাহেব লোকে ফুলস্কাপ্ কাগজের উপর যেরূপ দ্রুতবেগে লিখিতে পারেন, বিচিত্রানন্দ মাহান্তি তাঁহার লেখনী দ্বারা সেই শুষ্ক শক্ত তালপত্রে সেইরূপ দ্রুতবেগে লিখিতেছেন।

তাঁহার সম্মুখে বারান্দার নীচে গলির মধ্যে চারি জন লোক বসিয়াছিল; বিচিত্রানন্দ লেখা শেষ করিয়া বলিলেন—

"আরে দামবারিক! তোর হিসাব হইল;—১০৲ টাকার ২ বৎসর, ৬ মাস, ১৩ দিনের সুদ ১৮৲ টাকা হইল; আর আসল ১০৲ টাকা—একুনে ২৮৲ টাকা হইল—বুঝিলি ত?"

দামবারিক কলিকাতা-ফেরত। তাহার নিদর্শনস্বরূপ দামবারিকের মাথায় টিকি ছাঁটা, তাহার হাতে একটা কাপড়ের ছাতা, এবং স্কন্ধদেশে একখানা ময়লা তোয়ালে বিদ্যমান। সে বলিল—

"হুজুর! আমি মূর্খ লোক, অন্ধ গরু, আমি তা কি জানি? আপনি কি আমাকে ঠকাইবেন? তবে আমার ওজোর, সেই সুদের ওজোরটা মহাজন শুনুন। টাকায় /০ আনা সুদ না ধরিয়া তিন পয়সা ধরুন। আমি গরিব লোক, আমার সাত প্রাণী কুটুম্ব। আমি আর কি কহিব? হুজুরের কোন্ কথা অজ্ঞাত আছে—আমি গরু চরাই, হুজুর মানুষ চরান!"

বিম্বাধর। "না, তা হবে না, তোর সেই এক আনা হিসাবেই সুদ দিতে হইবে। তোকে ছাড়িয়া দিলে আরও দশ জনকে ছাড়িয়া দিতে হয়। এই যে শ্যাম বেহারা টাকা দিয়া গেল, তাহার অপরাধ কি? ছামকরণ! দেখ, হিসাবে ভুল হয় নাইত?"

বিচিত্রানন্দ। "না, হিসাব ঠিক হইয়াছে।"

দামবারিক দেখিল, এখানে ওজোর করিয়া কোন ফল হওয়ার

সম্ভব নাই। সে আজ দশ দিন হইল "কল্‌কত্তা" হইতে কিছু টাকা রোজগার করিয়া নিয়া বাড়ী আসিয়াছে। এখন হাতে থাকিতে থাকিতে টাকাটা শোধ না করিলে, পরে তাহার ভ্রাতা নন্দবারিক তাহার ছেলের বিবাহের জন্য হাওলাত চাহিতে পারে। সেই ভয়ে সে টাকাটা নিজের কোমরের বোটুয়া বাহির করিয়া গণিয়া দিতে আরম্ভ করিল। ছাম করণও তাহার তমঃস্সুক খানা বাহির করিয়া ছিঁড়িবার উদ্যোগ করি- লেন। ইতিমধ্যে বৃদ্ধ পঙ্কজ সাহু হুঙ্কার ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

পঙ্কজ। "আরে বিম্বা! তুই একটা "গধা—হুণ্ডা"! এই রকম করিয়া তোরা মহাজনি করিয়া খাইবি? ছামকরণ হিসাবে ভুল করিল, তুই তাহা ধরিতে পারিলি না? ছামকরণে! * তুমিই বা কি খাইয়া হিসাব করিলে? সুদ ১৯/০ হইবে, না ১৮৲ টাকা? আর একবার হিসাব করত? ক্রুষ্ণ—ক্রুষ্ণ—ক্রুষ্ণ······"

বৃদ্ধের এই ধমক শুনিয়া, বিম্বাধর তাহার কোমর হইতে এক টুক্‌রা গোল খড়িমাটী বাহির করিয়া, তাহার পশ্চাতের মাটির দেওয়ালের গায়ে অঙ্ক কসিতে আরম্ভ করিল। ছামকরণও লজ্জিত হইয়া আবার লৌহ- লেখনী ধারণ করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে বিম্বাধর বলিল—"হাঁ ভুল হইয়াছিল; ১৯/০ আনাই ঠিক।"

ছামকরণ। "হাঁ, ১৯/০ আনাই হইবে, আমার ভুল হইয়াছিল। রে দামা! তুই ফাঁকি দিয়া যাইতেছিলি! ছড়া—"কল্‌কত্তাই" জুয়াচোর!"

দামবারিক। (একটু হাসিয়া) "আজ্ঞে না; আমি মূর্খ; আমি হিসাবের কি বুঝি? তবে আপনাদের হিসাবমতে কিছু বেশী ধরিয়াছেন; ১৯৷৪ উনিশ টাকা চারি পাই হইলেই হিসাবটা ঠিক হয়; আমি গরিব লোক; যাহা হউক, আমি ১৯৲ টাকাই দিতেছি, খতখানা এ দিকে দিন্‌।

* উড়িয়া ভাষায় অকারান্ত শব্দ সম্বোধনে একারান্ত হয়, যথা—দাসে, মিশ্রে, ইত্যাদি।

পঙ্কজ। "ছড়া! তোকে আবার ছাড় দেবে? ছড়া,—জুয়াচোর! যখন হিসাবে কম হইয়াছিল, তখন ছিলি তুই মূর্খ, এখন কয়েকটা পাই বেশী ধরা হইয়াছে দেখিয়া, তুই হ'লি পণ্ডিত! ছড়া আচ্ছা সেয়ানা! আচ্ছা দে—দে—১৯৲ টাকাই দে—ছড়া—কৃষ্ণ—কৃষ্ণ—কৃষ্ণ..."

তখন দামবারিক ১৯৲ টাকা গণিয়া ছামকরণের হাতে দিল। ছামকরণ তাঁহার প্রাপ্য "দস্তুরি" চাহিলেন। তাঁহাকেও ।০ চারি আনা দিতে হইল। তখন তিনি তমঃসুকখানা মধ্যে ছিঁড়িয়া দামবারিকের হস্তে দিলেন; সে প্রস্থান করিল।

ইতিমধ্যে ধরমু ভুঁই নামক একজন কণ্ডুরা (অস্পৃশ্য জাতি, উড়িষ্যার আদিম নিবাসী) আসিয়া পঙ্কজ সাহুর সম্মুখে সেই তুলসীমঞ্চের নীচে অধোমুখে হাত পা ছড়াইয়া লম্বা সটান হইয়া শুইয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল—

"মহাজনে! আমাকে রক্ষা করুন! আমি নিতান্ত "অকর্ত্তব্য" (অক্ষম) লোক!—আমার পাঁচ প্রাণী কুটুম্ব "ভোক্কে" মারা গেল!—আজ তিন দিন কিছুই খায় নাই, ঘরে একটা দানাও নাই, আমাকে কিছু ধান কর্জ্জ দেন, না দিলে আমি মরিয়া যাইব, আমার পাঁচ প্রাণী কুটুম্ব মরিয়া যাইবে!"

পঙ্কজ। "ওঠ্ রে ওঠ্!—তোকে কিছুই দিব না! গত বৎসর তুই এক ভরণ ধান নিয়া খাইয়াছিস্, তাহার সুদ সমেত দেড় ভরণ হইয়াছে। তুই এ পর্য্যন্ত তাহার একটা ধানও উসুল করিলি না। তোকে আর ধান দিতে পারি না। এইরকম দিতে দিতে আমার সব ধান ও টাকা ডুবিয়া গেল। ওঠ্ রে ওঠ্!—কৃষ্ণ—কৃষ্ণ—কৃষ্ণ।"

ধরমু। মণিমা! * আমি উঠিব না—আমার প্রতি দয়া করুন! ধর্ম্মবিচার হউক! নতুবা আমাকে মারিয়া ফেলুন! আমাকে এখন দশ গৌণী † ধান না দিলে, আমি এখানে পড়িয়া মরিব!

* মণিমা—হে প্রভু!

† ১ গৌণী—৪ সের।

ইত্যবসরে পঙ্কজ সাহুর গৃহিণী শ্রীমতী ডালিম্ব একটি পিতলের ঘড়া লইয়া বাড়ীর ভিতর হইতে বাহির হইলেন, এবং গলির মধ্যের পাকা কূপটীর দিকে জল তুলিতে গেলেন। তাঁহার বেশভূষা সম্বন্ধে পাঠকবর্গের কৌতূহল জন্মিবার কোন কারণ নাই। তবে তাঁহার বিশেষত্ব এই যে তাঁহার গহনাগুলি কাঁসার না হইয়া প্রায়ই রূপার, সেই দুই লক্ষ টাকার মহাজনের গৃহিণী হাতে একজোড়া রূপার "বাউটি," পায়ে রূপার "গোড়-বালা," কাণে সোণার "কর্ণফুল," নাকে একটা সোণার বড় নথ, এবং গলায় এক ছড়া রূপার মালা পরিয়াছেন। এখন গৃহিণী যে পথে জল তুলিতে যাইবেন, ধরমু ভুঁই তাহা অবরোধ করিয়া শুইয়া আছে, গৃহিণীকে আসিতে দেখিয়া সে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল—

"সান্তানি!" * আমাকে রক্ষা কর!—আমার পাঁচ প্রাণী কুটুম্ব ভাত বিনা মারা গেল—বেশী না, আমি দশ গৌণী ধান চাই, আজ তিন দিন উপবাস—আমি উঠিব না, আমি "বাট" ছাড়িব না—আমাকে মারিয়া ফেল"!—ইত্যাদি।

গৃহিণীর হৃদয় স্বভাবতঃ কোমল; ধরমু ভুঁইয়ের কাতরোক্তিতে তাহা একেবারে গলিয়া গেল। তিনি বৃদ্ধ মহাজনকে বলিলেন—

"দাও না—উহাকে দশ গৌণী ধান দাও!—না খাইয়া মানুষ মারা যায়—তুমি কেবল পুঁজি করা বোঝ!—(পুত্রকে সম্বোধন করিয়া) ওরে বিম্বা! দে ধরমুয়াকে ১০ গৌণী ধান মাপিয়া দে!—সে প্রাণে বাঁচলে অবশ্যই শোধ করিতে পারিবে।"

তখন বৃদ্ধ মহাজন বলিলেন—

"তুই আমার ঘরের লক্ষ্মী কি না? তোর পরামর্শ মত কাজ করিলে,

* সান্ত শব্দ সামন্তের অপভ্রংশ; ভদ্রলোকদিগের প্রতি সম্বোধনে প্রযুক্ত হয়। স্ত্রীলিঙ্গে "সান্তানী"।

এত দিন আমার ঘর খানি খালি হইত! তুই তোর কাজ দেখ্ গিয়া, বাড়ীর ভিতর যা!—কৃষ্ণ—কৃষ্ণ—কৃষ্ণ।”

গৃহিণী। (ক্রোধভরে হাত নাড়িয়া ও অঙ্গভঙ্গি করিয়া) “কি? আমি বুঝি তবে অলক্ষ্মী? আমি অলক্ষ্মী হইলে, তোমার এত টাকার সুসার সম্পত্তি কোথা হইতে হইত? তুমি বুড়া হইলে, এখন একটু দয়া ধর্ম্ম কর!—এ সব ধান টাকা তোমার সঙ্গে যাইবে না!”

জনক-জননীর এই কলহ পুত্র বিম্বাধরের ভাল লাগিল না। বিশেষতঃ জননীর শেষ কথার কোন প্রতিবাদ হইল না দেখিয়া সে জনকেরই পরাজয় স্থির করিল। তাই সে সপনী দাস চাকরকে ১০ গৌণী ধান বাহির করিয়া ধরমুয়াকে দিতে বলিয়া দিল এবং তাহার নামে হিসাব লিখিয়া রাখিতে বলিল।

তখন উপস্থিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে আর্ত্তদাস বিম্বাধরকে বলিল—

“আমার একটি ছেলের বিবাহ দিতে হইবে, আমি ২০৲ টাকা চাই।”

বিম্বা। “তোমার আর কিছু দেনা আছে?”

আর্ত্ত। “আজ্ঞে আছে। সেই ৩ বৎসর হইল আমার মেয়ের বিবাহের সময়ে যে ১৫৲ টাকা নিয়াছিলাম, তাহার সুদ শোধ করিয়াছি, আসল টাকাটা এখনও দিতে পারি নাই।”

বিম্বা। “তবে সে টাকাটা শোধ না দিলে, আর টাকা কেমন করিয়া পাইবে?”

আর্ত্ত। “আজ্ঞে, তা এখন কোথা হইতে দিব? আমার আর এক দায় উপস্থিত, এই বৈশাখ মাসে ছেলের বিবাহ না দিলে চলে না—সেই ১৫৲ টাকা আর ২০৲ টাকা এই ৩৫৲ টাকার এক সঙ্গে খত দিব।”

বিম্বা। “তবে তোমার কিছু জমি বন্ধক দিতে হইবে—এত টাকা বিনা বন্ধকে দিব না। দুই মান (প্রায় ২ একর) জমি বন্ধক দিলে এই টাকা মিলিবে।”

আর্ত্ত। আজ্ঞে, দুই মান পারিব না, এক মান দিতে পারি। সেই এক মানের মূল্যও ত কম নহে. ৪০৲। ৫০৲ টাকা হইবে।

বিশ্বা। আচ্ছা, কাগজ কিনিয়া আন।

তখন আর্ত্তদাস উঠিয়া গেল।

যখন দামবারিকের হিসাব হইতেছিল, তখন চিন্তামণি নায়ক আসিয়া সকলের পশ্চাতে বসিয়াছিল। সে এতক্ষণ সুযোগের অভাবে কোন কথা বলে নাই। এখন বলিল—আজ্ঞে, আমার একটা "অনুসরণ"। আমিও এই বৈশাখ মাসে আমার মেয়ের বিবাহ দিতে চাই। আমাকে ১৫৲ টাকা কর্জ্জ না দিলে চলিবে না।

বিশ্বা। কেন? তোমার মেয়ের বিবাহের এত তাড়াতাড়ি কেন? আরও কিছু দিন যাক্।

মণি। আজ্ঞে, তাহার বয়স ত কম হয় নাই—এই মাঘ মাসে ১৮ বৎসরে পড়িয়াছে। এই বৈশাখে বিবাহ না হইলে, আর শীঘ্র হইবে না; এক বৎসর অকাল পড়িবে।

বিশ্বা। আচ্ছা, তোমার আর কত টাকা কর্জ্জ আছে? সেগুলি শোধ করিয়াছ?

মণি। না, কোথা হইতে দিব? এই এক বৎসর হইল আমার মায়ের শ্রাদ্ধের জন্য ১৫৲ টাকা নিয়াছিলাম, তাহার কেবল সুদ দিয়াছি।

বিশ্বা। না—সে টাকা শোধ না করিলে, তোমাকে আর টাকা দিতে পারিব না।

মণি। আজ্ঞে, আপনি না দিলে আমি কোথায় যাইব? আপনি প্রতিপালনকর্ত্তা; এই দায়ে ঠেকিয়াছি, আপনি উদ্ধার না করিলে কে করিবে? আপনি মানুষ চরান, আমি গরু চরাই।

বিশ্বা। তোমার মেয়ের বিবাহ এখন দিও না।

মণি। আজ্ঞে, মেয়ে বড় হইয়াছে, এবার বিবাহ না দিলে লোকে নিন্দা করিবে—

বিম্বা। না, তুমি টাকা পাইবে না।

মণি। আজ্ঞে, এই আৰ্ত্তদাস এক মান জমি বন্ধক রাখিয়া ১৫৲ টাকা কৰ্জ্জ পাইবে, আমিও সেই এক মান জমি রাখিতে প্রস্তুত আছি। তাহার চেয়ে আমার বেশী ঠেকা কাজ; তাহার ছেলের বিবাহ, দুই বৎসর পরেও হইতে পারে।

বিম্বা। তোমার মেয়ের বিবাহও দুই বৎসর পরে দিও।

মণিনায়ক অনেক কাকুতি-মিনতি করিল, তাহার পরিবারের জীবন-সম্বল এক মান জমি পর্য্যন্ত বন্ধক দিতে চাহিল। কিন্তু মহাজনের পাষাণ-হৃদয় কিছুতেই গলিল না। তখন মণিনায়ক বিমর্ষচিত্তে সেখান হইতে উঠিয়া বাড়ী গেল।

বিম্বাধরও সন্ধ্যা আগতপ্রায় দেখিয়া কাছারি ভঙ্গ করিয়া অন্দরে প্রবেশ করিল।
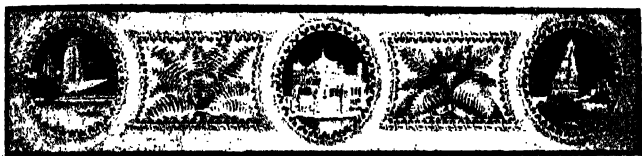
চতুর্থ অধ্যায়।

উড়িষ্যার পাঠশালা।

নীলকণ্ঠপুরের পঙ্কজ সাহু মহাজনের বাড়ীতে একটা পাঠশালা ("চাটশালী") আছে। মহাজনের ঘরের পশ্চিম দিকে, পুষ্করিণীর পাড়ে, একখানি ক্ষুদ্র খড়ের ঘর; তাহার তিন দিকে মাটির দেওয়াল, পূর্ব্ব দিকে দরজা। এই ঘরে এবং কখন কখন ইহার পূর্ব্ব দিকে পরিষ্কৃত উঠানে পাঠশালা বসে। সেই উঠানটি গোময় ও মাটি দিয়া নিকানো; শুক্‌না খট্‌খটে।

বেলা অপরাহ্ণ, প্রায় সন্ধ্যা সমাগত। সূর্য্য পশ্চিমাকাশে হেলিয়া পড়িয়া, নিষ্প্রভ হইয়া ক্রমে আকাশের গায়ে মিলিয়া যাওয়ার উপক্রম করিতেছেন। উঠানের উপরে নিপতিত নারিকেল গাছের ছায়া ক্রমে ঘনীভূত হইয়া গভীর কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হইতেছে। বাতাসে সেই গাছের পাতাগুলি কম্পিত হওয়াতে, ছায়াগুলিও কাঁপিতে কাঁপিতে একটীর সঙ্গে অন্যটী মিলিত হইতেছে। সেই পাঠশালা-গৃহের ছায়াতে, উঠানে ২০।২৫টী বালক পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বা ভাবে দুই সারি হইয়া বসিয়াছে। তাহাদের মধ্যস্থলে, "অবধানী" বা গুরুমহাশয় দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া, সেই চির-প্রচলিত ও সর্ব্বদেশের বালকবৃন্দের চিরপরিচিত বেত্রহস্তে একটী মনো-

ফাঁকা, এক-দিকে-খোলা, কাঠের কেরোসিনের বাক্সের উপর বসিয়াছেন। গুরুমহাশয়ের নাম বামদেব মাহান্তি; তিনি জাতিতে "করণ"; তাঁহার পরিধানে একখানা ময়লা মোটা দেশী ধুতি; স্কন্ধদেশে একখানা ময়লা গামছা; গলায় এক ছড়া মালা, তাহার মধ্যে মধ্যে কয়েকটী সোণার ছোট মাদুলী গাঁথা। দুই কাণে দুইটী সোণার "মুলী", বামকর্ণের উপরে একটী সোণার আঙটী *। গুরুমহাশয়ের মাসিক আয় ৪।৫ টাকা। তিনি ছাত্রদিগের নিকট হইতে, তাহাদের অবস্থানুসারে কাহারো নিকট এক আনা, কাহারো নিকট দুই আনা, কাহারো নিকট চারি আনা হিসাবে, মাসিক বেতন আদায় করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক ছাত্র পালাক্রমে তাঁহাকে প্রতিমাসে একটি করিয়া "সিধা" দিয়া থাকে। তাহা ছাড়া, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি উপলক্ষে তাঁহার কিঞ্চিৎ প্রাপ্তি আছে।

এই ত গেল গুরুমহাশয়ের পাঠশালার আয়। এতদ্ভিন্ন তিনি মহাজনের তমঃসুকাদি লিখিয়া মাসে মাসে কিছু রোজগার করেন। আর কখন কখন খতের নালিশ উপস্থিত হইলে, তিনি পুরী মুনসেফী আদালতে মহাজনের পক্ষে আবশ্যকমত সত্য মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া থাকেন; তাহাতেও তাঁহার বেশ দু পয়সা লাভ হয়।

এখন কিন্তু তিনি অধ্যাপন কার্য্যে নিযুক্ত। ছাত্রগণ তাঁহার দুই পার্শ্বে, খেজুর পাতার চাটাই পাতিয়া বসিয়া, কেহ বা খালি মাটিতে বসিয়া, লেখা পড়া করিতেছে।

আমার ভুল হইয়াছে। এই ২০।২৫টী ছাত্রের মধ্যে ৪।৫টী ছাত্রীও আছে। কিন্তু সেই বালিকা কয়েকটীকে এই বালকবৃন্দের মধ্য হইতে

---

* এই কাণের আঙটী দ্বারা বুঝা যায়, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হইলে, তাঁহার [illegible] হইয়াছিল। কাহারও একটা ছেলে মরার পরে আর একটী জন্মিলে, এই আঙটীরূপ বড়শী দিয়া ফুঁড়িয়া তাহাকে যমের হাত হইতে রক্ষা করা হয়। "নাক ফুঁড়ি", "কাণ ফুঁড়ি" এই সকল নামেরও উৎপত্তি এইরূপে।

বাছিয়া বাহির করা আমার সাধ্য নহে। ৯।১০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বালক ও বালিকাগণ একই ভাবে (অর্থাৎ কাছাকোঁচা দিয়া) কাপড় পরিয়া থাকে ; বালকদিগের মাথায়ও সেই সমুন্নত খোপা, তাহার সহিত লাল-সূতার ফুল ("পাট ফুলী") ও কয়েকটী রূপার নাম-জানি-না অলঙ্কার ("চৌরী মুণ্ডীয়া") ঝুলিয়া থাকে। বালকগণও তাহাদের অবস্থা অনুসারে ২।৪ খানা গহনা পরিয়াছে, যথা—হাতে রূপার বালা, পায়ে রূপার মল, গলায় রূপার মালা, ইত্যাদি। কেবল দুইটী বালক গলায় এক এক ছড়া মোহর গাঁথিয়া পরিয়াছে ; বলা বাহুল্য, ইহারা মহাজনের বাড়ীর ছেলে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে স্থানটীতে এই পাঠশালা বসিয়াছে, তাহা ঘরের বাহির হইলেও ঘরের মেঝের ন্যায় পরিষ্কৃত। ছাত্রগণ লম্বা লম্বা খড়ী-মাটির কলম দিয়া সেই ভূমিরূপ কাগজের উপরে লিখিতেছে। যেমন ইংরেজ, জর্ম্মাণ, রুস, প্রভৃতি প্রবল পরাক্রমশালী জাতিসকল এই পৃথিবীটাকে তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর ভাগ বণ্টন করিয়া নিয়াছেন বা নিতেছেন, এই পাঠশালার ছাত্রগণও সেই পরিষ্কৃত ভূমিখণ্ডকে, খড়ীমাটির চিহ্ন দ্বারা সীমানির্দ্দেশ করিয়া, আপনাদের মধ্যে ভাগ করিয়া নিয়া তাহার উপরে লিখিতেছে। আমার বোধ হয় উক্ত সুসভ্য জাতিসকলও এই প্রকার পাঠশালায় শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

ছাত্রগণ প্রথমতঃ, খুব বড় বড় করিয়া ভূমির উপরে খড়িমাটি দিয়া লেখে, পরে তাহাদের জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, সেই বড় বড় অক্ষর ক্রমশঃ ছোট হইতে থাকে। স্থূল হইতে সূক্ষ্ম হওয়াই উন্নতির চিরন্তন-প্রণালী। পরে মাটির উপরে ছোট অক্ষরে নাম, অঙ্ক, প্রভৃতি লেখা শিক্ষা হইলে, তালপত্রের উপরে লৌহ-লেখনী দ্বারা লেখা শিক্ষা করিতে হয়। তাল-পত্রের লেখা অভ্যস্ত হইলে, অক্ষরগুলি আণুবীক্ষণিক আকার প্রাপ্ত হয়। আমাদের বাঙ্গালাদেশে বিদ্যাশিক্ষা তালপত্রে আরম্ভ হয় (বা এক সময় হইত), উড়িষ্যায় তাহা তালপত্রেই শেষ হয়। তালপত্রে লৌহ-লেখনী

দ্বারা অক্ষর খাঁড়িতে হয়। সুতরাং উড়িষ্যার পাঠশালায় কালী নামক পদার্থের ব্যবহার আদৌ প্রচলিত নাই।

আজকাল আমাদের বাঙ্গালা দেশের পাঠশালার ছেলেদিগকে ক খ, কর, খল, লাল ফুল, ভাল জল, প্রভৃতি পাঠশিক্ষা দেওয়ার জন্য নানা রকম ছবি ও ছড়ার বই প্রস্তুত হইতেছে। ছবি ও ছড়ার শর্করা মাধুর্য্যে ভুলাইয়া, বর্ণমালার সুতিক্ত কুইনাইন-বটিকা সুকুমারমতি শিশুদিগের গলাধঃকরণ করাইবার, নানারকম কলকৌশল আবিষ্কৃত হইতেছে। কিন্তু উড়িয়া বালকবালিকাগণের বর্ণমালা প্রভৃতি শিক্ষার জন্য সেরূপ ছড়া বাঁধার আদৌ প্রয়োজন হয় না। তাহারা—

"অজগর আস্‌ছে তেড়ে, আঁবটী আমি খাব কেড়ে"
"খোকা হাসে হি হি, হ্রস্ব ই দীর্ঘ ঈ"

ইত্যাদি ছড়ার সহায়তা গ্রহণ না করিয়াও শুদ্ধ ক খ গ ঘ এই সকল বর্ণমালার মধ্য হইতে অদ্ভুত কবিতার সুর বাহির করিয়া পড়িতে পারে; নীরস বর্ণমালার কঙ্কালরাশির মধ্যে সুরযোজনা দ্বারা তাহারা কাব্যরসের অবতারণা করিতে পারে। তাহাদের কর, খল, লাল ফুল, ভাল জল, পড়া শুনিলে দূর হইতে চণ্ডীপাঠ বলিয়া ভ্রম জন্মিবে। বাল্যকালে এইরূপ সুর করিয়া পড়ার অভ্যাস বৃদ্ধবয়স পর্য্যন্তও তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। তাই গবর্ণমেণ্ট আফিসেও উড়িয়া আমলাগণকে দরখাস্ত, দলিল, দস্তাবেজ, প্রভৃতি ভয়ঙ্কর গদ্যময় রচনাগুলিও চণ্ডীপাঠের সুরে পড়িতে দেখা যায়!

বলা বাহুল্য, এই পাঠশালাটীতেও নানারকম পাঠ নানারকম স্বরে ও নানারকম সুরে পঠিত হইতেছিল। মধ্যে মধ্যে গুরুমহাশয়ের রাসভ-নিন্দিত স্বর, বালকগণের কোমল কণ্ঠের সহিত মিলিত হইয়া, এক অভিনব সঙ্গীতের সৃজন করিতেছিল! কখনও বা গুরুমহাশয়ের বেত্র-তাড়ন ও হুঙ্কার-ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছিল।

এ স্থলে গুরুমহাশয়ের বিদ্যার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তিনি যে সময়ে মাথায় "পাটফুলী" ও "চৌরীমুণ্ডী" এবং হাতে পায়ে রূপার খাড়ু পরিয়া "চাটশালী"তে যাইতেন, তখন, তাঁহার সৌভাগ্যবশতঃ কি দুর্ভাগ্যবশতঃ বলা সহজ নয়, বোধোদয়, চরিতাবলী, কথামালা* প্রভৃতি পুস্তকের উড়িয়া ভাষাতে অনুবাদ হয় নাই। ক খ ফলা বানান শিক্ষার জন্য প্রথমভাগ ও দ্বিতীয়ভাগস্থানীয় কোন পুস্তকের আবিষ্কার হইয়াছিল কি না, তাহার ঠিক খবর দেওয়া অসম্ভব। তখন প্রাচীন ভারতে গুরুপরম্পরা-প্রচলিত ব্রহ্মবিদ্যার ন্যায়, বৈষয়িকী বিদ্যাও গুরুপরম্পরাগত ছিল বলিয়া বোধ হয়; অর্থাৎ, কোন ছাপান উড়িয়া বই প্রচারিত না থাকিলেও গুরুমহাশয় অন্য গুরুর নিকটে ফলা বানান হইতে আরম্ভ করিয়া, নাম লেখা, পত্র লেখা, মৌখিক অঙ্ককসা, প্রভৃতি দস্তুর মাফিক শিক্ষা করিয়াছিলেন। আমাদের দেশের শুভঙ্করীর ন্যায় উড়িষ্যায় মৌখিক অঙ্ককসার সুন্দর নিয়ম আছে। সাত টাকা সাড়ে তের আনা মণ হইলে, সাড়ে দশ ছটাকের দাম কত? ইত্যাকার হিসাব, যাহা ঠিক করিতে আমি-হেন ইংরাজীওয়ালাদিগের ত্রৈরাশিক কসিতে কসিতে মাথা ঘুরিয়া যাইবে, সেই উড়িয়া শুভঙ্কর মহাশয়ের প্রসাদাৎ আমাদের এই গুরুমহাশয় এবং তাঁহার ছাত্রদিগের তাহাতে এক মিনিটও লাগে না। গুরুমহাশয়ের শিক্ষা এই নিম্ন স্তরেই শেষ হয় নাই। তিনি উপেন্দ্রভঞ্জের "বৈদেহীশ বিলাস," জগন্নাথ দাসের "ভাগবত," দীনকৃষ্ণ দাসের "রসকল্লোল" প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষরূপে পাঠ করিয়াছেন; এবং আবশ্যক মতে তাহা হইতে পদসকল সুরসংযোগে আবৃত্তি করিয়া তাঁহার ছাত্রবৃন্দ ও গ্রামের কৃষকমণ্ডলীকে বিস্ময়ে মুখব্যাদান করাইতে পারেন।

* "উৎকল-দীপিকার" সম্পাদক শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর রায় মহাশয়ের দ্বারা প্রথমতঃ এই সকল স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ উড়িয়া ভাষায় অনূদিত হয়। ইনি একজন উড়িষ্যাবাসী বাঙ্গালী। উড়িয়া ভাষা ইহার নিকট বিশেষরূপে ঋণী। ইহা বাঙ্গালীমাত্রেরই গৌরবের বিষয়।

তিনি নিজেও দুই একটী "গীত" বা "পদ" রচনা করিয়াছেন। গুরুমহাশয়ের ন্যায় অশিক্ষিত (অর্থাৎ ছাপার-বই-পড়া-বিদ্যা-বিহীন) লোকের পক্ষে এইরূপ কাব্যশাস্ত্র আলোচনা ও কবিতা রচনা করা, আমাদের দেশে অসম্ভব হইলেও উড়িষ্যায় অসম্ভব নহে। আমাদের পুস্তকগত বাঙ্গালা ভাষা ও কথাবার্ত্তায় প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ রহিয়াছে, উৎকলভাষায় সেরূপ কোনও প্রভেদ নাই। সেইজন্য গুরুমহাশয়ের ন্যায় শিক্ষিত লোকে, এমন কি সামান্য লেখা পড়া যাহারা জানে, তাহাদিগকেও "উৎকল-দীপিকা" * পড়িতে দেখা যায়। ইয়োরোপে ও আমেরিকায় কুলি-মজুরেও সংবাদপত্র পড়ে; ভারতবর্ষে যদি সে শুভদিন কখনও হয়, তবে তাহা আগে উড়িষ্যায় হইবে।

গুরুমহাশয় একটী ছাত্রকে অঙ্ক কসিতে বলিলেন। "আরে রাধুয়া অঙ্ক কস্! এক গ্রামে তিন হাজার চারি শত উনআশী জন লোক ছিল, তাহার মধ্যে এক হাজার দুই শত আটচল্লিশ জন "হায়জা" বেমারিতে (কলেরায়) মারা গেল; কত জন রহিল? শীঘ্র শীঘ্র কস্!"

আজ্ঞা পাইবামাত্র রাধুয়া খড়িমাটি দিয়া ভূমিতলে অঙ্কগুলি লিখিল ও সুর করিয়া বিয়োগ করিতে লাগিল। মাটিতে একটী অঙ্ক লেখে, আবার মোছে। সে হয়ত মনে ভাবিতেছিল উক্ত "হায়জা" বেমারী গুরুমহাশয়কে চিনিল না কেন! তাহা হইলে, তাহার এই দুর্দ্দৈব ঘটিত না। যাহা হউক, অনেকবার লেখা, অনেক বার মোছার পরে, সে এই অঙ্কের ফল বলিল ১৩৪৯। যেমন বলা, অমনি বেতের ঘা! যেন চপলা-চমকের পরক্ষণেই গভীর গর্জ্জন। তখন সে সম্মুখবর্ত্তী দুইটী ক্ষুদ্র বালকের হাস্যোৎপাদন করিয়া "হাউ" "হাউ" করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহাদের হাসি দেখিয়া, রাধুয়ার মনে রাগ হইল। সে একটী চক্ষু গুরু-

* সাপ্তাহিক সংবাদপত্র কটক হইতে প্রকাশিত হয়।

মহাশয়ের দিকে রাখিয়া, অন্য চক্ষুটী দ্বারা তাহাদিগকে শাসাইতে লাগিল—"ছুটীর পর দেখা যাবে।"

সংপ্রতি এই পাঠশালাটীতে একটী উচ্চ প্রাইমেরী শ্রেণী খোলা হইয়াছে। কিন্তু, বলা বাহুল্য, গুরুমহাশয়ের বিদ্যা সেই নিম্ন প্রাইমেরী মাফিক রহিয়া গিয়াছে। তিনি একজন উচ্চ প্রাইমেরী শ্রেণীর বালককে ভূগোলের পাঠ দিতে আরম্ভ করিলেন। বালকটি পড়িল "পৃথিবীর আকার গোল" (অবশ্য উড়িয়া ভাষাতে) এবং গুরুমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিল—

"আজ্ঞে, পৃথিবী কি গোল?"

গুরু। হাঁ, গোল বৈ কি!

ছাত্র। কই আমরা ত গোল দেখি না? আমরা দেখি পৃথিবী সমতল। এই আমাদের গ্রাম, সে গ্রাম, এই সকল মাঠ ময়দান,—ইহার কিছুই ত গোল দেখা যায় না?

গুরু। আরে সে গোল কি দেখা যায়? সে কেবল বই পড়িয়া মুখস্থ করিয়া রাখিতে হয়, পরে পরীক্ষার সময় বলিতে হয়।

ছাত্র। তবে ইহার কোন্‌টা সত্য, এই দেখা কথা, না শুনা কথা?

গুরুমহাশয় দেখিলেন, ছাত্র কোনক্রমেই ছাড়ে না, বড়ই "বেয়াদপ"। তাহাকে বুঝান বড় বিপদ। কিন্তু গুরুমহাশয়েরও বুদ্ধির দৌড় কম ছিল না। তিনি বলিলেন—

"তা জানিস্ না—আরে 'গধা', 'হুণ্ডা' * ! শুনা কথা অপেক্ষা দেখা কথাই অধিক বিশ্বাস করিতে হইবে—এই সে দিন, আমি পুরীর মুন্সেফী আদালতে এক মোকর্দ্দমার সাক্ষ্য দিতে গিয়াছিলাম; আমি

* হুণ্ডা ব্যাঘ্র জাতীয় জন্তুবিশেষ—গো-বাঘা ইতি ভাষা। ইহারা মানুষ খায় না; ছাগল ভেড়া ধরে, কিন্তু মানুষের কাছে আসে না। শরীর খুব মোটা, বুদ্ধিও আকারসদৃশী বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

জবানবন্দীতে বলিলাম, এ কথা আমি শুনিয়াছি। উকীল বলিলেন 'হুজুর! এ শুনা কথা, ইহা অগ্রাহ্য'। উকীলের সেই সওয়াল শুনিয়া হাকিম আমার সেই শুনা কথা অগ্রাহ্য করিলেন। অতএব দেখ, শুনা কথার কোন মূল্য নাই! যাহা নিজের চক্ষে দেখিবে, কেবল তাহাই বিশ্বাস করিবে। আমরা পৃথিবী গোল দেখি না, সমতল দেখি; পৃথিবী সমতল বলিয়াই বিশ্বাস করিতে হইবে। তবে পরীক্ষা দেওয়ার সময় বলিবে 'পৃথিবী গোল।'—আরে সে কে যায়? মণিনায়ক? শোন, শুনিয়া যাও! তুমি কোথায় যাইতেছ?"

বলা বাহুল্য, মণিনায়ককে 'দাণ্ড' দিয়া যাইতে দেখিয়া, গুরুমহাশয়ের প্রখর দৃষ্টি (যেমন মাছের প্রতি চিলের দৃষ্টি তদ্রূপ) তাহার উপরে পড়িল। অমনি ভূগোল-ব্যাখ্যা স্থগিত হইল।

মণিনায়ক আসিয়া "অবধান" বলিয়া দণ্ডবৎ করিল ও বলিল "আমি মহাজনের কাছে গিয়াছিলাম।"

গুরু। তোমার রঘুয়াকে পাঠশালায় দাও না কেন?

মণি। আজ্ঞে, আমরা চাষা লোক, নিতান্ত গরিব, আমাদের লেখা পড়া শিখিয়া কি হবে? জমি চাষ করা শিখিলেই হইল।

গুরু। আরে তুমি বোঝ না! আজকালকার দিনে একটু লেখা পড়া না শিখিলে চলে না। তোমরা মূর্খ বলিয়া সকলে তোমাদিগকে ঠকায়। তুমি যদি ৩৲ টাকা খাজানা দাও, জমিদার তোমার "পউতিতে" (দাখিলায়) ২৲ টাকা উসুল দেয়। মহাজনের দেনা ১০৲ টাকা শোধ করিলে, সে হয় ত খতের পৃষ্ঠে ৯৲ টাকা উসুল দিয়া, তোমাকে ৯৲ টাকার রসিদ দেয়। তোমার সুদ ৩৲ টাকা স্থলে ৫৲ টাকা ধরিয়া লয়। অবশ্য পঙ্কজ সাহুর ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ মহাজন কয় জন? তাই বলি, আজকালকার দিনে একটু লেখা-পড়া না জানিলে চলিবে না। অন্ততঃ নাম দস্তখতটা শিক্ষা করা একান্ত দরকার!

মণি। আমি গরিব, পয়সাকড়ি কোথায় পাব? মাসমাহিয়ানা, পুস্তকের দাম, কে দিবে?

গুরু। আচ্ছা, তুমি রঘুয়াকে কাল থেকে এখানে পাঠাইয়া দিও। আমি তাহাকে পড়াইব; তুমি মাসে এক আনা দিতে পার বিলক্ষণ, না দিতে পারিলে আমি চাই না। আর প্রথম প্রথম বই কিনিতে হবে না, আগে খড়ী দিয়া মাটির উপরে লেখা শিখিবে।

মণি। সে আপনার দয়া। কিন্তু আমার গরু কয়টা কে রাখিবে? আমি ত সকালে উঠিয়াই জমি চাষ করিতে যাই?

গুরু। তাইত! আচ্ছা, তুমি তাহাকে বিকালে পাঠশালায় পাঠাইও, সকালে সে গরু রাখিবে।

মণি। আজ্ঞে, তাই হবে। কিন্তু এখন আমার মেয়ের বিবাহের জন্য বড় দায় ঠেকিয়াছি। আপনি বলিলেন, পঙ্কজ সাহু ধর্ম্মপরায়ণ; কিন্তু আমার প্রতি তাঁহার বড় "অনুরাগ" দেখিলাম। আর্ত্তদাস এক মান জমি রাখিয়া ২০৲ টাকা কর্জ্জ পাইল, আর আমিও সেই এক মান রাখিতে চাহিলাম, তবু আমাকে ১৫টী টাকা দিল না! আমি কত করিয়া বলিলাম, এই বৈশাখ মাসে আমার মেয়ের বিবাহ না দিলেই নয়। কিন্তু মহাজন কিছু "বুঝাপনা" করিল না। তাঁর ধর্ম্মবিচার নাই!

গুরু। তাইত, তোমার উপর এ রকম "অনুরাগে"র কারণ কি? আচ্ছা, তুমি বাড়ী যাও, রঘুয়াকে পাঠশালায় পাঠাইয়া দিও। আমি বরং মহাজনকে বলিয়া দেখিব।

মণিনায়ক বিরস বদনে দণ্ডবৎ করিয়া বিদায় হইল। গুরুমহাশয় দেখিলেন, মণিনায়কের সহিত কথা বলার অবসরে, তাঁহার ক্ষুদ্র রাজ্য-মধ্যে সম্পূর্ণ অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছে! তখন তিনি "তুণ হুঅ, তুণ হুঅ" * বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন ও দুই একটী বিদ্রোহীকে

* "তুণ হুঅ" = তুষ্ণীম্ভব! = চুপ কর!

কিঞ্চিৎ প্রহার করিলেন। তাহার পর সন্ধ্যা উপস্থিত দেখিয়া পাঠশালা ভঙ্গ হইল। ছাত্রগণ বর্ষাপ্রাপ্ত ভেকবৃন্দের ন্যায় আনন্দরব করিতে করিতে ছুটিয়া পলাইল। ছুটী পাওয়া অর্থ ছুটিয়া 'পলায়ন নহে' কি?
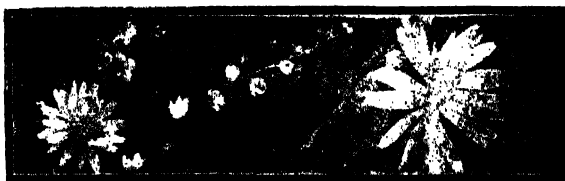
পঞ্চম অধ্যায়।

উড়িষ্যার ভাগবত ঘর।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, নীলকণ্ঠপুরের "গ্রামদাণ্ডের" (গলির) মধ্যস্থলে ছোট একখানা ঘর আছে। উহা সর্ব্বসাধারণের "ভাগবত ঘর"। যে দিন সায়ংকালে মণিনায়ক মহাজনের বাড়ী হইতে বিফলমনোরথ হইয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল, সে দিন রাত্রি এক প্রহরের সময়ে এই ঘরে ভাগবত পাঠ হইতেছিল। কেবল সে দিন বলিয়া নয়, প্রত্যহ রাত্রে এখানে ভাগবত পড়া হইয়া থাকে ও তৎপরে কোন কোন দিন সঙ্কীর্ত্তন হয়।

এই ভাগবত পাঠের খরচ গ্রামবাসিগণ চাঁদা করিয়া দিয়া থাকে। খরচ আর বেশী কিছু নয়; প্রত্যহ প্রদীপ জ্বালানের জন্য কিঞ্চিৎ "পুনাঙ্গ"* তৈল ও কিছু "বালভোগ" (নৈবেদ্য)। গ্রামের প্রত্যেক গৃহস্থ পালাক্রমে এই তেল ও নৈবেদ্য দিয়া থাকে। এই সামান্য ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে কাহারও কোন কষ্ট হয় না, অথচ সকলের সমবেত চেষ্টায় এই একটী সুন্দর অনুষ্ঠান অনায়াসে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয়, উড়িষ্যার ভাগবত ঘরের ন্যায় আমাদের বঙ্গদেশে কিছুই নাই।

---

* "পুনাঙ্গ" (পুন্নাগ) গাছের ফল হইতে যে তৈল প্রস্তুত হয়, উড়িষ্যার সমস্ত দেবমন্দিরে সেই তৈল ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ লোকে কেরোসিন তৈল জ্বালায়।

এই দৈনিক অনুষ্ঠান ছাড়া, প্রতিবৎসর বৈশাখ মাসে এখানে একটী "ভাগবত-মিলন" হইয়া থাকে। তখন নিকটবর্ত্তী ৮।১০ গ্রাম হইতে ভাগবত ঠাকুরদিগের শুভ সম্মিলন হয়। প্রত্যেক গ্রামের ভাগবত গোঁসাই একখানি "বিমানে" (চতুর্দ্দোল) আরোহণ করিয়া আগমন করেন, সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের লোকেরা সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে আসে। প্রভাতে সকল ঠাকুর মিলিত হন, সমস্ত দিন হরিসঙ্কীর্ত্তন ও নানা প্রকারের আমোদ-প্রমোদে কাটে। তখন গ্রামের এই গলিটার মধ্যে, ভাগবত ঘরের চারি দিকে, চিড়া-মুড়কি, পান-সুপারি ও মণিহারীর দোকান বসে। অপরাহ্ণে ভোগ দেওয়া হইলে, কিঞ্চিৎ দক্ষিণা গ্রহণানন্তর ঠাকুরেরা স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করেন। এই গ্রামে যেমন ভাগবত-মিলন হয়, অন্য অন্য গ্রামেও সেইরূপ হইয়া থাকে। তখন এ গ্রামের ঠাকুর নিমন্ত্রিত হইয়া সে সে গ্রামে গমন করেন। এই গ্রামের ভাগবত-মিলনের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে পঙ্কজসাহু মহাজন ৩ মান (৩ একর) জমি নিষ্কর দিয়াছেন। পরলোকে ভাগবতঠাকুর তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিবেন, বোধ হয়, এই গণনায় তিনি ঠাকুরকে উৎকোচস্বরূপ এই ভূমি দান করিয়াছেন।

সেই ক্ষুদ্র ঘরখানির তিন দিক্ মাটির দেওয়ালে আঁটাপেটা; এক দিকে ক্ষুদ্র একটী দরজা। এ ছোট ঘরখানিকে বড় একটী সিন্ধুক বলিলেও চলে! সে ঘরের পশ্চিমভাগে, একখানি ছোট জলচৌকির উপরে, এক বস্তা তালপত্রের পুঁথি, শুষ্ক পুষ্পমালা ও তুলসী-চন্দনে মণ্ডিত হইয়া, সগৌরবে বিরাজ করিতেছেন। ইনিই "ভাগবত গোঁসাই"। সম্মুখে একটী মৃণ্ময় প্রদীপ জ্বলিতেছে। সেই প্রদীপের সম্মুখে একখান ছোট আসনে বসিয়া গ্রামের পুরোহিত শুকদেব দাস একখানি তালপত্রের পুঁথি পড়িতেছেন। তাঁহার আশে পাশে চারি দিকে প্রায় ১৫।২০ জন লোক সেই ঘর পূর্ণ করিয়া বসিয়াছে। যাহারা

শেষে আসিয়াছে, তাহারা ঘরে স্থানের অভাব বশতঃ বাহিরে বসিয়াছে। সকলে শুকদেব দাসকে ব্যাসপুত্র শুকদেব ভাবিয়া একাগ্রচিত্তে তাঁহার মুখে ভাগবত-কথা শ্রবণ করিতেছে।

বলা বাহুল্য, এই ভাগবত-গ্রন্থ মূল সংস্কৃত নহে। ইহা উড়িষ্যার বিখ্যাত কবি জগন্নাথ দাসকৃত মূল ভাগবতের উৎকল ভাষায় পদ্যানুবাদ। এখন দশম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায় পড়া হইতেছিল। শুকদেব পড়িতেছেন—

গর্ভকু[১] চাহিঁ[২] গঙ্গাধর
স্তুতি করন্তি[৩] বেদ[৪] বর
বাসব আদি দিগপতি
যে যাহা মতে কলে স্তুতি[৫]।
জয় গোবিন্দ দামোদর
সত্য বচন স্বামী তোর
আবরি[৬] অচ্ছুঁ[৭] তিন সত্য
দেহ অবনী পরমার্থ॥
সত্যে ব্রহ্মাঙ্কু[৮] কর জাত
সত্য স্বরূপ তু[৯] অনন্ত
সত্যে তোহর[১০] আত্ম জাত
আম্ভে[১১] জানিলুঁ[১২] তোর সত্য। (ক)

১। গর্ভকে। (গর্ভস্থ শ্রীকৃষ্ণকে।) ২। উদ্দেশ করিয়া। ৩। করেন। ৪। ব্রহ্মা। ৫। যে যাহার মতে স্তুতি করিলেন। ৬। আবরণ করিয়া। ৭ আছ। ৮। ব্রহ্মাকে। ৯। তুই, তুমি। ১০। তোর। ১১। আমরা। ১২। জানিলাম, (কলিকাতাবাসীর জান্‌লুম্।)

(ক) মূল শ্লোক এই—

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং
সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।

তোর সঞ্চিলা[১৩] সেয়ল[১৪]
অসুর মারি সাধু পাল
সংসার মধ্যে দেহ বৃক্ষে
এথি মিলিলুঁ[১৫] তু[১৬] প্রত্যক্ষে
বৃক্ষের যেতে গুণ[১৭] মান
শরীরে তোহর[১৮] ভিয়ান[১৯]।
একই বৃক্ষে বেণী[২০] ফল
চতুর রস তিন মূল
পঞ্চ শিকড় তলে গণ্ঠী[২১]
আত্মা এহার ষড় গোটী
সপ্ত বকল দেহে জড়ি
অষ্টম ডালে অচ্ছন্তি[২২] বেড়ি
গণ্ঠি স্বভাবে নব নেত্র
বিস্তার নিতে দশ পত্র
উপরে অচ্ছি[২৩] বেণী পক্ষী
এমন্ত[২৪] বৃক্ষে দেহ লক্ষি
মুনি বলন্তি[২৫] রায়ে[২৬] শুন
দেহে কহিবা[২৭] বৃক্ষ গুণ
বৃক্ষর প্রায়[২৮] দেহ এক
ফল যোড়িয়ে[২৯] সুখ দুখ

সত্যাসা সত্য মৃত সত্যানেত্রং
সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ ॥

১৩। সঞ্চিত হইল, স্থিতি হইল। ১৪। পৃথিবী। ১৫। ইহাতে মিলিল। ১৬ তুমি। ১৭। গুণ সমূহ। ১৮। তোর। ১৯। স্থিতি। ২০। যুগ্ম, যোড়া। ২১। গাট, গোটি, একটী। ২২। আছে। ২৩। আছে (Singular)। ২৪। এমন। ২৫। বলেন। ২৬। রাজা। ২৭। কহিতেছি। ২৮। মত। ২৯। যোড়া, দুইটী।

তামস রজ সত্ত্ব গুণ
এহার মূল ৭টী প্রমাণ ॥
ধর্ম্ম সম্পদ কাম মোক্ষ
এ চারি রসটী প্রত্যক্ষ
শবদ রস রূপ গন্ধ
স্পর্শন পঞ্চ মূল ছন্দ[৩০]
জন্ম[৩১] হোই দেহ[৩২] বহি
বালক রূপেণ[৩৩] বঢ়ই[৩৪]
তরুণ যুবা বৃদ্ধ মৃত্যু
এহার[৩৫] আত্মা ষড় ঋতু
চর্ম্ম শোণিত মাংস মেদ
অস্থি মজ্জারে ধাতু ছন্দ
সপত বকল এহার
মুনি কহন্তি জ্ঞান সার।
ভূজল অনল সমীর
খ মনো বুদ্ধি অহঙ্কার
এ অষ্ট নাড়ী বহি ঘর
নবম চক্ষু নব দ্বার
দশ ইন্দ্রিয় পত্র লেখি[৩৬]
জীব পরম বেণী[৩৭] পক্ষী।
এমন্ত বৃক্ষ রূপ হোই

৩০। গণনা। ৩১। জন্মলাভ করিয়া। ৩২। দেহ ধারণ করিয়া। ৩৩। রূপে। ৩৪। বৃদ্ধি পায়, বাড়ে। ৩৫। ইহার। ৩৬। গণনা করি। ৩৭। যুগ্ম।

ভারা[৩৮] সংহরি রথ[৩৯] মহী (খ)

জগত তোর দেহুঁ[৪০] জাত

স্থিতি পালন[৪১] করুঁ অন্ত

তোহ[৪২] মায়ারে মূর্খ জন

আত্মা[৪৩] কু দেখন্তি[৪৪] সে ভিন্ন

পণ্ডিতে জানন্তি[৪৫] সে এক

মায়ারে[৪৬] দিশই[৪৭] অনেক

তু[৪৮] এ সংসারে দুখ সুখে

শরীর বহু নানা রূপে

সাধুকু[৪৯] দিশই নির্ম্মল

খল-লোচনে[৫০] যম কাল ॥ (গ)

শুকদেব সুর করিয়া এইরূপ পড়িতেছেন, আর এক একটী পদের

৩৮। ভার সংহার করিয়া। ৩৯। রক্ষা কর, পালন কর।

(খ) উপরের পদগুলি নিম্নলিখিত শ্লোকের অনুবাদ—

একানোঽসৌ দ্বিফল স্ত্রিমূলঃ

চতুরসঃ পঞ্চবধঃ ষড়াত্মা।

সপ্তত্বগষ্টাবিটপো নবাক্ষঃ

দশচ্ছদী দ্বিখগশ্চাদি বৃক্ষঃ ॥

৪০। দেহ হইতে। ৪১। করিস্, কর। ৪২। তোর, তোমার। ৪৩। মায়াতে ৪৪। আপনাকে। ৪৫। দেখে। ৪৬। জানেন। ৪৭। মায়ারে। ৪৮। দেখায়, প্রতীত হয়। ৪৯। তুই, তুমি। ৫০। সাধুকে। ৫১। খল লোকের চক্ষে।

(গ) মূল সংস্কৃত শ্লোক এই—

ত্বমেক এবাস্য স্বতঃ প্রসূতিঃ

ত্বং সন্নিধানং ত্বমনুগ্রহশ্চ।

ত্বন্মায়য়া সংবৃত-চেতস স্বাং

পশ্যন্তি নানা ন বিপশ্চিতোঽন্তে॥

শেষের চরণটীর অক্ষরগুলি পৃথক্ পৃথক্ উচ্চারণ করিয়া কিছু দীর্ঘ সুরে গান করার মত পড়িতেছেন। তাঁহার মুখ হইতে সেই ধুয়া ধরিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী সেই চরণটীকে গানের সুরে বারংবার উচ্চারণ করিতেছে ও সঙ্গে সঙ্গে খঞ্জরী বাজাইতেছে। যেমন পাঠকঠাকুর একটী শেষ চরণ সুর করিয়া পড়িলেন খ-ল-লো-চ-নে য-ম-কা-ল-। অমনি শ্রোতারা খঞ্জরী বাজাইয়া "খল লোচনে যমকাল—খল লোচনে যমকাল" এইরূপে বারংবার গান করিতে লাগিল। সকলে এই রকমে ভাগবত কথা শুনিতে লাগিল এবং এই ভাগবত শ্রবণকেই তাহারা বিশেষ পুণ্যের কার্য্য মনে করিল। কিন্তু বলা বাহুল্য এই সকল গুরুতর দার্শনিক তত্ত্ব কেহই বুঝিতে পারিল না। এমন কি, সেই পাঠকমহাশয়েরও বিদ্যা ততদুর ছিল না। তবে যে দিন কৃষ্ণলীলার কথা পড়ে, কিম্বা কোন সারগর্ভ আখ্যায়িকা পড়ে, সে দিন যে সকলে কিছু কিছু না বুঝিতে পারে, এমত নহে।

এইরূপে পড়িতে পড়িতে অধ্যায় শেষ হইল। তখন পাঠকব্রাহ্মণ গ্রন্থ বন্ধ করিয়া, তাহা সূতা দিয়া বাঁধিয়া, সেই জলচৌকির উপরে রাখিলেন ও নিজে ভূমিষ্ঠ হইয়া ভাগবতঠাকুরের উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। শ্রোতৃগণও সকলে "জয় দীনবন্ধু জগন্নাথ" বলিয়া প্রণাম করিল। তৎপর একজন লোক একটা—"টুক্‌রী" (চুবড়ী)তে করিয়া কিছু "খই-উখড়া" (মুড়কি) ও কন্দ * আনিল। পাঠকঠাকুর তাহা একটী তুলসীপত্র ও কিঞ্চিৎ জল হাতে লইয়া ভাগবতঠাকুরকে নিবেদন করিয়া দিলেন। পরে তিনি নিজে কিঞ্চিৎ প্রসাদ গ্রহণ করিলেন ও উপস্থিত লোকসকলকে কিছু কিছু বাঁটিয়া দিলেন, সকলে ভক্তিপূর্ব্বক তাহা মস্তকে স্পর্শ করিয়া ভক্ষণ করিল।

তখন একজন লোক একটী মৃদঙ্গ ও এক জোড়া করতাল আনিল। আমাদের বঙ্গদেশের খোল-করতাল অপেক্ষা উড়িষ্যার খোল-করতালের

* মিশ্রির পাকে প্রস্তুত করা ইক্ষুগুড়কে কন্দ বলে।

আকার খুব বড়। আমাদের পাঁচটি খোলের যে রকম শব্দ হয়, তাহাদের একটী খোলের সেইরূপ গভীর শব্দ হয়। তাহাদের একখানা করতাল যেন এক একখানা থালা। সেই মৃদঙ্গ ও করতাল যখন বাজান আরম্ভ হইল, তখন সেই শব্দে গ্রাম কম্পিত হইল। তখন সকল লোক সেই ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিবার জন্য গলির মধ্যে দাঁড়াইল। তাহারা খোলবাদকের চারি দিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া, তালে তালে পদক্ষেপণ করিতে লাগিল। তাহার মধ্যে এক জন (ইনি সঙ্গীতের নেতা) প্রথমতঃ খোল-করতালের সঙ্গে একতানে নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোকটী গান করিলেন।

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

তিনি এক একটী চরণ সুর করিয়া পাঠ করিলেন, আর সকলে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া সেইটী পাঠ করিল। এইরূপে গুরুর প্রণাম শেষ করিয়া, তিনি যথারীতি "প্রাণ-নাথ শ্রীগৌরাঙ্গ হে! কৃপাময়!" বলিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। ঠিক এই সময়ে গ্রামের মধ্যে একটী তুমুল গোলযোগ উঠিল। সেই গোলমাল লক্ষ্য করিয়া সকলে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল।

সকলে প্রথমে মনে করিল আগুণ লাগিয়াছে, অথবা চোর ধরা পড়িয়াছে; কিন্তু নিকটে গিয়া দেখিল, একটা ঝগড়া বাধিয়াছে। এক দিকে মণিনায়ক, অন্য দিকে বিম্বাধর সাহু মহাজন। তাহাদের মধ্যে এইরূপ বিতণ্ডা হইতেছিল—"কাহিঁকি তুমে মোর খঞ্জা ভিতরকু পশিথিল?" "তোর ঝিয়কু পচার," "কন্ কহিলু ছড়া তেলি," "কন্ কহিলু ছড়া তসা?" "তোতে মারি পকাইবি!" "তোতে মারি পকাইবি।" মণিনায়কের স্ত্রী চীৎকার করিয়া বিম্বাধর সাহুকে গালি দিতেছিল। পাড়ার সকল লোক সেখানে গিয়া ঝুঁকিয়া পড়িলে, বিম্বাধর মণিনায়ক কেশাসাইতে শাসাইতে প্রস্থান করিল।

পাড়ার লোকে বুঝিল, বিম্বাধর সাহু কোন দুরভিসন্ধিতে এই রাত্রিকালে মণিনায়কের খণ্ডার মধ্যে "পশিয়াছিল"। মণিনায়কের গৃহে অনূঢ়া যুবতী কন্যা, বিম্বাধর একজন প্রসিদ্ধ দুশ্চরিত্র যুবক। বিশেষতঃ বিম্বাধর জাতিতে তেলি; একজন নীচজাতীয় তেলি, একজন উচ্চজাতীয় "খণ্ডাইত" বা চাষার বাড়ীতে মন্দাভিপ্রায়ে প্রবেশ করিলে, সেই চাষার জাতি যাওয়ার সম্ভাবনা। তখন মণিনায়কের "পিণ্ডায়" (বারেন্দায়) বসিয়া তাহার সজাতীয় "ভাললোক"গণ এই সকল বিষয় লইয়া আলোচনা-আন্দোলন করিতে লাগিল। মণিনায়কের গৃহিণী এতক্ষণ বিম্বাধরের চতুর্দ্দশ পুরুষের সপিণ্ডীকরণে নিযুক্ত ছিল। এখন তাহার সজাতীয় "ভাললোক"গণ তাহার কন্যার উপর সন্দেহ করিয়া নানা কথার আলোচনা করাতে, সে ভয়ানক গরম হইয়া, বিম্বাধরকে ছাড়িয়া, সেই সকল ভাললোকদিগকে মন্দলোক বলিয়া প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিল এবং তাহাদের কাহার গৃহে কি কুৎসা আছে, তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিতে লাগিল। ইহাতে সেই সকল ভাললোকগণ মণিনায়ক ও তাহার স্ত্রীর উপর খাপা হইল এবং পরদিন এই বিষয়ে একটী পঞ্চাইতের বৈঠক হইবে বলিয়া, মণিনায়ক ও তাহার স্ত্রীকে গালি দিতে দিতে, নিজ নিজ গৃহে প্রস্থান করিল। সে রাত্রের হরিসঙ্কীর্ত্তন সেই "প্রাণনাথ শ্রীগৌরাঙ্গ" পর্য্যন্তই ক্ষান্ত রহিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পঞ্চাইতের বৈঠক।

মানুষের দুঃসময় উপস্থিত হইলে, সে যে কাজে হাত দেয়, তাহাতেই অনিষ্টোৎপত্তি হয়। মণিনায়ক এক বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে গিয়া, আর এক বিপদে পড়িল।

পর দিন প্রভাতে গ্রামের প্রান্তে, সেই বটবৃক্ষের তলে, গ্রাম্যদেবতা বটমঙ্গলার সম্মুখে, পথের উপরে গ্রামের ১৫।২০ জন বয়োবৃদ্ধ "খণ্ডাইত" ভদ্রলোক একত্র হইল। উড়িষ্যার সর্ব্বপ্রকার সামাজিক গোলযোগ এবং অধিকাংশ স্বার্থ-ঘটিত বিবাদ-বিসম্বাদ গ্রামের পঞ্চাইতগণ দ্বারা মীমাংসিত হইয়া থাকে। নিতান্ত দায়ে না ঠেকিলে, লোকে মামলা মোকর্দ্দমা করিতে ফৌজদারী বা দেওয়ানী আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করে না। প্রত্যেক গ্রামেই কয়েক জন বয়োবৃদ্ধ অভিজ্ঞ লোক পঞ্চাইত থাকে, তাহাদিগকে "ভললোক" (ভদ্রলোক) বলে। তাহারা সকল বিষয় মীমাংসা করে।

মণিনায়ক যে ফন্দাতে পড়িয়াছে, ইহা একটী সামাজিক গোলযোগ-নিবন্ধন, কেবল তাহার সজাতীয় ভদ্রলোকগণই ইহার মীমাংসা করিবে। অন্য জাতীয় "ভাললোক"গণের ইহাতে মাথা পাতিবার অধিকার নাই। যে যে সামাজিক গোলযোগ এই সকল পঞ্চাইতগণের বিচারাধীনে

(Jurisdiction) সচরাচর আসে, তাহা পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য ফুট-নোটে দিলাম। (ক)

উল্লিখিত ভদ্রলোকগণ গামোছা কাঁধে করিয়া, কেহ বা গামোছা পরিয়া, দন্তকাষ্ঠ হাতে করিয়া, কেহ কেহ চুরুট খাইতে খাইতে, সেই ধূলিপূর্ণ গ্রাম্য পথের উপরে আসিয়া বসিলেন ও মণিনায়ককে ডাকিয়া পাঠাইলেন। এই সকল পঞ্চাইতের বৈঠক প্রায়ই তিনটী পথের সন্ধিস্থলে বসিয়া থাকে; আর সেখানে যদি কোন গ্রাম্য দেবতার "আস্তান" থাকে, তবে ত কথাই নাই। মণিনায়ক একখান গামোছা পরিয়া, আর একখান গামোছা গলায় দিয়া, গললগ্নীকৃতবাসে আসিয়া, যোড়হস্তে সকলকে "অবধান" করিল। পূর্ব্ব রাত্রে রাগের ভরে তাহার স্ত্রী সেই পঞ্চাইত-দিগকে যাহাই বলিয়া থাকুক, মণিনায়ক স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছে

(ক) উড়িষ্যাবাসীরা নিম্নলিখিত কারণে জাতিচ্যুত হইতে পারে :—

(১) "মাছীয়া পাতক"—শরীরে ঘা হইয়া মাছি পড়িলে।

(২) "গোবাধা"—খোঁটার সহিত গরু বাঁধা থাকিয়া হঠাৎ মরিলে।

(৩) "অস্পৃশ্য জাতির সহিত অগম্যাগমন"।

(৪) ব্রাহ্মণ-স্ত্রীকে অন্য জাতীয় লোকে হরণ করিলে সেই লোকের।

(৫) পশু "হরণ"।

(৬) স্বগৃহে অগম্যাগমন।

(৭) অস্পৃশ্য জাতির গৃহে ভোজন।

(৮) অস্পৃশ্য জাতি উচ্চ জাতিকে মারিলে, উচ্চ জাতির দোষ হয়।

(৯) উচ্চ জাতি কলহ ও রাগারাগি করিয়া অস্পৃশ্য জাতিকে স্পর্শ করিলে, উচ্চ জাতির দোষ হয়।

(১০) জেল খাটিলে।

ইহার অধিকাংশ অপরাধেরই প্রায়শ্চিত্ত ঠাকুরঘরে পয়সা দান। অপরাধ গুরুতর বলিয়া বিবেচিত হইলে, সজাতীয় লোকদিগকে খাওয়াইতে হয়—তাহাকে "ক্ষীরিপিঠা" বলে। গরু সম্বন্ধীয় অপরাধে ব্রাহ্মণকে গরুদানও কখন কখন করিতে হয়।

যে ইহাদের শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন উপায় নাই। সেই "পঞ্চ পরমেশ্বর" যাহা বিচার করিবেন, তাহাকে শির পাতিয়া তাহাই স্বীকার করিতে হইবে।

সে সেখানে আসিবামাত্র সকলে সমস্বরে কলরব করিয়া উঠিল। যেন সেই বটবৃক্ষস্থ বায়সকুল, মানবদেহ ধারণ করিয়া, বৃক্ষ হইতে নামিয়া ভদ্রলোক সাজিয়া বসিয়াছে! কতক্ষণ পর্য্যন্ত কাহারও কোন কথা বুঝা গেল না। তবে সকলের রাগ পূর্ণমাত্রায় চড়িয়াছে, ইহা বুঝা গেল। পরে তাহাদের মধ্যে মার্কণ্ড পধান নামক এক বৃদ্ধ "তুণ হুঅ" "তুণ হুঅ" (১) বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলে, সকলে চুপ করিল।

মার্কণ্ড পধান, তাহার হাতের অর্দ্ধ-দগ্ধ চুরটটী কোমরে গুঁজিয়া রাখিয়া, মণিনায়ককে বলিল—

"আরে মণিয়া! কাল কি হইয়াছিল, সত্য করিয়া বল্!"

মণিনায়ক সেই ধূলি-পূর্ণ পথের এক ধারে বসিয়া সকলের দিকে চাহিয়া বলিল—

"এ ধর্ম্মসভা, এখানে ঠাকুরাণী "বিজে" (২) করিতেছেন, আপনারা পঞ্চ পরমেশ্বর উপস্থিত, আমি কখনও মিথ্যা বলিব না! কাল—হ'লো কি—আমি সন্ধ্যার সময় মহাজনের বাড়ী হইতে আসিলাম। ঘরে ভাত রান্না হইলে, তাহার "এক গণ্ডা" (চারিটা) খাইলাম। খাইয়া মুখ ধুইতে "বারীর দরজাতে" (৩) গিয়াছি, এমন সময় সেখানে অন্ধকারের মধ্যে একটা লোক দেখিলাম। আমি বলিলাম "কে ও?" সে কোন কথা বলে না। তখন তাহার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে ঘরের দিকে আলোর কাছে আনিলাম। তখন দেখি যে সে বিম্বাধর সাহু মহাজন। আমি বলিলাম "কেন, এত রাত্রে তুমি এখানে কেন?" সে বলিল—

(১) তুণ হুঅ—তুষ্ণীম্ভব—চুপ কর।
(২) বিজে করিতেছেন—বিরাজমান আছেন।
(৩) বারীর দরজা—পশ্চাতের দরজা।

"তা'তে তোমার কি ?" তখন আমার ভার্য্যা বলিল "তুমি আমার ঝিয়ের বিবাহে টাকা দিলে না, তুমি আমাদের জাতি মারিতে আসিয়াছ ?" ইহা বলিয়া সে সকলকে ডাকিয়া সোর দোহাই দিতে লাগিল। আমি তাহাকে ধরিয়া "দাণ্ড দরজাতে" (সদর দরজায়) লইয়া গেলাম। তাহার পর যাহা হইয়াছে, তাহা ত আপনারা নিজের কানেই শুনিয়াছেন।

ইহা শুনিয়া সকলে নানা কথা বলিয়া উঠিল। মার্কণ্ড পধান আবার জিজ্ঞাসা করিল—

"আরে মণিনায়ক! ইহাতে যে আসল কথা কিছুই বুঝা গেল না। তুই ধর্ম্মতঃ বল্, বিম্বাধর সাহু তোর ঝিয়ের কাছে গিয়াছিল কি না ? আর অন্য কোন দিন সে এই রকমে তোর বাড়ীতে গিয়াছিল কি না ?"

মণি। আমি ধর্ম্মতঃ বলিতেছি—আমি যদি মিথ্যা বলি, তবে যেন আমার বংশনাশ হয়—আমার যেন আঁখি ফুটিয়া যায়, আমি ইহার কিছুই জানি না।

মার্কণ্ড। আচ্ছা, তুই না জানিতে পারিস্, তোর ঝি কি ভার্য্যা তা'রা কিছু জানে কি না ? তুই ত তাদের কাছে শুনিয়া থাক্‌বি ?

মণি। বিম্বাধর সাহু সে ভাবে আসিলে, অবশ্যই তাহারা সে কথা জানিত। সে কখনও আমার ঝিয়ের কাছে যায় নাই।

সেই পঞ্চাইতদিগের মধ্য হইতে ধ্রুব পধান বলিল—"সে আচ্ছা সেয়ানা মানুষ, সে কিছুতেই একরার্ করিবে না! তাহাকে ঠাকুরাণীর 'ধণ্ডা' দেও, সে তাহা ছুঁইয়া 'নিয়ম' করিয়া বলুক।"

তখন একজন লোক সেই গ্রাম্যদেবতার নিকট হইতে কিছু শুষ্ক ফুল আনিয়া মণিনায়কের হাতে দিতে গেল। মণিনায়ক বলিল—"উহা কেন ধরিব ? কেন, আমি কি মিথ্যা কহিলাম ?"

মার্কণ্ড। তোর ইহা হাতে করিয়া কহিতে হইবে। নচেৎ তোর কথা আমরা বিশ্বাস করি না।

মণিনায়ক কতক্ষণ নীরবে বসিয়া বসিয়া কি ভাবিতে লাগিল। তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। পরে সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুই হাতে সেই শুষ্ক ফুল (নির্ম্মাল্য) ধরিয়া বলিল—"হাঁ, আমার ভার্য্যা বলিয়াছিল যে, বিম্বাধর সাহু আরও দুই তিন দিন আমার বাড়ীতে আসিয়াছিল। আপনারা ধর্ম্মাবতার! আমার যে দণ্ড হয় দেন। আমি নিতান্ত গরিব, আমার "পাঁচপ্রাণী কুটুম্ব"—ইহা বলিয়া সে গামোছা দিয়া চক্ষু মুছিল।

তাহার কথা শুনিয়া সকলে আবার কলরব করিয়া উঠিল। এবার আনন্দ-কোলাহল। ধ্রুব পধান বলিল—"ছড়া বড় সেয়ানা, চালাকি করিতেছিল!" কুসুন সুঁই বলিল—"আরে, ওর ঐ মাগিটাই যত অনিষ্টের মূল! সে নিজে যেমন খারাপ—মেয়েটাকেও খারাপ করিল!" সত্যবাদী সামল বলিল "সে পরের দোষ বাহির করিতে খুব পটু—নিজের ছিদ্র দেখে না!" ভাগবত বিশ্বাস বলিল "এবার ধরা প'ড়েছেন, বুঝিবেন মজাটা কেমন!"

তখন মার্কণ্ড পধান বলিল—

"মণিনায়ক, তোর জাতি যাইবে, আমরা আর তোর সঙ্গে খাওয়া পেওয়া. চলাফেরা করিব না!"

মণি। আমার যে দণ্ড হয় দেন, আপনারা আমার স্বজাতি, আপনারা আমাকে পরিত্যাগ করিলে, আমার কি গতি হইবে!

মার্কণ্ড। তোর অপরাধ অতি গুরুতর! আচ্ছা, তুই আমাদিগের সকলকে 'ক্ষীরিপিঠা' খাওয়াইলে, আমরা তোকে জাতিতে গ্রহণ করিব।

মণি। আজ্ঞে, আমি গরিব লোক—নিতান্ত 'অর্ক্ষিত' * 'রঙ্ক' আমি সে টাকাকড়ী কোথায় পাইব?

ইহা বলিয়া মণিনায়ক সকলের সম্মুখে, অধোমুখে সটান হইয়া, হাত পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িল।

* অর্ক্ষিত—অরক্ষিত—নিঃসহায়।

সকলে বলিল—"তাহা না হইলে হইবে না।"

মণি। আচ্ছা, আমারে সাত দিনের সময় দিন্। আমি কোথায় টাকা পাই দেখি। পঙ্কজ সাহুর কাছে ত আর মিলিবে না?

ইহা শুনিয়া সকলে উঠিয়া চলিল। মণিনায়কও ঘরে গেল।

মণিনায়কের স্ত্রী সম্মার্জ্জনী হস্তে উঠান পরিষ্কার করিতেছিল। মণিনায়ককে দেখিয়া বলিল—'কি? কি হইল?'

মণি। আর কি হইবে? আমার কপালে যাহা ছিল, তাহাই হইল! আমি সে কালে ব'লেছিলাম, বিম্বাধর সাহুকে আর বাড়ীতে আসিতে দিস্ না। এখন কেমন? এখন মেয়ের বিবাহ দিবে, না সকলকে 'ক্ষীরি-পিঠা' খাওয়াইবে?

মণির স্ত্রী। রেখে দাও তোমার 'ক্ষীরিপিঠা'! আমি সব বেটার ঘরের খবর জানি। আসুক দেখি তা'রা আমার কাছে! কেমন 'ক্ষীরি-পিঠা' খাওয়া আমি দেখাইয়া দিব!

ইহা বলিয়া ঝুম্পা সেই ভাললোকগণের আগমন কল্পনা করিয়া সেই শতমুখী হস্তে ঘুরিয়া দাঁড়াইল, ও তাহাদের উদ্দেশে মাটীতে তিন চারি বার আঘাত করিল।

মণি। এখন রাগ করিলে কি হইবে? এখন উপায় কি? এখন সেই দশ জনের কথামত না চলিয়া উপায় কি? আমরা একঘ'রে হইয়া থাকিলে ত আর চলিবে না? মেয়ের বিবাহ ত দেওয়া চাই?

মণির স্ত্রী। যদি আমার পরামর্শ শোন, তবে আমি সব বেটাকে জব্দ করিতে পারি, আর সেই তেলিটাকেও জব্দ করিব!

মণি। সে কি পরামর্শ?

মণির স্ত্রী। এখন সে কথা বলিব না। পরে শুনিও।
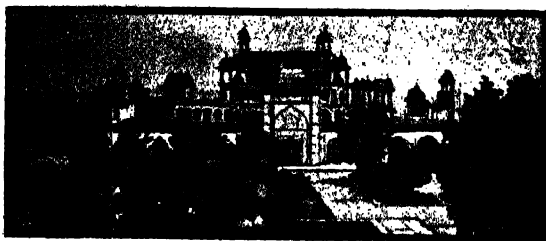
উড়িষ্যার চিত্র।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

বীরভদ্র মর্দ্দরাজ।

নীলকণ্ঠপুরের অনতিদূরে গড় কোদণ্ডপুর গ্রামে বীরভদ্র মর্দ্দরাজের বাস। ইনি একজন জমিদার ও দশ জন "খণ্ডাইতে"র উপরিস্থ সর্দ্দার-"খণ্ডাইত"। আমরা জমিদার বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝি, উড়িষ্যার জমিদার ঠিক তদ্রূপ নহে। যাহারা ভূমির রাজস্ব, কোন উপরিস্থ মালিককে না দিয়া, বরাবর গবর্ণমেণ্টকে দিবার অধিকারী, তাহাদিগকে জমিদার বলে, তবে সেই ভূমি দশ খানা গ্রাম লইয়া হউক, কিম্বা দশ বিঘা, কি দশ কাঠা জমিই হউক; আর সেই রাজস্ব দশ হাজার টাকাই হউক, কিম্বা দশ টাকা, কি দশ আনাই হউক। একজন জমিদারনামধারী

ধারী ব্যক্তি স্বহস্তে লাঙ্গল ধারণ করিয়া জমি চাষ করিতেছে, এ দৃশ্য কেবল উড়িষ্যাতেই দেখা যায়।

যাহা হউক, আমাদের বীরভদ্র মর্দ্দরাজ যে-সে রকমের জমিদার নহেন। তাহা তাঁহার নামেই প্রকাশ পাইতেছে। "মর্দ্দরাজ" খেতাবটীর মূল্য এক সহস্র মুদ্রা; পুরীর মহারাজাকে এই টাকা দিয়া তিনি উহা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার বার্ষিক আয় জমিদারী হইতে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা। জমিদারীর আয় ভিন্ন তাঁহার আরও অনেক রকম উপার্জ্জনের পথ আছে। তাহা ক্রমে বিবৃত করিতেছি। পাঠক-পাঠিকাগণের একটু ধৈর্য্যাবলম্বন না করিলে চলিবে কেন?

পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইনি একজন সর্দ্দার-"খণ্ডাইত"। উড়িষ্যার এই "খণ্ডাইত" উপাধিধারী কর্ম্মচারিগণের মহারাট্টা আমলে কি কি কার্য্য করিতে হইত, তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। তবে তাহাদের পদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরিয়া ও বর্ত্তমান খণ্ডাইতগণের কার্য্য দেখিয়া অনুমান হয়, ইহারা এক সময়ে খড়্গধারী শান্তিরক্ষক পদে নিযুক্ত ছিল। মহারাট্টা আমলে অনেক খণ্ডাইতের জাইগীর জমি ছিল; সেই জমি লইয়া তাহারা আপন আপন এলাকার মধ্যে অধীনস্থ 'পাইক'দিগের সাহায্যে শান্তিরক্ষা করিত। ইংরেজ আমলে যদিও দেশের শান্তি-রক্ষার ভার পুলিশের উপর পড়িল, তথাচ খণ্ডাইতদিগকে তাহাদিগের জাইগীর জমি হইতে হঠাৎ বেদখল করা বিবেচনাসঙ্গত বোধ হইল না। সেইজন্য তাহাদের জাইগীর বহাল রহিল।* কিন্তু তাহারা কেবল জমি খাইবে, অথচ কোন কাজ করিবে না, ইহাও ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত নহে। তাই হুকুম হইল, খণ্ডাইতগণ তাহাদের অধীনস্থ পাইকদিগকে লইয়া দেশের শান্তি-রক্ষা ও চোর-ডাকাইত-ধরা বিষয়ে পুলিশের সাহায্য

---

* উড়িষ্যার বর্ত্তমান বন্দোবস্তে এই সকল খণ্ডাইত জাইগীর জমির অল্প কর ধার্য্য হইয়াছে।

করিবে। আমাদের বীরভদ্র এই রকম দশজন খণ্ডাইতের উপরিস্থ সর্দ্দার-খণ্ডাইত। সুতরাং, তাঁহার পদ একজন পুলিশ দারোগা হইতে কোন ক্রমে কম নহে। তাঁহার জাইগীর পাঁচ শত মান (একর) জমি।

আপনি বুঝি মনে করিতেছেন, বীরভদ্রের এই খণ্ডাইতী চাকরীর আয় কেবল এই পাঁচ শত একর জমি পর্য্যন্তই শেষ হইল। বাস্তবিক তাহা নহে। তাঁহার খণ্ডাইতী কাজের প্রধান ও প্রকৃত উপার্জ্জন সেই চোর-ডাকাইত-ধরা বিষয়ে পুলিশকে সাহায্য-করা হইতে। বীরভদ্র এক অসাধারণ ক্ষমতাশালী লোক। তাঁহার বুদ্ধি যেমন প্রখর, তেমনি কূট। তাঁহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বও অসাধারণ, তাঁহার সাহস অপরিসীম। তাঁহার অধীনে ১০০ জন পাইক আছে, ইহা ছাড়া প্রায় তিন শত গ্রামের চৌকীদার তাঁহার হুকুমে চলে। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি "বাউরী" ও "মহুরিয়া" (অস্পৃশ্য জাতি) সর্ব্বদা তাঁহার অনুগত। ইহাদের সাহায্যে তিনি কিরূপে দেশের শান্তিরক্ষা ও নিজের সম্মানরক্ষা এবং উদরপূর্ত্তি করেন, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি।

বীরভদ্র জানেন, পুলিশই কলির অগ্নিদেবতা, অর্থাৎ, এই কলিকালে যেমন একমাত্র অগ্নিদেবতাকে ঘৃতাহুতি দ্বারা তুষ্ট রাখিতে পারিলে সকল দেবতাই তদ্দ্বারা তৃপ্ত হন, সেইরূপ একমাত্র পুলিশকে খুসি রাখিতে পারিলে, জজ মাজিষ্ট্রেটের কোন তোয়াক্কা না রাখিলেও চলে! তাই সর্ব্বপ্রথমে তিনি কখনও নগদ অর্থ দ্বারা, কখনও বা রজতমূল্য ঘৃত-তণ্ডুলাদির দ্বারা, সেই কলির অগ্নিদেবতাকে তুষ্ট রাখেন। একবার পুলিশ বাধ্য থাকিলে, তাঁহাকে আর পায় কে? তাঁহার এলাকার মধ্যে চুরি ডাকাইতী হইলে, সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার নিকট সংবাদ আসিবে। তিনি তখন থানার দারগাকে নামমাত্র সংবাদ পাঠাইয়া, নিজেই দলবল সহ তদন্তে, অর্থাৎ, ঘুস আদায়ে, প্রবৃত্ত হন। পরে সেই তদন্তের কার্য্যে যাহা রোজগার হয়, তাহার কিয়দংশ দারগাকে পাঠাইয়া দিয়া থাকেন। মনে

বসিয়া নিরুদ্বেগে ও নিরাপদে যাহা পাওয়া গেল, তাহাই উত্তম মনে করিয়া দারগা তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকেন। বরং সময় সময় দারগার কাছে নালিশ উপস্থিত হইলে, তিনি তাহার "তদন্তে"র ভার বীরভদ্রের উপর দিয়া থাকেন। এইরূপে তাঁহার অপরিসীম ক্ষমতা দেখিয়া, তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী জমিদার, মহাজন ও সর্ব্বসাধারণ লোকে তাঁহার ভয়ে সতত কম্পিত। তিনিও সুযোগ পাইয়া সেই সুযোগের যথোচিত সদ্ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত নহেন। তিনি সেই সকল জমিদার ও মহাজনের উপরে তাহাদের আয় অনুসারে, প্রতি টাকায় এক পয়সা হিসাবে, একটী কর স্থাপন করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন কোন বিশেষ বিশেষ কার্য্য উপলক্ষে তাহাদের নিকট হইতে যথেষ্ট চাঁদাও তিনি আদায় করিয়া থাকেন। যে চাঁদা দিতে অস্বীকার করে, সেই দুষ্ট লোককে তিনি নানা প্রকারে শাসন করিয়া থাকেন। তাহার মধ্যে খুব সোজা ও সরাসরী উপায় হইতেছে, নিজের দলবল লইয়া গিয়া সেই দুষ্টলোকের ঘর-বাড়ী লুণ্ঠন করা। বলা বাহুল্য, পুলিশ সেই লুটপাটের নালিশ গ্রহণ করে না। ইহা ছাড়া, আবশ্যক হইলে, সেই দুষ্ট জমিদার কি মহাজনের বিরুদ্ধে, অন্য আর এক ব্যক্তির দ্বারা কয়েদ রাখা কিম্বা জুলুম করিয়া টাকা আদায় করিবার অভিযোগে, পুলিশে মিথ্যা নালিশ দায়ের করা। তখন দারগা মফস্বলে আসিলে, তাহার সহিত একযোগে সেই দুষ্ট জমিদার কিম্বা মহাজনের নিকট হইতে অনেক টাকা আদায় করা যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন দুষ্ট লোককে জব্দ করিবার আরও একটী নূতন উপায় বীরভদ্র আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার দলের "বাউরী" ও "মছুরিয়া" (অস্পৃশ্য জাতি) গণ সেই দুষ্ট ব্যক্তিকে জোর করিয়া ধরিয়া, তাহার মুখের মধ্যে "মদ" (তাড়ী) কিম্বা "তোড়ানী পানী" (পান্তা-ভাতের জল) ঢালিয়া দেয়। তাহাতে সেই ব্যক্তি জাতিচ্যুত হয় ও পরে অনেক টাকা খরচ করিয়া আবার তাহাকে সমাজে উঠিতে হয়। বৃদ্ধ পঙ্কজ সাহু মহাজন, একবার

বীরভদ্রের নামে কর্জ্জা টাকার এক ডিক্রী করিয়া, একজন আদালতের পেয়াদা লইয়া তাঁহার মাল ক্রোক করিতে আসিয়াছিল। তাহার অদৃষ্টে "পইড় পানী" (ডাবের জল) জুটিয়াছিল ; অর্থাৎ, বীরভদ্রের আদেশে তাঁহার অনুচরগণ, সেই মহাজন ও পেয়াদাকে ধরিয়া, নারিকেলের মধ্যে "তোড়ানী পানী" পুরিয়া, তাহাদের মুখের মধ্যে সেই ডাবের জল ঢালিয়া দিয়াছিল। আর পেয়াদার সঙ্গে যে ঢুলী আসিয়াছিল, তাহার ঢোল কাড়িয়া নিয়া বৃদ্ধ মহাজনের গলায় বাঁধিয়া দিয়াছিল। পরে পঙ্কজ সাহুকে পাঁচ শত টাকা ব্যয় করিয়া আবার জাতিতে উঠিতে হইয়াছিল।

এইরূপ অত্যাচার করাতে পুরী জেলার প্রায় একতৃতীয়াংশ লোক বীরভদ্রকে যমের মত ভয় করিয়া চলে। কেহই তাঁহার বিরুদ্ধে চলিতে সাহস করে না। সামাজিক বিষয়েও তাঁহার আদেশ কেহ উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না। তিনি যাহাকে জাতিচ্যুত করিবেন, সে জাতিচ্যুত হইয়াই থাকিবে ; কেহ তাহাকে সমাজে উঠাইতে পারিবে না। আবার কোন ব্যক্তি স্বজাতি দ্বারা সমাজে আবদ্ধ হইলে, সে যদি বীরভদ্রের 'অনুসরণ' করে, তবে তাঁহার আদেশে সকলে সেই ব্যক্তিকে সমাজে গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়।

এইরূপে বীরভদ্রের প্রভুত্ব অসাধারণ, উপার্জ্জনও যথেষ্ট ; পাঠক হয় ত মনে করিবেন, এই ব্যক্তি বোধ হয় ইংরেজ-রাজত্বের প্রথমাবস্থায় বর্ত্তমান ছিল, নচেৎ আজকালকার দিনে এইরূপ জুলুম জবরদস্তী আইন-কানুনের বলে ও প্রকৃষ্ট শাসন-পদ্ধতিতে অসম্ভব হইয়াছে। কিন্তু আমি বলি, ইহা বর্ত্তমান সময়েরই ঘটনা, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। অবশ্য জেলার মাজিষ্ট্রেট বীরভদ্রকে বিশেষরূপে জানেন : এমন কি, অনেকবার বীরভদ্রের নামে মোকর্দ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু, তাঁহার অসাধারণ কূটবুদ্ধি ও উত্তম ভাগ্যের জন্য তিনি প্রত্যেকবারেই খালাস হইয়া আসিয়াছেন ; এমন কি, হাজত হইতেও ফিরিয়া আসিয়াছেন।

বীরভদ্র একজন "খণ্ডাইত"; কিন্তু, তাঁহার জাতি কি, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। সাধারণ "খণ্ডাইত" বা ("তসা") গণকে তিনি সজাতীয় বলিয়া গণ্য করেন না। উড়িষ্যায় প্রবাদ আছে, মণি নায়কের ন্যায় চাষাগণের পয়সাকড়ি হইলে, তাহারা "করণের" শ্রেণীতে উন্নীত হয়। বীরভদ্রেরও কোন পূর্ব্বপুরুষ হয়ত এই রকমে "করণ" জাতিতে 'প্রমোশন' পাইয়া থাকিবেন। সেই জন্য প্রায় করণ জাতির সঙ্গেই তাঁহার পরিবারের বিবাহাদি হইয়া থাকে। আবার কোন কোন "খণ্ডাইত" ক্ষত্রিয় বলিয়াও পরিচয় দেন। দুই একটী ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত বড় জমিদারের সঙ্গেও বীরভদ্রের পরিবারের বিবাহঘটিত সম্বন্ধ না ঘটিয়াছে, এরূপ নহে। তিনি নিজেই এইরূপ এক ক্ষত্রিয় রাজার কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন।

বীরভদ্রের জাতি যাহাই হউক, তিনি তাঁহার পারিবারিক রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, আদব-কায়দা সমস্তই, সেই সকল ক্ষত্রিয় রাজা বা জমিদারদিগের অনুরূপ করিয়া তুলিয়াছেন। সেই কারণে তাঁহার গ্রামের নাম "গড়" কোদণ্ডপুর রাখিয়াছেন। এই "গড়" অর্থে কোন পরিখা-বেষ্টিত দুর্গ বুঝিবেন না। "গড়" শব্দের প্রকৃত অর্থ তাহাই বটে; কিন্তু, এখন উড়িষ্যার রাজাদিগের বাসস্থানমাত্রেই "গড়" নামে পরিচিত। হয়ত সেই গড়টীর চারি দিকে কেবল শালবন—তাহার দশ মাইলের মধ্যেও একটী নদী, খাল বা পরিখা নাই। তবুও তাহা "গড়"। যেমন ইংরেজী কটেজের অনুকরণে, ত্রিতল প্রাসাদও আজকাল 'কুটীর' নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইরূপ পূর্ব্বকার রাজাদিগের পরিখাবেষ্টিত দুর্গের অনুকরণে, উড়িষ্যার আধুনিক রাজাদিগের বাড়ী ও গ্রাম "গড়" নাম ধারণ করিয়াছে।

বীরভদ্রের এই গড়টী কেমন? ইহাও অবশ্য কতকটা সেই রাজাদিগের বাড়ীর অনুকরণে গঠিত। বাড়ীর সম্মুখেই একটী সিংহদ্বার। একটী ইষ্টক নির্ম্মিত ফটকের দুই পার্শ্বে দুইটী সিংহ। কিন্তু সেই সিংহ

দুইটী কারিগরের গুণে সারমেয়ভাবপ্রাপ্ত। উড়ষ্যায় যতগুলি আধুনিক সিংহদ্বার দেখিয়াছি, তাহার একটীতেও প্রকৃত সিংহ দেখি নাই। সিংহদ্বারের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিলে, দক্ষিণে একটী প্রস্তর-নির্ম্মিত দেউল (দেবমন্দির) পড়িবে। সেই মন্দিরে লক্ষ্মীনারায়ণজীউ বিগ্রহ বিরাজ করিতেছেন। মন্দিরের সম্মুখে প্রস্তরনির্ম্মিত দোল-বেদী। দোল-যাত্রার সময়ে ঠাকুর সেই দোল-বেদীতে আরোহণ করিয়া ঝুল খাইয়া থাকেন। সেই মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে একটী বড় পুষ্করিণী, তাহার এক দিকে পাকা ঘাট। পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে ছোট একটী পাকা বেদা বাঁধান আছে। চন্দন-যাত্রার সময়ে ঠাকুর নৌকায় চড়িয়া, পুষ্করিণীর মধ্যে বেড়াইয়া, পরিশেষে এই বেদীর উপরে বসিয়া ভোগ খাইয়া থাকেন। পুষ্করিণীর চারি ধারে কতকগুলি নারিকেল গাছের সারি। এই পুষ্করিণী ও মন্দিরের বাম পার্শ্বে একটী ছোট একতলা কোঠা। এটী বীরভদ্রের বৈঠকখানা। ইহার চারি দিকে ও মন্দিরের সম্মুখে ফুলের বাগান। তাহাতে গোলাপ, নবমল্লিকা, যুঁই, চাঁপা, করবীর, জবা, টগর, প্রভৃতি ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। বৈঠকখানার মধ্যে, হাল ফেসিয়ান্ অনুসারে, কয়েকখানা চেয়ার, একখানা মেজ, ২।৩ খানা বেঞ্চ ও একটী ফরাস বিছানা আছে। তবে এই ঘরের দরজা প্রায়ই বন্ধ থাকে। এখানে বড় কেহ বসে না। কোন বিশেষ পর্ব্ব কি ঘটনা উপলক্ষে ইহার দরজা খোলা হয়। পঙ্কজ সাহুর ন্যায়, বীরভদ্র তাঁহার বড় "খঞ্জার" অতি ক্ষুদ্র পরিসর "পিণ্ডা" (বারান্দা)তে বসিয়াই কাজকর্ম্ম করেন।

তাঁহার বাড়ীর সম্মুখে সিংহদ্বার এবং পাকা বৈঠকখানা থাকিলেও তাঁহার বাসগৃহ সেই খঞ্জাই রহিয়াছে। হাল ফেসিয়ান্টা এত দিনে কেবল তাঁহার বাড়ীর বাহির পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াই এক দম থামিয়া গিয়াছে; তাহা আলোক ও বাতাসের ন্যায়, তাঁহার লৌহ-কীলক-মণ্ডিত বিশাল দুর্ভেদ্য কাষ্ঠকপাট ভেদ করিয়া, সেই খঞ্জার মধ্যে "পশিতে" পারে

নাই। তাঁহার খঞ্জাটী পঙ্কজ সাহু মহাজনের খঞ্জারই একটী রাজকীয় সংস্করণ মাত্র। খঞ্জাটীর ভিতর ও বাহির সেই একই রকমের, তবে ভিতরের অনেকগুলি ঘরের মেঝে পাকা, প্রাচীরও পাকা। সেই পাকা প্রাচীরের উপরে খড়ের চাল। আর সম্মুখের পিণ্ডার উপরে দুই দিকে দুইটি ছোট জানালা। সেই খঞ্জার সম্মুখে ও বৈঠকখানার পশ্চাতে একখানা আস্তাবল ঘর; তাহার অন্য দিকে গোশালা ও কয়েকটী ধানের "পালগাদা।"

এখানে বীরভদ্রের পরিবার-পরিজনের কথা কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। তাঁহার একটী মাত্র স্ত্রী এখন বর্ত্তমান—নাম সূর্য্যমণি। বীরভদ্র প্রথমতঃ এক ক্ষত্রিয় রাজা বা জমিদারের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার গর্ভে একটী কন্যা জন্মে, পরে তাঁহার কাল হয়। তৎপর তিনি সূর্য্যমণিকে বিবাহ করেন, সূর্য্যমণি একজন "করণ" জমিদারের কন্যা। তাঁহার বয়স এখন প্রায় ৩০ বৎসর, কিন্তু, তাঁহার গর্ভে কোন সন্তান জন্মে নাই। কোন গোপনীয় কারণবশতঃ সূর্য্যমণির প্রতি বীরভদ্র বড়ই বিরক্ত—এমন কি উভয়ের মধ্যে প্রায় দেখাসাক্ষাৎ হয় না। সেই পূর্ব্ব পত্নীর গর্ভজাত কন্যা শোভাবতীই এখন বীরভদ্রের জীবনের একমাত্র অবলম্বন। শোভাবতীই তাঁহার একমাত্র সন্তান; বিশেষতঃ তিনি অল্প বয়সে মাতৃহীনা হইয়াছেন, এই সকল কারণে তিনি বীরভদ্রের প্রাণের অপেক্ষাও প্রিয়। শোভাবতীর বয়স বিশ বৎসর, তিনি বড়ই রূপবতী। এখনও তাঁহার বিবাহ হয় নাই।

বীরভদ্রের কতকগুলি অদ্ভুত মত আছে। "কি! আমি আবার অন্যের শালা হইব? তাহা কখনই হইতে পারে না।" এইরূপ ভাবিয়া তিনি তাঁহার সহোদরা ভগ্নী সুভদ্রা দেয়ীর * বিবাহ দিলেন না। সেই ভগ্নীটী ৪০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অনূঢ়া থাকিয়া মরিয়া গিয়াছেন। সেইরূপ

* দেয়ী—দেবীর অপভ্রংশ, উড়িষ্যায় স্ত্রীলোকের নামের পরে ব্যবহৃত হয়।

তাঁহার একমাত্র কন্যাকে, আর একজন লোক আসিয়া বিবাহ করিয়া তাঁহার বাড়ী হইতে নিয়া যাবে, ইহাতেও তিনি অপমান বোধ করেন। তবেই তিনি সেই কন্যার বিবাহ দেন, যদি জামাতা তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া বাস করেন! তাঁহার পুত্রসন্তান নাই, সেই জন্য ঘরজামাই রাখা আবশ্যক, নচেৎ তাঁহার এই বিপুল সম্পত্তি কে রক্ষা করিবে, ইহাও যে কতকটা তাঁহার মনোগত ভাব, তাহা অনুমান হয়। কিন্তু উড়িষ্যা দেশে যখন পোষ্যপুত্র রাখার ভয়ঙ্কর ছড়াছড়ি, যখন ইচ্ছা করিলেই তিনি তাঁহার বংশের একটী বালককে পোষ্যপুত্র রাখিতে পারেন, তখন কেবল বিষয়-সম্পত্তি রক্ষার জন্যই যে গৃহজামাতার প্রয়োজন, এরূপ তাঁহার মনের ভাব নহে। যাহা হউক, সেই গৃহজামাতা ত অনেকই জোটে, কিন্তু সদ্‌বংশজাত, বিদ্যা-বুদ্ধি-রূপ-গুণ-সম্পন্ন, তাঁহার রূপবতী ও গুণবতী কন্যার সর্ব্বাংশে উপযুক্ত বর ঘরজামাই হইতে স্বীকার করিবে কেন? তিনি কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত কুলশীলবিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন একটী গৃহজামাতার অনুসন্ধান করিতেছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত পান নাই। আর কন্যাটীর বয়সও এমন বেশী কি হইয়াছে, তাহা নয়! উড়িষ্যার করণ জাতি ও ক্ষত্রিয় জাতিদিগের মধ্যে কন্যার অনেক অধিক বয়সেই সাধারণতঃ বিবাহ হইয়া থাকে।

বীরভদ্রের পরিবারে, তাঁহার স্ত্রী ও কন্যা ভিন্ন, কতকগুলি কুপোষ্য আছে। সেগুলি তাঁহার দাসী। উড়িষ্যার রাজারাজাড়াদিগের মধ্যে একটী প্রথা আছে যে, একটী কন্যার বিবাহ দিয়া তাহাকে স্বামীর গৃহে পাঠানর সময়ে, তাহার সঙ্গে কতকগুলি "দাসী" পাঠান হয়। সেই দাসীগুলি কন্যার সমবয়স্কা ও সমান রূপবতী হওয়াই প্রশস্ত। যিনি এই প্রকার যতগুলি দাসী কন্যার সঙ্গে পাঠাইতে পারেন, তাঁহার তত অধিক খোসনামী হয়। এই সকল দাসীর কাজ কি? অবশ্যই সেই কন্যাটীর পরিচারিকা হইয়া তাহার পরিচর্য্যা করা। যেমন একজন দাসীর কাজ

কন্যাটীর চুল বাঁধা, আর একজনের কাজ কন্যার গায়ে হলুদ মাখান, আর একজনের কাজ পাণ সাজা, আর একজনের কাজ স্নান করান ইত্যাদি। তবে এই শ্রমবিভাগ যে সর্ব্বথা অপরিবর্ত্তনীয় থাকে, তাহা নহে। আবশ্যক মতে এই সকল দাসী কন্যাটীকে কুমন্ত্রণাও দিয়া থাকেন। পাঠক সেই রামায়ণের মন্থরা দাসীর কথা স্মরণ করুন। যাহা হউক, কন্যার প্রতি এই সকল কর্ত্তব্য ছাড়া, বরের প্রতিও তাহাদের কর্ত্তব্য আছে; অথবা. তাহাদের প্রতি বরের কর্ত্তব্য আছে। সেই কর্ত্তব্য পালন করাতে, প্রত্যেক রাজা ও বড় জমিদারের পরিবারে "দাসী-পুত্র" নামধেয় এক শ্রেণী জীবের উৎপত্তি হইয়াছে। এই দূষণীয় প্রথা যে কেবল রাজারাজাড়াদিগের মধ্যেই আছে, এরূপ নহে। উড়িষ্যার অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের মধ্যেই আছে। অথবা সমাজে সম্ভ্রান্ত বলিয়া পরিগণিত হওয়ার পক্ষে ইহা একটী ফেসিয়ান। * বলা বাহুল্য বীরভদ্রের পরিবারেও এইরূপ অনেকগুলি দাসী আছে। তাঁহার প্রথম বিবাহের স্ত্রীর সঙ্গে পাঁচজন দাসী আসিয়াছিল; শেষ পক্ষের স্ত্রীর সঙ্গে তিনজন আসিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কয়েকজনের সন্তানও জন্মিয়াছে। বীরভদ্রের নিজের পরিবারের সংখ্যা কম থাকিলেও, এই সকল দাসী ও দাসীপুত্র ও দাসীকন্যাদিগের দ্বারা তাঁহার বাড়ী সর্ব্বদা গোলজার। প্রত্যেক দাসীর বাসের জন্য এক একটী পৃথক্ ঘর নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহারা প্রায়ই পরস্পরের মধ্যে কলহ করিয়া থাকে। প্রথম পক্ষের স্ত্রীর দাসীগণের সহিত শেষ পক্ষের স্ত্রীর দাসীগণের প্রায়ই সম্মুখ সংগ্রাম বাধে। তাহাতে সূর্য্যমণি তাঁহার নিজের দাসীগণের পক্ষ অবলম্বন করেন।

ঘরের বাহিরে বীরভদ্রের যেমন প্রতাপ, ঘরের ভিতরে সূর্য্যমণির

* যে সকল বাঙ্গালী প্রথমে উড়িষ্যায় গিয়া বাস করেন, তাঁহারা তথাকার এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছিলেন। সেই সকল বাঙ্গালীর দাসীপুত্রদিগকে "সাগরপেশা" বা "কৃষ্ণপক্ষী" বলে।

তদপেক্ষা বেশী প্রতাপ। ঘরের ভিতরটী যেন বীরভদ্রের এলাকার বাহিরে। শোভাবতীকে বীরভদ্র যথেষ্ট স্নেহ করেন, অনেক বিষয়ে তাঁহার কথা শোনেন আর সূর্য্যমণিকে দেখিতে পারেন না, এই সকল কারণে সূর্য্যমণি শোভাবতীর প্রতি বড়ই অপ্রসন্ন। বিশেষতঃ দুই একটী বিমাতা ভিন্ন কোন্ বিমাতা সপত্নীর সন্তানকে ভালবাসিতে পারিয়াছে? এই সকল কারণে শোভাবতী পিতার স্নেহ ও আদর যথেষ্ট পাইলেও সেই অন্তঃপুরের মধ্যে তাঁহার জীবন ধারণ বড় সুখকর নহে। শোভাবতী বড় বুদ্ধিমতী, তাঁহার স্বভাব বড়ই মৃদু। দেশপ্রচলিত প্রথা অনুসারে তিনি কিঞ্চিৎ লেখাপড়াও শিখিয়াছেন। সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার অসীম ধৈর্য্যগুণ প্রশংসনীয়। এই কারণে তিনি অনেক উৎপাত-উপদ্রব নীরবে সহ্য করেন। বীরভদ্রের দূরসম্পর্কীয় ভ্রাতা বাসুদেব মান্ধাতার কন্যা চম্পা-বতীর সঙ্গে তাঁহার বড় প্রণয়।

এতক্ষণ আমরা পাঠকবর্গকে বীরভদ্রের অনেক পরিচয় দিলাম। এবার তাঁহাকে সশরীরে সকলের সম্মুখে উপস্থিত করিব!

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বীরভদ্রের শাসন-প্রণালী।

বৈশাখ মাস, প্রাতঃকাল। সূর্য্য অল্প অল্প মেঘাচ্ছন্ন। রাত্রে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, মেঘ এখনও সম্পূর্ণরূপে কাটে নাই। গাছপালা বৃষ্টিতে ভিজিয়াছে; কখন কখন বাতাসে গাছ নড়াতে ঝর ঝর করিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল মাটিতে পড়িতেছে, মাটিতে পড়িয়া আবার শুষিয়া যাইতেছে। ভূমি বালুকাময়, তাহাতে কাদা হয় না। কাকগুলি রাত্রিতে জলে ভিজিয়াছিল, এখন দুই একটী করিয়া বাসার বাহিরে আসিতেছে, বসিয়া গা ঝাড়া দিতেছে, আর কা কা করিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। কোদণ্ডপুরের জঙ্গলে নূতন বৃষ্টির জল পাইয়া উৎফুল্ল হইয়া ময়ূর ডাকিতেছে। যে কবি যাহাই বলুন না কেন, আমার কিন্তু ময়ূরের ডাক ভাল লাগে না। সেই ক্যাঁ ক্যাঁ রব, কি বিশ্রী শ্রুতিকটু, যেন কাণে বিদ্ধ হয়। বিশেষতঃ, সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পক্ষীটীর কণ্ঠে এমন কর্কশ স্বর তাহার রূপের তুলনায় আরও কর্কশ বোধ হয়। বিধাতার নিতান্তই অবিচার! আচ্ছা কেন, সেই কাল কদাকার কোকিলটার কণ্ঠে এই কর্কশ স্বর দিয়া, সেই কোকিলের হৃদয়োন্মাদকারী ঝঙ্কারধ্বনি আনিয়া এই ময়ূরের কণ্ঠে দিলেই ত চলিত?

আমাদের সেই বীরভদ্র এখন তাঁহার ঘরের পিণ্ডাতে একখানি জল-চৌকির উপরে বসিয়াছেন। একজন ভৃত্য তাঁহার শরীরে তৈলমর্দ্দন করিতেছে। বীরভদ্রের বয়স প্রায় ৫০ বৎসর। তাঁহার শরীর খুব দীর্ঘ, কিন্তু বলিষ্ঠ নহে। চেহারা ঈষৎ গৌরবর্ণ, তাহার উপরে বেশ মাজাঘসা। তাঁহার লম্বা গোঁফ জোড়াটার অগ্রভাগ পাক দিয়া উপরের দিকে ফিরান, ঠিক যাত্রার দলের ভীমসেনের গোঁফের ন্যায়। শ্মশ্রুও ভীমসেনের শ্মশ্রুর ন্যায়, চিবুকের নিম্নে কামান, দুই দিকে ছোট করিয়া ছাঁটিয়া দেওয়া। চক্ষু দুইটী কোটরগত হইলেও খুব উজ্জ্বল ও তেজোব্যঞ্জক। ললাট প্রশস্ত, নাসিকা দীর্ঘ। দুই কাণে দুইটী সোণার বড় "মুলী" বা কুণ্ডল ঝুলিতেছে। গলায় এক ছড়া খুব সরু মালা। মাথার চুলগুলি খুব দীর্ঘ, পশ্চাতের দিকে খোঁপা বাঁধা। ইনি খুব দ্রুতবেগে কথা বলেন। বেশী রাগ হইলে, উড়িয়া কথার পরিবর্ত্তে মুখ হইতে অনেক হিন্দী ও উর্দ্দু কথা অনর্গল বাহির হইয়া পড়ে।

বীরভদ্র পিণ্ডার এক পার্শ্বে বসিয়াছেন, অপর পার্শ্বে তাঁহার বাড়ীর প্রধান কার্য্যকারক যদুমণি পট্টনায়ক সম্মুখে কতকগুলি তালপত্র রাখিয়া কি লেখা পড়া করিতেছেন। পিণ্ডার অদূরে আস্তাবলের সম্মুখে নিধি সামল সইস একটী বড় ঘোড়ার গাত্রমর্দ্দন করিতেছে; ঘোড়াটী আরাম বোধ করিয়া হিঁ হিঁ করিয়া ডাকিয়া উঠিতেছে। আর একটী ঘোড়া বাহিরে বাঁধা আছে; সে এখন ঘাস খাইতেছে ও লেজ নাড়িয়া মাছি তাড়াইতেছে। কুসুন জেনা রাখাল গোশালা হইতে গরুগুলি বাহির করিয়া দিল। একটী নবপ্রসূত গোবৎস ছুট পাইয়া মাতার পার্শ্বে আসিয়া খুব এক চোট বাঁট চাটিয়া দুধ খাইল ও বেশী দুধ বাহির করিবার জন্য মুখ দিয়া তাহার মাতার পেটের তলে গুঁতা দিতে লাগিল। পরে লেজ ঊর্দ্ধে তুলিয়া লাফাইয়া বেড়াইতে লাগিল। একটী বড় হরিণ এতক্ষণ সেই গোশালার পার্শ্বে শুইয়া ঘাস খাইতেছিল। সে গোবৎসের স্ফূর্ত্তি দেখিয়া,

তাহার সঙ্গে আলাপ করিবার অভিপ্রায়ে, তাহার নিকট উঠিয়া আসিল। কিন্তু বৎসটী ভয়ে ছুটিয়া পলাইল। তাহার মাতা তখন হরিণের দিকে তাকাইয়া ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া তাহাকে শৃঙ্গ প্রদর্শন করিল। তাহাদের এই কাণ্ড দেখিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ একটী বড় বিলাতী কুকুর সজোরে ঘেউ ঘেউ করিয়া সকলকে ধমক দিল। এক ঝাঁক রাজহাঁস ভয় পাইয়া লম্বা গলা বাহির করিয়া কাঁাও কাঁাও করিতে করিতে পুষ্করিণীর জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল।

ইতিমধ্যে একে একে দুই তিন জন লোক আসিয়া 'অবধান' বলিয়া দণ্ডবৎ করিয়া বীরভদ্রের সম্মুখে সেই পিণ্ডার নীচে বসিল। তাহাদের এক জনকে দেখিয়া মর্দ্দরাজ বলিলেন—"কি ও জয়সিংহ, কি খবর ?"

ভীমজয়সিং খুব দীর্ঘাকার বলিষ্ঠ পুরুষ ; ইনি বীরভদ্রের ক্ষুদ্র সৈন্য-টীর অধিনায়ক। ইহার জয়সিং উপাধিটী বীরভদ্র-প্রদত্ত। তিনি বলি-লেন, "মনিমা ! আর খবর কি—এখন ত রোজগার মাত্রেই নাই। ছেলে পুলে না খাইয়া মরিল।"

বীর। কেন, সে কি আমার দোষ ? আমি কি করিব ? তোমরা এতগুলা লোক আছ, ইহাতে দেশের মধ্যে কোন একটা চুরি ডাকাইতির সন্ধান করিতে পার না !

জয়সিং। হুজুর ! গ্রামে গ্রামে আমার লোক আছে। তাহারাও কোন খবর দিতেছে না। আর হুজুরের সুবিচারে আজকাল চুরি ডাকাইতির সংখ্যাও কম হইয়াছে।

বীর। (গোঁফে তা দিতে দিতে) সে কি রকম ?

জয়সিং। আজ্ঞা, আমি খোষামোদ করিয়া বলিতেছি না, বাস্তবিকই আপনার শাসনের গুণে আজ কাল বেশী চুরি ডাকাইতি এখানে হইতে পারে না।

বীর। আমার শাসনগুণে ত নহে, ইংরেজ বাহাদুরের শাসনের গুণে।

জয়সিং। আজ্ঞে না হুজুর! ইংরেজ বাহাদুরের শাসন ত অন্যত্রও আছে, সেখানে এত চুরি ডাকাইতি হয় কেন? আপনার শাসন ইংরেজ বাহাদুরের শাসন অপেক্ষা অনেক ভাল।

বীর। সে কি রকম?

জয়সিং। এই দেখুন না—ইংরেজের শাসনে প্রকৃত দোষী ব্যক্তির দণ্ড হওয়ার পক্ষে কত বাধা বিঘ্ন! এই যে রাম সাহু আসিয়াছে, ধরুন ইহার বাড়ী হইতে ১০০৲ টাকা চুরি গেল।

রাম সাহু। (একটু ঈষৎ হাসিয়া সভয়ে) আমি এত টাকা কোথায় পাইব। মণি-মা! জয়সিংহের কথা বিশ্বাস করিবেন না—আমি নিতান্ত গরিব।

জয়সিং। (রাম সাহুর প্রতি) আরে আমি কথার কথা বলিতেছি। তোর ভয়ের কোন কারণ নাই। (বীরভদ্রের দিকে তাকাইয়া) যদি এই ব্যক্তির বাড়ী হইতে ১০০৲টাকা চুরি যায়, তবে তাহার পুলিশে সংবাদ দিয়া বিচার পাইতে হইলে, আরও ৫০৲ টাকার দরকার। যদি বা পুলিশকে কিছু টাকা দিয়া তদন্ত করাইল, আর যদি প্রকৃত চোরও ধরা পড়িল, তবুও সেই চোর পুলিশকে "লাচ" দিয়া "করগত করিয়া" নিতে পারে। তখন সেই মোকর্দ্দমার বিচার এই পর্য্যন্তই ক্ষান্ত রহিল। আর যদি পুলিশ চোর ধরিতে না পারে, তবে ত কিছুই হইল না। যদি বা পুলিশ কোনক্রমে আসামীকে চালান দিল, তখন রাম সাহুর আবার সাক্ষী প্রমাণ লইয়া টাকাকড়ি খরচপত্র করিয়া সদরে যাইতে হইবে, সেখানে আবশ্যকমত উকীল, মোক্তার দিতে হইবে। আদালতের বিচারে অনেক সময় সত্যও মিথ্যা হয়, আবার মিথ্যাও সত্য হয়। অতএব এত টাকাকড়ি খরচপত্র করিয়াও, প্রকৃত দোষী ব্যক্তির শাস্তি হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। ধরিলাম যেন তাহার যথার্থই শাস্তি হইল। কিন্তু তাহাতে রাম সাহুর কি? সে সেই ১০০৲ টাকা, আর পুলিশকে দেওয়ার জন্ত ও

মোকর্দ্দমার অন্যান্য খরচের জন্য যত টাকা ব্যয় করিয়াছে, তাহা ফিরিয়া পাইবে কি ? কখনই না। কিন্তু হুজুরের শাসনে ও আমাদের চেষ্টায় রাম সাহুর বাড়ীর চোরকে আমরা অনায়াসেই গলা টিপিয়া ধরিয়া ফেলিব, আর আপনি তাহার যে দণ্ড দিবেন, তাহাতে তার প্রকৃত শিক্ষাও হইবে। রাম সাহুও বিনা অর্থব্যয়ে তাহার সেই ১০০৲ টাকা ফিরিয়া পাইবে। এমন চোর কোথায় আছে যে আমাদের চক্ষে ধূলা দিতে পারে ? অতএব দেখুন, ইংরেজ বাহাদুরের শাসন অপেক্ষা হুজুরের শাসন কত উত্তম। আপনার ধর্ম্ম "বুঝাপণা" ! আপনি ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির ! হুজুর আর একটী কথা !

বীর। কি ?

জয়সিং। (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) হুজুর এক দিন শীকার করিতে যাবেন বলিয়াছিলেন। হুকুম পাইলে, আমি সেই যোগাড় করিতে পারি। নন্দনপুরের জঙ্গলে যে বাঘটা আসিয়াছে, সেটা অনেক গরু বাছুর খাইয়া পয়মাল করিল। আর সেখানে ভালুকও আছে।

বীর। আচ্ছা কালই যাওয়া যাবে। তুমি সে বন্দোবস্ত কর।

এই সময়ে গ্রামের জ্যোতিষী বৃদ্ধ সদৈ নায়ক নাকে চসমা, দক্ষিণ হস্তে একখানি ছোট তালপাতার পুঁথি ও বাম হস্তে একখানি যষ্টি লইয়া যথারীতি পাঁজি কহিতে আসিলেন। ইনি প্রত্যহ প্রাতঃকালে বীরভদ্রের নিকটে আসিয়া পাঁজি বলেন, এই জন্য ইহাঁর কিছু জমি জায়গীর আছে। সদৈ নায়ক আসিয়া বীরভদ্রকে দণ্ডবৎ করিয়া অনুনাসিক স্বরে নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোকে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন :—

লক্ষ্মীস্তে পঙ্কজাক্ষী নিবসতু ভবনে ভারতী কণ্ঠদেশে
বর্দ্ধতাং বন্ধুবর্গঃ প্রবলরিপুগণা যান্তু পাতালমূলং।
দেশে দেশে চ রাজন্ প্রভবতু ভবতাং কীর্ত্তিঃ পূর্ণেন্দু-শুভ্রা
জীব ত্বং পুত্রপৌত্রাদি-সকলগুণ-যুতোঽস্তু তে দীর্ঘমায়ুঃ॥

এইরূপে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহার চিরাভ্যস্ত একঘেয়ে সুরে নিম্নলিখিত পাঁজি আবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

"আজ মেষের (বৈশাখ) ৭ দিন—রবিবার অমাবস্যা ১৫ দণ্ড ১৬ "লিত্যা" অশ্বিনী নক্ষত্র ৩ দণ্ড ১৬ "লিত্যা" আয়ুষ্মান্ যোগ ৪১ দণ্ড ১৮ "লিত্যা" নাগ করণ—"

তাঁহার আবৃত্তি শেষ না হইতেই বীরভদ্র তাঁহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—

"সদৈ নায়ক!"

সদৈ। (শশব্যস্তে যোড়হস্তে) মণি-মা!

বীর। তোমার এই জ্যোতিষ শাস্ত্র মিথ্যা না সত্য?

সদৈ। কেন মণিমা! এ "রুষি"দিগের বচন, ইহা কি কখন মিথ্যা হইতে পারে?

বীর। আচ্ছা তুমি সে দিন বলিয়াছিলে, আমার এখন ভাল সময় পড়িয়াছে। কিন্তু কই, তাহার ত কিছুই লক্ষণ দেখি না। আজ ১৫ দিন রোজগার একেবারেই বন্ধ।

সদৈ। মণিমা! আমাদের গণনাতে ভুল হইতে পারে, কিন্তু "রুষি"দিগের বচনে ভ্রম নাই। আর মানুষের ভাল মন্দ অবস্থা তুলনা দ্বারা বুঝিতে হইবে। হয়ত আপনার এখন যে সময় যাইতেছে, ইহার পরে ইহার চেয়ে খারাপ সময় পড়িতে পারে। আচ্ছা, আমি দেখিতেছি।

ইহা বলিয়া তিনি কোমর হইতে এক টুকরা খড়ীমাটি বাহির করিয়া, সেই পিণ্ডার উপরে উঠিয়া বসিয়া, মাটিতে এক রাশিচক্র অঙ্কিত করিয়া, তাহার মধ্যে বীরভদ্রের গ্রহ লগ্নাদি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া গণনা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন—

"মেষ, ব্রুষ, মিথুন, কঁকড়া, সিংহ—মণি-মা! আজ আপনার কিছু অর্থলাভ দেখিতেছি।" কিন্তু—

বীর। (একটু হাসিয়া) সব মিছা—আজ আমার অর্থলাভের কোন সম্ভাবনা নাই।

সদৈ। মণি-মা! "ঋষি"দিগের বচন মিথ্যা হইবার ত কোন কারণ দেখি না। কিন্তু—

বীর। কিন্তু কি?

সদৈ। (রাশিচক্রের উপর দৃষ্টি রাখিয়া ও ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া) মণি-মা! ভয়ে বলিব, না, নির্ভয়ে বলিব?

বীর। বল—ঠিক সত্য কথা বল—যদি কোনও অমঙ্গলের কথা হয়, নির্ভয়ে বল।

সদৈ। আজ্ঞে—কাল হইতে আপনার একটা খুব খারাপ সময় পড়িবে। তবে আর কিছু নয়, কিঞ্চিৎ "দেহদুঃখ"—একটু সাবধান হইয়া থাকিবেন, আর একটা 'নৃসিংহ'-কবচ ধারণ করিবেন। আর বিষ্ণুর সহস্র নাম ত প্রত্যহই ঠাকুরের দেউলে পাঠ করা হইতেছে।

বীর। আচ্ছা, দেখা যাবে কি হয়।

সদৈ। মণি-মা! তবে আমি এখন বিদায় হই। একবার ছোট সান্তানীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসি। আপনার কন্যাটী যেন রাজলক্ষ্মী, তিনি নিশ্চয়ই রাজরাণী হইবেন আমি বলিতেছি।

ইহা বলিয়া বৃদ্ধ এক হাতে তালপাতের পুঁথি লইয়া, অন্য হাতে লাঠি ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে, অন্তঃপুরের দিকে প্রস্থান করিল।

এই সময়ে একজন কৃষক ও তাহার স্ত্রী আসিয়া "দোহাই মণি-মা দোহাই ধর্ম্মাবতার!" বলিয়া বীরভদ্রের সম্মুখে সেই পিণ্ডার নীচে মাটিতে সটান হইয়া শুইয়া পড়িল। বীরভদ্র বলিলেন—"তোরা কে? কি হইয়াছে শীঘ্র বল্!"

পাঠক অবশ্যই চিনিয়াছেন, ইহারা মণিনায়ক ও তাহার স্ত্রী। অদূরে ঘরের আড়ালে যে অবগুণ্ঠনবতী বালিকা দাঁড়াইয়া আছে, সে তাহাদের

কন্যা নীলা। মণিনায়ক ও তাহার স্ত্রী উভয়ে এক সঙ্গে বলিতে লাগিল—

"ধর্ম্মাবতার! আপনি দেশের "রজা"—আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে! ধর্ম্ম "বুঝাপণা" হউক! আমাদের গ্রামের লোকগুলার ও মহাজনের অত্যাচারে আর আমরা গ্রামে থাকিতে পারিব না!"

উভয়ে এক সময়ে এই কথা বলিল, কিন্তু কে কি বলিল তাহা বুঝা গেল না। তখন বীরভদ্র বলিলেন "তোরা কে?"

মণির স্ত্রী। মণি-মা! আমি আপনার ঝি, আপনি আমার বাপ। আর ঐ যে আমার ঝি দাঁড়াইয়া আছে, আপনি তাহারও বাপ। মহাপ্রভু! ধর্ম্মবিচার হউক!

বীরভদ্র। (বিরক্তির সহিত) আরে, তোদের বাড়ী কোথায়? কেন আসিয়াছিস্, তাই বল্।

মণির স্ত্রী। মণিমা! আপনি আমারে চিনিলেন না? আমি আপনার প্রজা ধনী সামলের ঝি। যে বৎসর বড় সান্তানীকে আপনি বিবাহ করিয়া আনেন, আমারও সেবার নীলকণ্ঠপুরে বিবাহ হয়। আমি বাপের সঙ্গে আপনার কাছে কত আসিতাম, কত খাইতাম। পরে আমার "গোসাঁই" একটী মেয়ে ও একটী ছেলে রাখিয়া মরিয়া গেল। পরে তাহার এই ছোট ভাইয়ের সঙ্গে আমার "কাঁচখড়ু" * হইয়াছে। ঐ সেই মেয়েটা। সে আপনার ঝিয়ের সমানবয়সী। আপনার ঝিয়ের সঙ্গে কত খেলাধূলা করিয়াছে। আহা, বড় সান্তানী ছিলেন যেন দেবীপ্রতিমা! তিনি তাহাকে কত খাবার দিতেন, পরিবার কাপড় দিতেন। এমন লোক আর হয় না।

এই কথা বলিলে, বীরভদ্রের চক্ষুর প্রান্তে এক বিন্দু জল দেখা দিল। তিনি তৎক্ষণাৎ আত্মসম্বরণ করিয়া মণিনায়কের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—

* বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহকে "কাঁচখড়ু" বা "দ্বিতীয়া" বলে।

"কি রে, তুই বল্ কি হইয়াছে!"

মণিনায়ক তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়া করযোড়ে বলিতে লাগিল—

"মণিমা! আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত। আমার ঐ মেয়েটীর নামে এক মিথ্যা অপবাদ রটনা করিয়া মার্কণ্ডপধান ও অন্যান্য লোকে আমার জাতিনাশ করিতে চাহে। তাহারা যে কথা বলে, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। মেয়েটীর বিবাহ দেওয়ার জন্য আমি টাকা সংগ্রহ করিতে পারি না। পরে এক দিন মহাজনের কাছে টাকা চাহিতে গেলাম। বিম্বাধর সাহু কোনক্রমেই আমাকে ১৫ টা টাকা একমান জমি বন্ধক রাখিয়াও দিতে স্বীকৃত হইল না। পরে সেই দিন সন্ধ্যার পর, কি মনে করিয়া, সে আমার খঞ্জার ভিতরে পশিয়াছিল। আমি তাহার সঙ্গে তকরার করিলাম। সেই গোলমাল শুনিয়া ভাগবত ঘর হইতে মার্কণ্ডপধান ও আর আর অনেক লোক আসিয়া, এক মিথ্যা অপবাদ রটনা করিল যে, বিম্বাধর সাহু আমার ঝিয়ের কাছে আসিয়াছিল। পরদিন সকালে মার্কণ্ডপধান ও আর আর সকলে বৈঠক করিয়া কহিল "তুই আমাদের সকলকে ক্ষীরিপিঠা খাইতে দে, নচেৎ তোর জাতি যাইবে!" মণিমা, আমি নিতান্ত "অর্ক্ষিত" * আমি সেই ক্ষীরিপিঠার টাকা কোথায় পাইব? আপনি মা-বাপ, আপনি ধর্ম্মাবতার, আপনি দেশের "রজা"। আমি আপনার শরণ পশিলাম। আপনি রাখিতে হইলে রাখিবেন, মারিতে হইলে মারিবেন।"

ইহা বলিয়া মণিনায়ক তাহার গামোছার কোণা দিয়া চক্ষু মুছিল।

বীর। আচ্ছা, আমি ইহার প্রতিবিধান করিব—অবশ্যই করিব। সে পঙ্কজ সাহু তেলীর পো—বিম্বাধর সাহুকে আমি খুব চিনি। সে নিতান্ত নচ্ছার, বদমাইস্। সে এই রকম একজন গৃহস্থের জাতি মারিতে গিয়াছিল! আমি তাহার সমুচিত দণ্ড দিব। ছামপট্টনায়ক! তুমি

* অর্ক্ষিত=অরক্ষিত, অসহায়।

এখনই পঙ্কজ সাহুর কাছে এক চিঠি লিখিয়া পাঠাও! আমি তাহার ১০০৲ টাকা জরিমানা করিলাম। সে পূর্ব্বের কথা স্মরণ করিয়া, এই পত্র-বাহকের সঙ্গে জরুর ১০০৲ টাকা পাঠাইয়া দেয়। নচেৎ আমি নিজেই তাহার বাড়ীতে যাইব। আর মার্কণ্ড পধানকে লিখিয়া দাও, তাহারা সকলে মণিনায়ককে লইয়া সমাজে চলা ফেরা করিবে, না করিলে আমি তাহাদের সব বেটার সমুচিত দণ্ড দিব। ভীম জয়সিং! যাও, তুমি এই দুই খণ্ড পত্র নিয়া এখনই নীলকণ্ঠপুরে যাও। আমি ভাত খাইতে যাইবার আগে ফিরিয়া আসিবে।

জ্যোতিষীর কথা ফলিল। বীরভদ্র ও জয়সিং যে অর্থাগমের অভাবে দুঃখ প্রকাশ করিতেছিলেন, সৌভাগ্যক্রমে তাহার এই এক উত্তম সুযোগ উপস্থিত। মণিনায়কের কথা শুনিয়া, বীরভদ্র এক নিমেষ মধ্যেই অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ বুঝিতে পারিলেন। সেই অনুসারে ছাম-পট্টনায়ককে পত্র লিখিতে হুকুম দিলেন। হুকুম পাওয়ামাত্র ছামপট্ট-নায়ক একটী তালপাতা কাটিয়া ছোট দুই খণ্ড করিয়া সেই দুই খণ্ডের উপর লৌহ-লেখনী দ্বারা দুই খণ্ড "ভাষা" (চিঠি) লিখিলেন। লেখা শেষ হইলে, তাহা দস্তখতের জন্য বীরভদ্রের নিকটে আনিলেন। বীর-ভদ্র তাহার উপরে "খণ্ডা সস্তক" * অর্থাৎ একখানি তরবারী চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিলেন। সেই দুই খণ্ড "ভাষা" জয়সিংকে দিয়া বলিলেন —"সাবধান! ইহা আবার ফেরত আনিতে হইবে।"

* উড়িষ্যায় রাজারা নিজহস্তে নাম দস্তখত করেন না। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই এক একটী কৌলিক চিহ্ন আছে, চিঠির উপরে স্বহস্তে সেই চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দেন। যেমন ময়ূরভঞ্জের মহারাজার "সস্তক" বা কৌলিক চিহ্ন হইতেছে ময়ূর। আর যে সকল লোক লেখাপড়া জানে না, তাহাদের দস্তখতেও এক একটী "সস্তক" ব্যবহৃত হয়। এক এক জাতির এক এক রকম "সস্তক"—যেমন করণের সস্তক লেখনী, ব্রাহ্মণের সস্তক "কুশবটু" অর্থাৎ কুশের পুত্তলিকা, ক্ষত্রিয়ের সস্তক খড়্গ, গোয়ালার সস্তক "খোয়া" (মন্থন-দণ্ড) ইত্যাদি।

জয়সিং। মণি-মা! তাহা কি আবার আমাকে বলিয়া দিতে হইবে!

ইহা বলিয়া সে দণ্ডবৎ করিয়া হর্ষপ্রফুল্লচিত্তে প্রস্থান করিল।

এই সময়ে বীরভদ্রের নজর হঠাৎ তাঁহার পশ্চাতে জানালার দিকে পড়িল; দেখিলেন, তাঁহার কন্যা শোভাবতী দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া বলিলেন—

"কি মা! তুমি এখানে কতক্ষণ?"

শোভাবতী ইঙ্গিত করাতে বীরভদ্র উঠিয়া ঘরের ভিতরে আসিলেন। শোভাবতী বলিল—

"বাবা! আমি এই অল্পক্ষণ হইল আসিয়াছি। নীলার মা আমার কাছে আগে গিয়াছিল। তাই তাদের কথা তোমাকে বলিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু—"

বীর। আর বলিবার প্রয়োজন নাই। আমি সেই দুষ্ট তেলী বেটার সমুচিত দণ্ড দিতেছি।

শোভা। তা'ত দেখিলামই, কিন্তু বাবা! একটা কথা।

বীর। কি?

শোভা। এই ইহারা যে কথা বলিল, তাহা যদি সত্য না হয়? ইহাদের কথা সত্য কি মিথ্যা, তাহা একবার তাহাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলে হইত না কি?

বীর। মা, তুমি বোঝ না। আমার টাকা নিয়া কথা, আমি সত্য মিথ্যার কোন ধার ধারি না। তবে তুমি নিশ্চয়ই জানিও, সেই বুড়া পঙ্কজ সাহু তেলি এতগুলি টাকা কখনও সহজে বাহির করিয়া দিবে না। সে নিশ্চয়ই নিজে চলিয়া আসিবে। তখন প্রকৃত ঘটনা জানা যাবে।

ইহা বলিয়া বীরভদ্র গামোছা কাঁধে করিয়া পুষ্করিণীতে স্নান করিতে গেলেন। এক জন ভৃত্য একখান হলুদ রঙের উৎকৃষ্ট গরদের ধুতি

লইয়া ঘাটে গেল। তিনি স্নান করিয়া সেই ধুতি পরিলেন ও পৃষ্ঠদেশে চুলগুলি ছাড়িয়া দিলেন। পরে খড়ম পায়ে দিয়া ঠাকুর-মন্দিরে গেলেন। ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া সেই মন্দিরের বারান্দায় বসিয়া "পূজা-মুনিহি" (থলিয়া) খুলিয়া তিলক মাটি বাহির করিয়া, হাতে ঘসিয়া, কপালে একটী ফোঁটা পরিলেন। পরে এক "কণিকা" মহা-প্রসাদ ও শুষ্ক তুলসীপত্র বাহির করিয়া, তাহা এক গণ্ডূষ জলের সঙ্গে খাইয়া, হাত ধুইয়া ফেলিলেন। তখন সেই মন্দিরের পূজারী ঠাকুর সেখানে বসিয়া তাঁহার সম্মুখে এক অধ্যায় ভাগবত পাঠ করিলেন। তিনি সেই "গীত" শুনিবার ভাণ করিয়া গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন। তখন তাঁহার মনের মধ্যে কি কি ভাবের খেলা হইতেছিল, তাহা আমি কি করিয়া বলিব?

ভাগবত পড়া শেষ হইলে, বীরভদ্র উঠিয়া বাড়ীর ভিতরে যাইবেন, এই সময়ে বৃদ্ধ পঙ্কজ সাহু এক লাঠি ভর দিয়া ভীমজয়সিংএর সহিত আসিয়া উপস্থিত হইল। বৃদ্ধ ঠিক মণিনায়কের মত তাঁহার সম্মুখে সটান হইয়া শুইয়া পড়িল। তখন তিনি সেই পিণ্ডার উপরে গিয়া বসিয়া বলিলেন "কই—টাকা কোথায়?"

পঙ্কজ। মণিমা! ধর্ম্মবিচার হউক! আমার ওজোর শুনিয়া, পরে হুকুম দেওয়া হউক। আপনি মা বাপ, রাখিলে রাখিতে পারেন, মারিলে মারিতে পারেন। ধর্ম্ম "বুঝাপনা" হউক!

বীর। কি বলিতে চাও বল।

পঙ্কজ। মণিমা! আমার কোন দোষ নাই। মণিনায়ক মিথ্যা নালিশ করিয়াছে।

মণিনায়ক ও তাহার স্ত্রী একটু দূরে বসিয়াছিল। মণিনায়ক উঠিয়া আসিয়া যোড়হস্তে বলিল—

"মণিমা! তিনি আমার মহাজন, আমার ধড়ে কয়টা "মুণ্ড" যে

তাহার নামে মিথ্যা নালিশ করিব? যদি হুজুর চান, তবে আমি "গোহ্মা প্রমাণ" * দিতে পারি।"

বীর। না, সাক্ষী নেওয়ার কোন দরকার নাই। আমি জানিতেছি ঘটনা সত্য। পঙ্কজ সাহু! শীঘ্র জরিমানার টাকা বাহির কর।

পঙ্কজ। মণিমা! যদিবা আমার ছেলে তাহার বাড়ীতে গিয়া থাকে, সে নিতান্ত "পেলা" † সে কিছু বোঝে না। পেলার অপরাধ মাপ করা হউক। আমারে জরিমানার দায় হইতে মুক্তি দেওয়া হউক।

বীর। তাহা কখনও হইবে না। কি? এত বড় কথা? এত বড় আস্পর্দ্ধা? একজন তেলী একজন খণ্ডাইতের জাতি মারিবে? আমি বাঁচিয়া থাকিতে কখনও তাহা হইতে পারিবে না! "পকা!—টঙ্কা" টাকা ফেল!

পঙ্কজ। মণিমা! আমি অত টাকা কোথায় পাব? আমার সব ধান ও টাকা ডুবিয়া গিয়াছে। এখন কিছুই নাই।

বীর। তোমার ও সব গ্যাকাম রাখিয়া দাও। সেই "পইড়পানি"র ‡ কথা মনে আছে ত?

পঙ্কজ। আচ্ছা, হুজুর, আমি দিচ্ছি—কাল একটা খাতকের গরু ক্রোক্ করিয়া মোটে এই পঞ্চাশটী টাকা পাইয়াছিলাম। আপনার ভয়ে তাহাই আনিয়াছি। ইহাই নিয়া আমাকে মুক্তি দিতে হুকুম হউক।

ইহা বলিয়া কোমরের বোটুয়া হইতে ৫০ টাকা গণিয়া বীরভদ্রের সম্মুখে রাখিল।

বীর। না, তাহা কখনও হবে না। আমি সেই এক শ টাকার একটী পয়সা কম হইলেও নিব না। একি ঠাট্টা মনে করিতেছ? এক জন লোকের জাতি মারা কম কথা নহে!

পঙ্কজ। তবে আমাকে মারিয়া ফেলুন! এই বুড়াটাকে মারিলে যদি আপনাদের ভাল হয়, তবে তাহাই করুন!

---

* সাক্ষী। † ছেলে মানুষ। ‡ ডাবের জল।

ইহা বলিয়া সেই বুড়া মহাজন আবার হাত পা ছড়াইয়া সটান হইয়া শুইয়া পড়িল।

বীর। ওরে জয়সিং! এ সেয়ানা বদমাইস, এ শীঘ্র টাকা বাহির করিবে না। এক জন কণ্ডার † হাতে দিয়া একটা "পইড়" আনত!

পঙ্কজ সাহু দেখিল বড় শক্ত লোকের হাতে পড়িয়াছে। শেষে যদি জোর করিয়া "পইড় পানি" খাওয়ায়, তবে আবার জাতি যাইবে। সে তখন বলিল—

"মণিমা! আপনি যখন ছাড়েন না—তখন আর কি করিব? আর দশটা টাকা ছিল, তাহাই দিতেছি। আমারে খালাস দিন!"

ইহা বলিয়া কোঁচা খুলিয়া একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া বীরভদ্রের সম্মুখে রাখিল।

বীরভদ্র। ওরে জয়সিং! এ বুড়াটা নিশ্চয়ই ঠাট্টা মনে করিতেছে। ইহার কাপড় খুলিয়া ভাল করিয়া তল্লাস করিয়া দেখত?

তখন জয়সিং বুড়ার কাছা ধরিয়া টান দিয়া খুলিয়া ফেলিল। কাছার মধ্য হইতে দশ টাকার আর চারি খানা নোট বাহির হইয়া পড়িল। তখন পঙ্কজ সাহু "সব নিলরে—সব নিল!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। এক নিমেষের মধ্যে সেই নোটগুলি ও টাকা পঞ্চাশটী বীরভদ্রের হস্তগত হইল। তখন বুড়া মহাজন ভূমিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—

"মণিমা! আপনি ধর্ম্ম-অবতার। আপনি মা-বাপ। আমার প্রতি একটু দয়া হউক। আচ্ছা ভাল, বুড়াটা আপনার দুয়ারে পড়িয়া কাঁদিতেছে, ইহার অন্ততঃ এক খানা নোট আমাকে ফেরত দিন। আমি বাড়ী নিয়া যাই। ঐ নোট ও ঐ টাকাগুলি আমার গায়ের রক্ত। আমার যে বুক ফাটিয়া গেল। ওহো! একশ টাকা! কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্ব-

† কণ্ডা—অস্পৃশ্য জাতি।

নাশ ! আরে বিম্বা—ছড়া, তোর জন্য এই বুড়া বয়সে আমার এত দুর হইল—আরে ছড়া ! হে কৃষ্ণ !—হে মহাপ্রভু !—”

বীরভদ্র তাহার এই কাতরোক্তিতে কর্ণপাত না করিয়া, স্থিরচিত্তে সেই টাকা হইতে মণিনায়ককে তাহার মেয়ের বিবাহের জন্য পনের টাকা এবং জয়সিং ও তাহার দলস্থ লোকদিগকে দশ টাকা বক্‌সিস্‌ দিলেন। মণিনায়ক দণ্ডবৎ হইয়া সেই টাকা লইয়া প্রস্থান করিল। তখন পঙ্কজ সাহু বলিল—“মণিমা ! আচ্ছা, ভাল আমি ত আপনার বাড়ীতে এই দুই প্রহর বেলায় না খাইয়া আসিয়াছি, আমাকে খাইবার জন্য একটা টাকা দিতে হুকুম হউক ! দোহাই ধর্ম্মাবতার ! দোহাই “মর্দ্দ-রাজ সাস্তে !”

এই কথা শুনিয়া বীরভদ্র ঠন করিয়া একটা টাকা তাহার সম্মুখে সিঁড়ির উপরে ফেলিয়া দিয়া, অবশিষ্ট টাকাগুলি লইয়া, অন্দরে প্রস্থান করিলেন। মহাজন সেই টাকাটা কুড়াইয়া লইয়া মণিনায়ক, বিম্বাধর সাহু ও নিজের অদৃষ্টকে গালি দিতে দিতে স্বগৃহে প্রস্থান করিল।

তৃতীয় অধ্যায়।

শোভাবতী।

আজ প্রাতঃকালে বীরভদ্র মর্দ্দরাজ স্নানাহারাদি করিয়া ঘোটকারোহণে বন্দুক সঙ্গে লইয়া শীকারে বাহির হইয়াছেন। এখন বেলা প্রায় তিন প্রহর। রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে; একটুও পবন বহে না। বড় গরম। বীরভদ্রের অন্তঃপুরে সকলে আহারাদি করিয়া শুইয়াছে, কেহ হাসিকৌতুক গল্পগুজব করিতেছে। শোভাবতী তাহার নিজের ঘরে এতক্ষণ ভূমিতলে শীতলপাটীর উপর শুইয়া ঘুমাইয়াছিল। এখন ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, শুইয়া গড়াগড়ি দিতেছে। ঘরটী খুব বড়; মেঝে ও দেওয়াল পাকা; ঘরে একটীমাত্র দরজা ও একটী ক্ষুদ্র জানালা, চারি দিকের দেওয়ালে নানারকম আলিপনা দেওয়া। ঘরের এক পার্শ্বে একখানা বড় "পলঙ্ক"। পালঙ্কখানা কাষ্ঠনির্ম্মিত, বেতের ছাউনি, মাথার দিকে একটী উচ্চ তাকিয়ার ন্যায় কাটের বেড়, তাহাতে অনেক কারুকার্য্য করা আছে। পালঙ্কের উপরে কোমল শয্যা প্রস্তুত; বিছানার চাদর ও বালিশগুলি পিপ্‌লির কারিগরের হাতের তৈয়ারী। তাহাতে অনেক সূচীকার্য্য করা।

শোভাবতী শুইয়া শুইয়া কিছুক্ষণ একখানা ছাপার পুস্তক পড়িতে চেষ্টা করিল। বইখানি উপেন্দ্রভঞ্জ প্রণীত "লাবণ্যবতী"। খানিক

পড়িয়া আর ভাল লাগিল না। তখন উঠিয়া বসিল ও তৃণ দিয়া যে একখানা ছোট পাখা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাই বুনিতে লাগিল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, শোভাবতী বিংশবর্ষবয়স্কা যুবতী ও রূপবতী। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ; সমুন্নত নাসিকা; চক্ষু উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ, ভ্রূযুগল যেন তুলি দিয়া আঁকা; মুখের গঠন সৌষ্ঠবসম্পন্ন; দুইটী গোলাপ দল একত্র মিলিত হইয়া যেন অধরোষ্ঠ গঠিত হইয়াছে; মাথায় এক রাশি কাল কোঁকড়া চুল। এই সকলের সঙ্গে, যদি তাহার শরীরটা ঠিক তালগাছের মত লম্বা ও ক্ষীণ হইত, তবে পাশ্চাত্যরুচিবিশিষ্ট পাঠকগণের খুব পছন্দ-সই হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, আমি তাঁহাদিগকে খুসী করিতে পারিলাম না। শোভাবতীর আকৃতি বেশী লম্বাও নয়, আবার বেশী খাটোও নয়। শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি বেশ পুষ্ট, কিন্তু শরীর স্থূল নহে।

শোভাবতীর পরিধানে একখানা খুব চৌড়া কালপাড়যুক্ত দক্ষিণ দেশী সাড়ী, হাতে সোণার "কঙ্কন" "তাড়," আর রূপার চুড়ী; গলায় সোণার "কণ্ঠী", কাণে "কর্ণফুল" ও "ঝুম্‌কা", নাকে নথ; পায়ে রূপার "গোড়বালা" ও নূপুর, কোমরে এক ছড়া রূপার চন্দ্রহার। হাতের অঙ্গুলিতে অনেকগুলি মুদী বা অঙ্গুরী।

খানিকটা পাখা বুনিয়া শোভাবতী মালা গাঁথিতে বসিল। একখানি তামার পুষ্পপাত্রে অনেকগুলি নবমল্লিকা (বেল), মালতী, যুঁই ও কাঁটালী চাঁপা ফুল সাজান ছিল। বাড়ীতে যে শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণজী বিগ্রহ আছেন, তাঁহার সান্ধ্য আরতির সময়ে প্রত্যহ তাঁহাকে "ফুল-হার" দিয়া সাজান হয়। শোভাবতী নিজহস্তে সেই মালা গাঁথিয়া থাকে। সে একটী চাঁপাফুলের মালা গাঁথিয়া রাখিয়া, গুন্ গুন্ স্বরে গান করিতে করিতে, একটী বেলফুলের মালা গাঁথিতে আরম্ভ করিল।

শোভাবতী মালা গাঁথিতে বসিয়াছে। তাহার রেশমসূত্রের ন্যায় সূক্ষ্ম, উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ, কুঞ্চিত কেশকলাপ, পৃষ্ঠদেশ ঢাকিয়া, দুই দিকে সুগোল বাহুমূলের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে। সেই অলকগুচ্ছের অন্তরালে থাকিয়া সুবর্ণ কর্ণভূষণগুলি ঈষৎ দুলিয়া ঝিকিমিকি করিতেছে। এই সময়ে হঠাৎ তাহার পশ্চাৎ হইতে কে আসিয়া তাহার গলায় এক ছড়া চাঁপাফুলের মালা পরাইয়া দিল। শোভাবতী ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিল— চম্পাবতী। পাঠকের মনে আছে, চম্পাবতী বীরভদ্রের জ্ঞাতি ও দূর-সম্পর্কীয় ভ্রাতা বাসুদেব মান্ধাতার কন্যা। শোভাবতী বলিল—

"কে লো? চম্পা! তোর মালা পরাণর যে বড় সাধ দেখিতেছি? একটু দেরী সয় না? আমার ফুলের হারটা কেন নষ্ট করিলি বল্ ত?

চম্পা। না লো না!

শোভা। কি না? দেরী সয় না তাই না;—না আমার মালা নষ্ট করিস্ নাই, তাই না।

চম্পা। যদি বলি দুইটাই না?

শোভা। (মালার দিকে চাহিয়া) তাইত, এই যে আমার মালা আছে! তবে তুই এ মালা পাইলি কোথায়? আর এই বৈশাখ মাসের ২৫শে তোর "বাহা." আর মাত্র ১৪ দিন বাকী। তোর বুঝি এক'টা দিনও দেরী সয় না? তাই যার তার গলায় মালা পরাইয়া বেড়াস্?

চম্পা। তুমি যমের বাড়ী যাও! তুমি আইবুড় হইয়া মরিতে পারিবে, আর আমার এই কয় দিন দেরী সবে না? এ কেমন কথা?

শোভা। (হাসিয়া) আমি বুঝি আইবুড় হইয়া মরিব? জ্যোতিষী বলে, আমি রাজরাণী হব!

চম্পা। তাই নাকি? বস্, এখন চুপ করিয়া বসিয়া থাক্, এক দিন কোন্ রাজার রাজহস্তী আসিয়া তোকে মাথায় তুলিয়া নিয়া রাজার কাছে গিয়া হাজির করিবে! কিন্তু ভাই, তা হ'লে আমি তোর সখী হ'য়ে যাব।

শোভা। তা হ'লে অভিরাম সুন্দররায়ের কি উপায় হবে? সে বেচারা দেখিতেছি বিরহে মারা পড়িবার জন্যই তোকে "বাহা" করিতেছে। আর তুইবা তা'কে ছাড়িয়া কি রকমে থাকৃবি? তুই এখনই তা'কে মালা পরাইবার জন্য যে রকম ব্যস্ত হইয়াছিস্?

চম্পা। না দিদি, ঠাট্টা ছাড়। বাস্তবিকই আমার মনে বড় ইচ্ছা হইয়াছিল একছড়া চাঁপাফুলের মালা তোর গলায় পরাইয়া দিয়া দেখিব, তোর গায়ের রঙের সঙ্গে চাঁপার রঙ কেমন দেখায়! তাই আজ দুপহর বেলা বসিয়া এই মালাটা গাঁথিয়া আনিয়াছি। বাস্তবিকই তোর বর্ণের কাছে চাঁপার বর্ণ মলিন হইয়াছে!

শোভা। আর তোর বর্ণের কাছে কিসের বর্ণ মলিন হবে?

চম্পা। হাঁড়ীর কালীর বর্ণ।

শোভা। তাই বুঝি? এই যে বলে প্রদীপের কোল আঁধার, তোর তাই হ'লো! তুই কেবল পরের রূপই দেখিস্, নিজের রূপ আর দেখিস্ না। তুই কালো হ'লে, অভিরাম সুন্দররায়ের ঘর কে আলো করবে?

চম্পা। কেন, প্রদীপ!—আর ইচ্ছা হ'লে, তুমি!

শোভা। তা হ'লে তোর উপায় কি হবে? তুই যে লাবণ্যবতীর মত বিরহে মারা পড়বি।

চম্পা। সে কি রকম?

শোভা। এই যে আজ পড়িতেছিলাম—বর্ষাকাল আগত দেখিয়া বিরহাতুরা লাবণ্যবতীর সখীগণ সেই দুর্দ্দিনে তাহার কি দশা ঘটিবে, তাহা বলাবলি করিতেছে।—

(গানের সুরে)—

"দেখি নবকলিকা বকালিকা মালিকা
আলি কালিকা-কান্ত স্মরি।
রক্ষা কেমন্ত করি, করিবা মত্তকরী

গতি কি এমন্ত বিচারি—রে সহচরি !
ভাবে বঞ্চিলে একালকু
কথা থিবে কাল কালকু
একে ত ক্ষীণ দীন
হেলা দুর্দ্দিন দিন
ন লভি বল্লভ মেলকু—রে সহচরি !
হিত আনমানকু,
শত কামী জনকু
অহিপরা অহিত এহি।
হত কৃশানু শানু—
মানরু ভানু ভানু—
তাপরু নিস্তারিলা মহীকু—রে সহচরি !
বিরহানল হৃদ্‌স্থলে
জলে, সে হত নোহে জলে
করুচি জাত জাতবেদাকু শত—
শতহ্রদা ছলরে ঘনকোলে—রে সহচরি।" (১)

(১) নেহারি নবনীরদ, বকশ্রেণী সুশোভিত,
সখীগণ স্মরে মহেশ্বরে।
কি উপায়ে রক্ষা করি, এ যে হ'লো মত্তকরী
মনে মনে ইহাই বিচারে॥

সখীরে—
যদি কাটে এই কাল, কথা রবে চিরকাল
একেত হইল ক্ষীণ দীন।
তাহে এই বর্ষা কাল, ঘটা'ল বড় জঞ্জাল
না লভিয়ে বল্লভ মিলন॥

চম্পা। যাহো'ক যতদূর বুঝিলাম, তাহাতে দেখিতেছি লাবণ্যবতী ত সেই বর্ষার দুর্দ্দিনে একরকম রক্ষা পাইয়াছিল, কিন্তু আমার শোভাবতীর যে এবার কি দশা ঘটিবে, আমি কেবল তাহাই ভাবিতেছি।

শোভা। আচ্ছা, আপনি এখন আপনার নিজের ভাবনা ভাবুন, আমার ভাবনা আর আপনাকে ভাবিতে হবে না।

এই সময়ে একটী কুরঙ্গশাবক লাফ দিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িল। শোভাবতীর পাশে একটী পানের বাটায় চেপ্‌টা, গোল, ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, নানা আকারে পান সাজা ছিল; আসিয়াই সে তাহার একটী পান মুখে তুলিয়া চর্ব্বণ করিতে লাগিল। শোভাবতী বলিল—"ওলো, দেখ্ চম্পা, আমার চঞ্চলা এতক্ষণ কিছুই খায় নাই। আমি তোর সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে উহার কথা ভুলিয়া গিয়াছি।"

শোভাবতী সেই কুরঙ্গশিশুর গায় হাত দিল, সে লেজ ফুলাইয়া তাহার হাত চাটিতে লাগিল। শোভাবতী তখন চম্পাকে এক বাটী দুগ্ধ

আর যত লোকে হিত, বিরহী জনে অহিত
হয় এই বরিষার কাল।
কামীজনে যেন অহিকাল॥

সখীরে—

নিখিল পর্ব্বতে বহ্নি, নিখিল ভূমিতে অগ্নি
তপনের তাপ হ'লো ক্ষীণ।
জ্বলিল বিরহানল, বিরহীর মর্ম্মস্থল
দহিতেছে রহি অনুদিন॥

সখীরে—

সে আগুণ নাশিবারে, বারিধারা নাহি পারে
শত অগ্নি তাপে তাহা জ্বলে।
ঘনকোলে সৌদামিনী ছলে॥

আনিতে বলিল। চম্পা দুগ্ধ আনিয়া চঞ্চলার সম্মুখে ধরিল। সে একবার-মাত্র আঘ্রাণ করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। তখন শোভাবতী বলিলঃ—

"বুঝিয়াছি—চম্পার হাতে খাবে না।" তখন শোভাবতী নিজে সেই দুগ্ধের বাটী আবার চঞ্চলার মুখের নিকট ধরিল। আবার সে মুখ ফিরাইয়া লইল। শোভাবতী বলিল ঃ—

"ওলো চম্পা! দেখ্লি, এ আমার কেমন আব্দারের মেয়ে! প্রথমে আমি নিজে হাতে করিয়া দুধ দিই নাই, তাই উহার রাগ হইয়াছে!"

তখন শোভাবতী সেই বাটী হাতে করিয়া ঘরের বাহিরে গেল। চঞ্চলা ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া একটা ফুল শুঁকিতে লাগিল। শোভাবতী সেই দুগ্ধ, আর একটা বাটীতে করিয়া আনিয়া, আবার তাহার সম্মুখে ধরিল। এবার চঞ্চলা লেজ ফুলাইয়া চুল্ চুল্ করিয়া সেই দুধ খাইয়া ফেলিল।

চম্পা বলিল—"আমি এখন বাড়ী যাই—কত কাজ আছে।"

শোভা।—আর যে কয় দিন আছিস্, দিনের মধ্যে ২।৩ বার করিয়া আসিয়া দেখা দিস্। তার পরে ত আর তোর দেখা পাব না? একেবারে জন্মের মত চ'লে যাবি। "যমে নিলেও যা, জামাইয়ে নিলেও তা।" (১)

চম্পা। বেশ ত! তুমি যাবে যমের বাড়ী, আমি যাব জামাই বাড়ী!

ইহা বলিয়া চলিয়া গেল। শোভাবতী মৃগশিশুকে বাঁধিয়া রাখিয়া

(১) উড়িষ্যা দেশে করণ জাতির কন্যা শ্বশুর বাড়ী গেলে, আর কখনও পিত্রালয়ে আসিতে পারে না। কারণ দেশের প্রথা এই, কন্যাকে স্বামিগৃহে পাঠাইতে হইলে অনেক জিনিষপত্র দিয়া পাঠাইতে হয়। প্রথমবারে যখন পাঠান হয়, তখন যে রকম জিনিষপত্র দিতে হয়, তাহার পরে প্রত্যেক বারেও সেই রকম দিতে হয়। তাহার ফল ইহাই দাঁড়াইয়াছে যে, প্রথমবারেই কন্যা জন্মের মত বিদায় হইয়া স্বামিগৃহে যায়। বরও কখন শ্বশুর বাড়ীতে আসিতে পারেন না। বর শ্বশুরবাড়ী আসিলে তিনি যে সকল জিনিষ ব্যবহার করিবেন, কিম্বা স্পর্শ করিবেন, তাহাই তাঁহাকে দান করিতে হইবে। সুতরাং বরের এই দুর্জ্জয় মর্য্যাদা রক্ষা করা বড়ই দুঃসাধ্য ব্যাপার। সেজন্য তাঁহার শ্বশুরগৃহে "প্রবেশ নিষেধ"।

আসিয়া, আবার মালা গাঁথিতে বসিল ; অল্পক্ষণ পরে উজ্জ্বলা দাসী সেই ঘরে আসিল। উজ্জ্বলা শোভাবতীর মায়ের দাসী ছিল। শোভাবতীর মাতার মৃত্যুর পর তাহাকে মাতার ন্যায় লালনপালন করিয়াছে। শোভা-বতীও তাহাকে মাতার ন্যায় দেখে ও মা বলিয়া ডাকে। তাহাকে দেখিয়া শোভাবতী বলিল—

"মা! বেলা ত গেল, কই বাবা যে আসিলেন না? আর কোনও দিন ত শীকারে গেলে এত দেরী হয় না?"

উজ্জ্বলা। তাই ত? বোধ হয়, অনেক দূরে গিয়া থাকিবেন। তুমি এস, মালাগাঁথা এখন থা'ক, আমি তোমার চুল বাঁধিয়া দিয়া যাই। আমার কত কাজ আছে।

ইহা বলিয়া শোভাবতীর পশ্চাতে তাহার চুলগুলি লইয়া বসিল।

শোভা। কেন মা! তুমি একলা এত কাজ কর কেন? আর সকলে কেবল বসিয়া বসিয়া কাটায়।

উজ্জ্বলা। আমি কি করিব মা? আমি কোন কথা বলিলেই ত সাস্তানীর সঙ্গে লাগে। তাঁহার দাসীগুলিকে তিনি সংসারের কোনও কাজ করিতে দিবেন না। তা'রা কেবল তাঁহার নিজের ফরমাইস্ জোগাবে। সংসারের এক কড়ার কাজও করিবে না। আর এক কথা শুনিয়াছ?

শোভা। কি?

উজ্জ্বলা। সাস্তানীর ভাই চক্রধর পট্টনায়ক আসিয়াছেন।

শোভা। মামা আসিয়াছেন, বেশত?

উজ্জ্বলা। তাঁহার আসিবার কারণ জান কি?

শোভা। না। বোধ হয় মামা বেড়াইতে আসিয়াছেন।

উজ্জ্বলা। কেবল সে উদ্দেশ্য নয়—আরও কথা আছে।

শোভা। কি?

উজ্জ্বলা। (চুপে চুপে) তাঁহার পালক পুত্র উদয়নাথের সঙ্গে

তোমার বিবাহের প্রস্তাব করিতে। তিনি উদয়নাথকে ঘরজামাই করিয়া দিতে ইচ্ছা করেন।

শোভাবতীর মুখ লজ্জায় আরক্তিম হইল। সে কোন কথাই বলিল না। উজ্জ্বলা আবার খুব চুপে চুপে বলিতে লাগিল—

"তুমি পট্টনায়কের মতলব বুঝিতেছ? তাঁহার নিজের দুই হাজার টাকা লাভের জমিদারী আছে, তাহাতেও তাঁহার মনে সন্তোষ নাই। তাঁহার মতলব এই—উদয়নাথকে এখানে ঘরজামাই করিয়া দিলে, মর্দ্দরাজ সান্তের অন্তে, পট্টনায়ক এ সম্পত্তিরও মালিক হবেন। সে উদয়নাথ ত একটা "হুণ্ডা," সে লেখাপড়া কিছুই জানে না, যেমন রূপ, তেমনি গুণ! সে সেবার সান্তানীর সঙ্গে আসিয়াছিল, আমি তা'কে বিশেষ রকমে দেখিয়াছি। পট্টনায়কও তাহাকে পোষ্যপুত্র করেন নাই! প্রথমে পোষ্যপুত্র করিবেন বলিয়াই প্রতিপালন করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে তাঁহার নিজের একটি ছেলে জন্মিল। এখন উদয়নাথ তাঁহার সংসারেই থাকে, খায় দায় ঘুরিয়া বেড়ায়। যা হোক, মর্দ্দরাজ সান্ত যে এই বিবাহে মত দিবেন, আমার বোধ হয় না। আমি নিজেই তাঁহাকে বলিব—যা থাকে কপালে। ছোট সান্তানী অবশ্যই তাঁহার ভাইয়ের উদ্দেশ্য যাহাতে সফল হয় সেই চেষ্টা করিবেন, আমি নিশ্চয়ই জানি। আজ তোমার উপর সান্তানীর বড় রাগ দেখিতেছি।"

শোভা। কেন? আমি কি করিয়াছি?

উজ্জ্বলা। কর বা না কর, তাঁর স্বভাবই ঐ।

ইহা বলিয়া উজ্জ্বলা শোভাবতীর চুল বাঁধা শেষ করিয়া উঠিয়া গেল। বলিয়া গেল "ঠাকুরের মালা গাঁথা শেষ করিয়া, ছোট এক ছড়া মালতীর হার গাঁথিয়া খোপায় পরিও; আর আমি একটা গোলাপ আনিয়া দিব, তাহাও খোপায় পরিতে হইবে। আর মর্দ্দরাজ সান্তের কাণে পরিবার জন্য ছোট দুইটা ফুলের তোড়া করিয়া রাখিও।"

এই সময়ে সারি দাসী আসিয়া শোভাবতীকে বলিল—

"সাস্তানী আপনাকে ডাকিতেছেন"।

শোভা। কেন বলিতে পার ?

সারি। গেলেই বুঝিতে পারিবেন।

বীরভদ্রের পাটরাণী শ্রীমতী সূর্য্যমণি দেবী তাঁহার ঘরে একখানি ছোট গালিচার উপর বসিয়া আছেন। ঘরটি খুব বড়, তাহার চারি দিকের দেওয়ালে তাঁহার স্বহস্তরচিত অনেক রকম আলিপনা দেওয়া লতা, পাতা, ফুল, মানুষ আঁকা। ঘরের কোণে কয়েকটা কড়ীর 'শিকায়' অনেকগুলি 'হাণ্ডি' ঝুলিতেছে। সেই 'হাণ্ডি'গুলির পৃষ্ঠে তাঁহার চিত্রবিদ্যার অনেক পরিচয় বিদ্যমান। ঘরের অন্যান্য আসবাবের বিশেষত্ব কিছুই নাই।

সূর্য্যমণির শরীর যেমন মোটা, তেমনি কালো। তাঁহার রূপ সম্বন্ধে এই একটী কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, উড়িষ্যার করণ সমাজে বিবাহের পূর্ব্বে সাক্ষাৎসম্বন্ধে কন্যা দেখিবার প্রথা যদি বিদ্যমান থাকিত, তবে বীরভদ্র তাঁহার পূর্ব্ব স্ত্রীর পরে কখনও তাঁহাকে বিবাহ করিতে রাজি হইতেন না। কারণ, সমাজে কন্যা-নির্ব্বাচন একরকম সুরতি খেলার উপরে নির্ভর করে। বরপক্ষীয় কেহই কন্যার রূপগুণ প্রত্যক্ষ করিতে পারে না, কেবল পরের মুখে শুনিয়া পছন্দ করিতে হয়।

সূর্য্যমণির শরীর যে রকমই হউক, তাহার উপরে সৌন্দর্য্য ফলাইবার চেষ্টায় বারম্বার অকৃতকার্য্য হইলেও, তিনি একেবারে হতাশ হন নাই। কেবল তিনি কেন ? এ সংসারে অন্যান্য সকল বিষয়ে হতাশ হইলেও, রূপবৃদ্ধি বিষয়ে হতাশ হইতে বড় কাহাকেও দেখা যায় না। স্বভাবের ত্রুটি তিনি বেশবিন্যাসের দ্বারা সংশোধন করিতে বিশেষ যত্নবতী। তিনি একখানা চৌড়া লালপাড় দক্ষিণী সাড়ী পরিয়াছেন। হাতে, পায়ে, নাকে, কাণে, বাহুতে, কোমরে, কোনও স্থানেই সোণারূপার একখানা গহনারও অভাব বা ত্রুটি নাই। তাঁহার খাঁদা নাকের উপর

সোণার বড় একখানা "বসণি" (অৰ্দ্ধচন্দ্র) ও বড় একটা নথ অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিয়াছে।

এক জন দাসী এখন তাঁহার গায়ে তেল-হলুদ মাখাইতেছে। আর এক জন দাসী অদূরে বসিয়া, আমের আচার প্রস্তুত করিবার জন্ত, বঁটি দিয়া আম কুটিতেছে। সূর্য্যমণি আমের আচার, কুলের আচার, নেবুর আচার, প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে সিদ্ধহস্তা। আর একজন দাসী সেই ঘরের এক কোণে বসিয়া পান সাজিতেছে। সূর্য্যমণি এই শেষোক্ত দাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"ওলো—শীঘ্র একটা পান দে, আমার গলা শুকাইয়া গেল! তোর সব কাজই ঐ রকম—একটা পাণ সাজিতে কয় মাস লাগে ?"

দাসী। এই দিচ্ছি।

দাসী একটি পাণের খিলি সূর্য্যমণির হাতে দিল। সূর্য্যমণি পাণটি হাতে লইয়াই, তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ দন্তগুলি বাহির করিয়া, তাহা মুখে নিক্ষেপ করিলেন। সূর্য্যমণির কিন্তু পাণের তৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর হইবার কোন কারণ ছিল না। ইহার পূর্ব্বক্ষণেই তাঁহার মুখ তাম্বুলচর্ব্বণজনিত আনন্দ উপভোগ করিতেছিল। পাণটী চিবাইয়াই সূর্য্যমণি দাসীকে বলিলেন—

"ওলো, আর একটু "গুণ্ডী" (১) দে, তুই বড় কম "গুণ্ডী" দিস্।"

দাসী গুণ্ডীর পাত্র লইয়া সূর্য্যমণির সম্মুখে ধরিলে তিনি স্বহস্তে কিছু তুলিয়া লইয়া মুখে দিলেন।

"ওলো—আস্তে! অত জোরে টিপিস্ কেন ?" যে দাসীটী তাঁহার গায়ে তেল-হলুদ মাখাইতেছিল, তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন।

(১) সুপারি, চূণ, ধনিয়া, তামাকের পাতা, চুয়া দ্বারা প্রস্তুত পাণের মসলা; উড়িষ্যায় ইহার খুব প্রচলন।

এই সময়ে সারি দাসীর সঙ্গে শোভাবতী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া সূর্য্যমণি বলিলেন "বলি, এ সব কি শুনি?"

শোভা। কি মা?

সূর্য্য। তোমার এক কুড়ি বছর বয়স হ'লো, "বাহা" হ'লে এত দিন ২।৩টা "পেলা" হ'তো—তোমার এখনও কিছু বুদ্ধিশুদ্ধি হ'লো না?

শোভা। মা!—আমি কি করিয়াছি, তাই আগে বল না?

সূর্য্য। তুমি "ভুয়াসানী" (১) হইয়া কিনা পুরুষের দরবারে যাও? আমি শুনিলাম, কা'ল সেই যে "মাইকিনা" টা (২) তা'র একটা ঝি নিয়া আসিয়াছিল, তাদের কি কথা বলিতে তুমি মর্দ্দরাজ সান্তের দরবারে গিয়াছিলে? ছি ছি! শুনিয়া আমি লজ্জায় মরিয়া গেলাম! আমি শুনিয়াছি সেই "মাইকিনা" ও তা'র ঝিটা বড়ই নচ্ছার। তাদের কথায় তোমার কাজ কি? মর্দ্দরাজ সান্ত তোমারে কিছুই বলেন না—তুমি সোহাগ পাইয়া বড় বাড়িয়া গিয়াছ। তুমি যদি আমার পেটে হইতে তবে দেখাতাম মজাটা—ওলো সারি! শীঘ্র আয়, আমি আর চেঁচাইতে পারি না। আমার গলা শুকাইয়া গেল, একটা পাণ দিয়া যা।

শোভাবতী এই সকল তর্জ্জন গর্জ্জন শুনিয়া চুপ করিয়া থাকিল, পরে বলিল—

"নীলার মা আসিয়া অনেক কাঁদাকাটা করিল, তাই বাবাকে বলিতে গিয়াছিলাম। তুমি যদি তা'তে দোষ মনে কর, তবে আর এরূপ করিব না।"

এই সময়ে পাল্‌কীবাহক বেহারাদের "হাইরে—ভাইরে" চীৎকার শোনা গেল। সকলে উৎকর্ণ হইয়া সেই শব্দ শুনিতে লাগিল। সেই পাল্‌কী মর্দ্দরাজের বাড়ীতে আসিল। একজন চাকর ঊর্দ্ধশ্বাসে অন্তঃপুরে দৌড়াইয়া আসিয়া খবর দিল "সর্ব্বনাশ হইয়াছে—সর্ব্বনাশ হইয়াছে—

(১) যুবতী। (২) মাগী।

একবার বাহিরে আসিয়া দেখুন!" তখন স্বর্ণমণি, শোভাবতী ও দাসী-গণ সকলে দৌড়াইয়া "দাওঘরে" গেল। সেই পাল্‌কী দাওঘরে রাখা হইয়াছিল। পাল্‌কীর দরজা খুলিয়া সকলে দেখিল—মর্দ্দরাজ তাহার মধ্যে শুইয়া গোঁ গোঁ করিতেছেন। সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত, কাপড় চোপড় রক্তে ভিজিয়া গিয়াছে। তাঁহার এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া সকলে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল।

ভীমজয়সিং সর্দ্দার সঙ্গে আসিয়াছিল, সে বলিল মর্দ্দরাজ সাস্ত একটা ভালুকের উপরে গুলি করিয়াছিলেন। ভালুকটা গুলি খাইয়া পালটীয়া আসিয়া তাঁহাকে ধরিল। "ভালুক মূর্খ জন্তু"—যাহাকে ধরে, তাহাকে শীঘ্র ছাড়ে না। সে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া মর্দ্দরাজ সান্তের শরীর জখম করিয়াছে। তাঁহার বাম হাতটা মুখের মধ্যে দিয়া চিবাইয়া হাড় ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। জয়সিং পশ্চাৎ হইতে আসিয়া লাঠি দিয়া প্রহার করাতে ভালুক পলাইয়া গেল। জয়সিং না আসিলে, মর্দ্দরাজ সান্তকে সেখানেই মারিয়া ফেলিত।

তখন সকলে মর্দ্দরাজকে ধরিয়া পাল্‌কীর মধ্য হইতে বাহির করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেল। একটু সংজ্ঞা হইলে, তিনি বলিলেন—"মা শোভাবতী! উঃ—আমি মরিলাম—একবার মোহান্ত বাবাজীকে খবর দাও!" গোপালপুরের মঠের মোহান্ত নরোত্তম দাস বাবাজীর নিকট তৎক্ষণাৎ লোক পাঠান হইল।

চতুর্থ অধ্যায়।

উড়িষ্যার মঠ।

উড়িষ্যায়, বিশেষতঃ পুরী জেলায়, অনেকগুলি মঠ আছে। এত অধিক মঠ বোধ হয় ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশে নাই। এই সকল মঠ উড়িষ্যাবাসিগণের ধর্ম্মপরায়ণতা ও দয়াদাক্ষিণ্যের পরিচয় দেয়। এই মঠগুলি নিয়মিতরূপে ঠাকুরসেবা, অতিথিসৎকার ও অভ্যাগত সাধু-সন্ন্যাসিগণকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কোন এক জন বিশিষ্ট সাধু বা বৈষ্ণব ইহার এক একটী মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। প্রত্যেক মঠের প্রতিষ্ঠাতা, নিজের অসাধারণ ধর্ম্মপরায়ণতার জন্য, দেশের সর্ব্বসাধারণের ভক্তিশ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া, তাহাদের নিকট হইতে মঠের জন্য ভুমিসম্পত্তি ও অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। উড়িষ্যার অধিকাংশ ধনসম্পত্তিশালী হিন্দু গৃহস্থ এই সকল মঠের জন্য জমি "খঞ্জা" করিয়া দিয়াছেন। উড়িষ্যাদেশে সাধারণতঃ গৃহস্থবাড়ীতে অতিথিসৎকারের প্রথা নাই ; ঘনিষ্ঠ আত্মীয় কুটুম্ব ভিন্ন কেহ কাহারও গৃহে স্থান পায় না। কোন গৃহস্থের বাড়ীতে অতিথি উপস্থিত হইলে, তাহাকে নিকটবর্ত্তী কোন একটা মঠের পথ দেখাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু উড়িষ্যাবাসীদিগের অতিথিসৎকারের এই ত্রুটীর জন্য তাহাদের বড় দোষ

দেওয়া যায় না। কারণ অনেক গৃহস্থ মঠে জমি দান করিয়া সেই সঙ্গে অতিথি-সৎকারের কর্ত্তব্যটাও মঠের প্রতি অর্পণ করিয়াছে।

এই সকল মঠে কোন একটী বিষ্ণু-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। পুরীসহরে যতগুলি মঠ আছে, তাহার অধিকাংশ মঠে জগন্নাথ মহাপ্রভুর মূর্ত্তি বিরাজমান। দাতারা জগন্নাথ মহাপ্রভুর সেবাপূজার জন্যই পুরীর মঠ সকলে সম্পত্তি দান করিয়া থাকেন। জগন্নাথদেবের সেবাপূজার জন্য প্রদত্ত দেবোত্তর ভূমিকে "অমৃতমনহি" বলে। সেই দেবোত্তর সম্পত্তির আয় হইতে প্রত্যহ জগন্নাথ মহাপ্রভুর মন্দিরে ভোগ দেওয়ার কথা; ভোগ যে একেবারে না দেওয়া হয়, তাহা নয়। জগন্নাথ মহাপ্রভুর মন্দিরে অন্নভোগ নিবেদন করিয়া আনিয়া, তাহা মঠের মোহান্ত ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ ভোজন করেন; উপস্থিত মত অতিথি-অভ্যাগত-দিগকেও দান করা হয়। পুরীর মঠসকলে রন্ধনের কারবার প্রায়ই নাই। পল্লীগ্রামের মঠে অন্যান্য বিষ্ণুমূর্ত্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতি মঠে এক জন মোহান্ত বা অধিকারী আছেন। কোন কোন বড় মঠে মোহান্ত ও অধিকারী উভয়ই আছেন। বলা বাহুল্য, মোহান্তই মঠের অধিপতি। তাঁহার সাহচর্য্যের জন্য পূজারি, টহলিয়া ও অন্যান্য পরিচারক থাকে।

পুরীর কতকগুলি বড় মঠে "রামাইত" মোহান্ত আছেন। ইহারা পশ্চিমদেশবাসী, শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক। এতদ্ভিন্ন অধিকাংশ মোহান্তই শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্ত, শ্রীচৈতন্যকে অবতার বলিয়া পূজা করেন; উড়িষ্যার অধিকাংশ হিন্দু পরিবারে শ্রীগৌরাঙ্গ ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পূজিত। অনেক মঠে গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর মূর্ত্তির পূজা হয়। তবে সেটা অধিকন্তুভাবে; বিষ্ণুর কোন না কোন মূর্ত্তিই সকল মঠে প্রধানতঃ ও প্রথমতঃ পূজনীয়।

মঠের মোহান্তগণ চিরকুমার। কিন্তু চিরকুমার ব্রত গ্রহণ করিলে

কি হয়, সেই ব্রত রক্ষা করিতে কয় জনে পারে? এই জন্য অনেক সময়ে অনেক মোহান্ত মহাপ্রভুর নামে অনেক কলঙ্ককথা শুনা যায়। অনেক মোহান্ত, এমন কি প্রকাশ্যভাবে, ব্যভিচারে লিপ্ত! তাঁহাদের বিলাসিতাও কম নহে। তাঁহাদের চালচলন রাজারাজড়ার মত। এক জন মোহান্ত বাবাজীকে সাহেব সাজিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছি! বৈরাগ্য ব্রত ভুলিয়া গিয়া, এখন তাঁহারা ঘোর সংসারী অপেক্ষাও অধম ভাবে জীবন যাপন করিতেছেন। অনেক মঠে এখন অতিথি-অভ্যাগতের স্থান হয় না, দরিদ্র-দুঃখী কোনও সাহায্য পায় না, সাধু-সন্ন্যাসীর আদর নাই, কিন্তু মোহান্ত মহারাজগণ বিলাসব্যসনে অজস্র অর্থ ব্যয় করেন। কেহ কেহ মামলা-মোকদ্দমায় জলের মত অর্থ ঢালিয়া দেন। বেশী দিনের কথা নয়, পুরীর কোন বড় মঠের একজন মোহান্ত, বিলাত পর্য্যন্ত একটী মোকদ্দমা চালাইয়া, প্রায় এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন!

সাধারণের সম্পত্তির এইরূপ অপব্যবহারের প্রতি অনেক দিন হইতে গবর্ণমেণ্টের ও স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। গত ১৮৬৮ সনে উড়িষ্যার মঠসকলে দেবোত্তর সম্পত্তির কি প্রকার অপব্যবহার ঘটে ও তাহা নিবারণের উপায় কি, তাহা নির্দ্দেশ করিবার জন্য, গবর্ণমেণ্ট হইতে একটী কমিটী গঠিত হয়। সেই কমিটির সদস্যগণ স্থির করেন, উড়িষ্যার মঠসকলের দেবোত্তর সম্পত্তির (১) বার্ষিক আয় প্রায় সাত লক্ষ টাকা। এতগুলি টাকা মোহান্তগণ নানা প্রকার বিলাস-ব্যসনে ব্যয় করিয়া আসিতেছেন; দাতারা যে মহৎ উদ্দেশ্যে ইহা দান করিয়া গিয়াছেন, সে উদ্দেশ্যে প্রায়ই ইহা ব্যয়িত হয় না। (২), সেই

(১) "Fifty thousand Pounds, the annual rental of the religious lands in Orissa—represent an income of a quarter of a million Sterling a year in England"—Hunter's Orissa Vol. I p. 121.

(২) "The high style in which they live, their expensive equip-pages, and large and costly retinue, not to say any thing of the

জন্য তাঁহারা এই দেবোত্তর সম্পত্তির যথোচিত সংরক্ষণ ও যথোদ্দেশ্যে ব্যয় করা সম্বন্ধে কতকগুলি পরামর্শ প্রদান করেন। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য-ক্রমে এ পর্য্যন্ত তাহার কোনটাই কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

কিন্তু সকল মোহান্ত সমান নহে। ঐরূপ ঘোর বিলাসিতা ও জঘন্য ব্যভিচারের মধ্যেও উক্ত কমিটির সদস্যগণ দুই একটী যথার্থ ধর্ম্মপরায়ণ সাধু মহাত্মার দর্শন পাইয়াছিলেন। (১) কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প বলিয়া, তাঁহাদিকে সাধারণ মোহান্তশ্রেণী হইতে খারিজ দেওয়া যাইতে পারে। আমরা সেইরূপ এক মহাত্মাকে পাঠকবর্গের সমীপে উপস্থিত করিব।

পুরীনগরীর ৫ মাইল উত্তরে কুশভদ্রা (পুষ্পভদ্রা) নদীর কূলে গোপালপুর গ্রাম অবস্থিত। গ্রামটির পশ্চিমভাগে, লোকালয় হইতে কিছু দূরে, একটী বিস্তৃত আম্রকানন। সেই আম্রকাননের উত্তরভাগে একটী রমণীয় উদ্যান আছে। উদ্যানটির মধ্যস্থলে শ্রীশ্রীগোপালজীউর মঠ প্রতিষ্ঠিত : এই ঠাকুরের নাম হইতে গ্রামের নাম গোপালপুর হইয়াছে।

গোপালপুরের মঠ বহু প্রাচীন। প্রায় ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে একজন সিদ্ধপুরুষ পুরুষোত্তমে শ্রীশ্রী৺জগন্নাথদেব দর্শন করিতে আসিয়া এখানে

pleasures and luxuries in which they indulge, to the neglect of their proper duties, tend, as we think, to show that they are not as they ought to be. Besides these, there are the facts of direct and indirect alienations of trust property and the large expenses of unnecessary lawsuits—IBID p. 120.

(১) "The abbot led a life of celibacy, bore the highest character for piety, and was wholly devoted to the service of God and man. He lived in the simplest style, denying himself even the common comforts of life. This is not the picture of an imaginary abbot. There exist, even in this day, instances of such management. though from their rarity can only be taken as exceptions"—IBID P. 120.

এই মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। এই মঠের মোহান্ত গোকুলানন্দ বাবাজী শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন এবং তিনি একজন মহাপুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, শ্রীগৌরাঙ্গ এক দিন তাঁহার পারিষদ্‌বর্গ সহ এই মঠে ভিক্ষা করিতে আসিয়া গোকুলানন্দ বাবাজীর সহিত প্রেমানন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন। এই মঠের বর্ত্তমান মোহান্ত নরোত্তম দাস বাবাজীও এক জন প্রকৃত সাধু পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ; এই মঠের প্রতিষ্ঠাতা সেই সিদ্ধপুরুষ ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া, এ পর্য্যন্ত সকল মোহান্তই ব্রাহ্মণ চেলা রাখিয়া গিয়াছেন। নরোত্তম দাস বাবাজীর গুরু বৈষ্ণবচরণ দাস বাবাজী এক জন দেশ-বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। নরোত্তম দাস বাবাজী তাঁহার নিকট অনেক দিন পর্য্যন্ত নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পরিশেষে বেদান্ত অধ্যয়ন করিবার জন্য কাশীধামে ও ভাগবত অধ্যয়ন করিবার জন্য শ্রীবৃন্দাবনে, বার বৎসর অবস্থিতি করিয়া, এই সকল শাস্ত্রে বিশেষরূপে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। এই সকল তীর্থস্থানে অনেক সাধু মহাত্মার সঙ্গলাভ করিয়া নিজের চরিত্রও যথোচিতরূপে সংগঠিত করিয়াছেন। তাঁহার ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী চেলা মাধবানন্দ দাসও এখন বৃন্দাবনে অবস্থিতি করিয়া শিক্ষালাভ করিতেছেন।

এই মঠের সম্পত্তি বড় বেশী কিছু নাই। ভূমি সম্পত্তির মধ্যে দুই "বাটী" (৪০ মান বা একর) জমি দেবোত্তর নিষ্কর আছে। তাহাতে বৎসর বৎসর যে ধান্য পাওয়া যায়, তদ্দ্বারা ঠাকুর-সেবা ও সাধু-সন্ন্যাসী অতিথি-অভ্যাগতের সেবা-নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। যে বৎসর শস্য কম জন্মে, সে বৎসর কিছু অনাটন হয়, আবার যে বৎসর ভাল রকম জন্মে, সে বৎসর কিছু কিছু ধান্য মজুতও থাকে। মোহান্ত বাবাজী মঠের সম্পত্তিকে ঠাকুরের সম্পত্তি, ও নিজকে কেবল তাঁহার তত্ত্বাবধায়ক জ্ঞান করিয়া কার্য্য করেন। সুতরাং তাঁহার কোন অপব্যয় নাই। বরং

তাহার উত্তম তত্ত্বাবধানে মঠের এই সামান্য সম্পত্তিদ্বারা ঠাকুরের দৈনিক সেবা ও দোলযাত্রাদি পার্ব্বণ সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইয়া, কিছু কিছু অর্থ সঞ্চিত থাকে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মোহান্তগণের আমল হইতে এই মঠে অনেক ধান্য মজুত হইয়া আসিতেছিল। "নয়—অঙ্ক" দুর্ভিক্ষের (১) বৎসর বর্ত্তমান মোহান্ত বাবাজী দেখিলেন, প্রায় দুই হাজার টাকা মূল্যের ধান মজুত আছে। তখন শত শত লোক অনাহারে মরিতেছিল। বাবাজী মনে করিলেন, "গোপালজীর ভাণ্ডারে এতগুলি ধান মজুত থাকিতে যদি এখানকার লোক না খাইয়া মরিল, তবে এ ধান থাকিয়া ফল কি? আমার গোপাল যখন সর্ব্ব জীবের অন্তরাত্মা রূপে বিরাজমান, তখন এই ধানগুলি দ্বারা যদি অন্ততঃ কয়েকটী লোকেরও প্রাণরক্ষা করিতে পারি, তবে তাহাতেই গোপালের সেবা হইবে।" এইরূপ চিন্তা করিয়া, তিনি সেই ধান্যগুলি অকাতরে দান করিয়াছিলেন। তদবধি মঠের কিছু দিন হীনাবস্থা ঘটিয়াছিল, পরে বাবাজীর তত্ত্বাবধানের গুণে ও কোন রকম অপব্যয় না থাকাতে, এই ২৫।৩০ বৎসরের মধ্যে, আবার প্রায় দুই হাজার টাকার ধান্য সঞ্চিত হইয়াছে।

এই ধান্যগুলি কি বাবাজীর "পালগাদায়" আবদ্ধ থাকিয়া পচিতেছে! তাহা নয়। বাবাজী এই মজুত ধান্য দিয়া—অনেক কৃষকের উপকার সাধন করেন। নিকটবর্ত্তী গ্রামসকলের কৃষকগণ অভাবে পড়িলে বাবাজী তাহাদিগকে ধান্য কর্জ্জ দিয়া থাকেন। অন্যান্য মহাজন অপেক্ষা তিনি অনেক কম সুদ লইয়া থাকেন, সেজন্য অনেক লোক তাঁহার নিকট হইতে ধান্য ও টাকা কর্জ্জ লয়। তাঁহার নিকটে কর্জ্জ পাইলে, আর কোন মহাজনের নিকট বড় কেহ যায় না। ইহার মধ্যে অনেক ধান্য ও টাকা একেবারে আদায় হয় না, সেই জন্য সময় সময় মঠের ক্ষতি হয় বিবেচনা করিয়া, সেই ক্ষতিপূরণের জন্য, মোহান্ত বাবাজী

(১) Great famine of Orissa 1866.

অল্প সুদ গ্রহণ করিয়া থাকেন। কোন দরিদ্র কৃষক আসিয়া তাহার দুঃখের কাহিনী জানাইলে, বাবাজী একেবারে গলিয়া যান, সে ব্যক্তি যাহা কর্জ্জ নিবে তাহা ভবিষ্যতে পরিশোধ করিতে পারিবে কি না, ইহা বিবেচনা না করিয়াই, তাহাকে ধান্য কিম্বা টাকা কর্জ্জ দিয়া ফেলেন। এ কারণেও অনেক সময়ে তাঁহাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়।

যাহারা কর্জ্জ লয়, তাহাদের নিকট হইতে ধান্য কি টাকার জন্য কোন তমসুক লওয়া হয় না। তাহারা কেবল গোপালজীর মন্দিরের সম্মুখে বসিয়া তাঁহাকে সাক্ষী রাখিয়া কর্জ্জ নিয়া যায়। একবার এক ব্যক্তি এইরূপে ধান্য কর্জ্জ করিয়া নিয়া পরিশেষে অস্বীকার করিয়াছিল; তাহার পরেই সে কলেরা রোগে মারা যায়। তদবধি গোপালজীকে সকলে ভয় করে, এখান হইতে ধান কিম্বা টাকা কর্জ্জ নিয়া কেহ অস্বীকার করিতে সাহসী হয় না। যে যখন যাহা কর্জ্জ লয়, তাহা সুবিধা হইলেই শোধ করে। সুদ অত্যন্ত কম, অন্য কোনও মহাজনের নিকট এত কম সুদে কেহ টাকা কি ধান কর্জ্জ পায় না; এখানে একবার জুয়াচুরি করিলে, আর কখনও কর্জ্জ পাইবে না; এ কারণেও কেহ এখানে প্রতারণার কাজ করে না। এই সকল কারণে কর্জ্জা আদায়ের জন্য বাবাজীকে কখনও মামলা মোকদ্দমা করিতে হয় না। এইরূপে মঠের এই ক্ষুদ্র ভাণ্ডারটীকে বাবাজী একটী "কৃষিভাণ্ডারে" পরিণত করিয়াছেন।

সাধু-সন্ন্যাসী ও অতিথি অভ্যাগতের এ মঠে অবারিত দ্বার। অনেক পুরীর ফেরতা সাধু সন্ন্যাসী এখানে আসিয়া অতিথি হইয়া থাকেন। মঠের সম্মুখে যে প্রকাণ্ড আম্রকানন আছে, তাহার মধ্যে আসিয়া তাঁহারা তাঁহাদের ডেরা করেন। কিন্তু অনেক সময়ে পশ্চিমদেশীয় "সাধুসন্ত" দিগের অত্যাচারে মোহান্ত বাবাজীকে বড় ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। তাঁহারা মনে করেন, এই সকল মঠ কেবল তাঁহাদের জন্যই

হইয়াছে, এগুলি যেন তাঁহাদের লুটের মহাল। এখানে আসিয়াই ময়দা, আটা, ঘি, প্রভৃতির ফরমাস করিয়া বসেন। যথাসময়ে না পাইলে বড়ই মুস্কিল উপস্থিত হয়। কেহ কেহ বা জুলুম করিয়া বাবাজীর নিকট হইতে পথখরচের টাকা পর্য্যন্ত আদায় করিতে চেষ্টা করেন। বাবাজী কিন্তু এ সকল অত্যাচার "তৃণ অপেক্ষাও সুনীচ এবং তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণুভাবে" অম্লানচিত্তে সহ্য করেন।

এই মঠটী শান্তিপূর্ণ নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত। ইহার দক্ষিণ দিকের সেই বিস্তৃত আম্রকাননটী বড়ই রমণীয়, সর্ব্বদা বিহঙ্গকুলের কলরবে মুখরিত। এই কাননের উত্তরে মঠের উদ্যান। উদ্যানের দক্ষিণ প্রান্তে একশ্রেণী বক, বকুল, চম্পক, নাগেশ্বর (নাগকেশর), করবী, অশোক, শেফালিকা, পলাশ প্রভৃতি বড় বড় ফুলগাছ, অতি উত্তম শৃঙ্খলার সহিত রোপিত। পলাশগাছটী মালতীলতায় আচ্ছাদিত। এই বৃক্ষশ্রেণী পূর্ব্বপশ্চিমে বিস্তৃত, তাহার মধ্যস্থলে মঠের মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য একটী সদর দরজা আছে। এই দরজা হইতে মঠের ঘর পর্য্যন্ত উত্তর দিকে যাইবার জন্য একটী রাস্তা গিয়াছে। রাস্তার দুই ধারে চারিটী ফুলের কেয়ারি। তাহাতে রজনীগন্ধা, গন্ধরাজ, চামেলী, যুঁই, নবমল্লিকা (বেল), অপরাজিতা, জবা প্রভৃতি ফুলগাছসকল চতুষ্কোণাকারে রোপিত হইয়াছে। মঠগৃহটী একটী বড় "খঞ্জা"—তাহার সিঁড়ি ও সম্মুখেও "পিণ্ডা"টী প্রস্তর দিয়া বাঁধান। সেই খঞ্জার মধ্যে ঠিক সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দির। মন্দিরের সম্মুখে, প্রাঙ্গণের মধ্যে একটী প্রস্তরনির্ম্মিত তুলসীমঞ্চ। মন্দিরের মধ্যে বেদীর উপরে শ্রীশ্রীগোপালজীর কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত উজ্জ্বল, সুঠাম মূর্ত্তি, নানাবিধ রজত সুবর্ণালঙ্কারে ভূষিত হইয়া বিরাজ করিতেছে। তাঁহার সম্মুখে শালগ্রাম শিলা ও বামভাগে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর পিত্তলনির্ম্মিত মূর্ত্তি বিরাজমান।

প্রাঙ্গণের পশ্চিম দিকে দুইটী ঘর; তাহার উত্তরের ঘরে এই মঠের

প্রতিষ্ঠাতা সেই মহাপুরুষের সমাধি রহিয়াছে। দক্ষিণের ঘরটীতে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর মৃণ্ময় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। প্রাঙ্গণের পূর্ব্ব-দিকে তিনটী ঘর আছে। তাহার উত্তরেরটী রন্ধনশালা, মধ্যেরটী মোহান্ত বাবাজীর শয়নঘর, দক্ষিণেরটীতে মোহান্ত বাবাজী পূজাপাঠাদি করেন। একখানা বাঁশের তাকের উপরে অনেকগুলি গ্রন্থ সুসজ্জিত রহিয়াছে। খঞ্জার মধ্যে প্রবেশের পথে যে দাণ্ড ঘরটী আছে, সেখানে মঠের ভৃত্য ও অতিথি অভ্যাগতগণ শয়ন করে। খঞ্জার পশ্চিমে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী। বাবাজী তাহার নাম দিয়াছেন "রাধাকুণ্ড"। পূর্ব্বদিকে গোশালা ও একটী ধানের "পালগাদা"। খঞ্জার উত্তরে একটী বাগান। তাহাতে অনেকগুলি আম, কাঁটাল, নারিকেল, "পুনাঙ্গ", প্রভৃতি ফলের গাছ ও কয়েকটী বাঁশের ঝাড় আছে।

বলা বাহুল্য, মোহান্ত বাবাজী চিরকুমারব্রতধারী। মঠে তিনি ছাড়া একজন "পূজারি", একজন "টহলিয়া", ও একজন চাকর আছে। পূজা-রির কাজ ঠাকুরের বেশভূষা করা, পূজার সামগ্রী আয়োজন করা, ভোগ রন্ধন করা ও মোহান্ত বাবাজীর অনুপস্থিতি সময়ে ঠাকুর পূজা করা। সাধারণতঃ বাবাজী নিজেই ঠাকুর পূজা করেন। টহলিয়া সাধারণতঃ ভৃত্যের কাজ করে, পূজার সময়ে শঙ্খ ঘণ্টা বাজায়, সঙ্কীর্ত্তনের সময়ে খোল কিম্বা করতাল বাজায়। আর আবশ্যক মতে তলব তাগাদায়ও বাহির হয়। এতদ্ভিন্ন আর একজন চাকর আছে, সে ১০।১২টা গরু রাখে ও জমিচাষসম্বন্ধীয় অনেক কাজ করে।

প্রত্যহ প্রভাতে গোপালজীকে একবার "ক্ষীর নবনী", "খই উখুড়া" (মুড়কী), কলা প্রভৃতি দ্বারা বালভোগ দেওয়া হয়। পরে দুই প্রহ-রের পূজা অতীত হইলে অন্নভোগ হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, কোন মঠেই নিরামিষ ভিন্ন আমিষের কারবার নাই। সন্ধ্যা আরতির পর আর একবার রুটী ও মাখন দিয়া "বৈকালী" ভোগ দেওয়া হয়। এইরূপ

নিত্যসেবা ভিন্ন দোলযাত্রা, রথযাত্রা, ঝুলনযাত্রা প্রভৃতি পর্ব্ব উপলক্ষে বিশেষ রকম ভোগরাগের বন্দোবস্ত আছে। এই সকল নিবেদিত দ্রব্য আগে উপস্থিত অতিথিদিগকে দান করিয়া পরে বাবাজী ও মঠের ভৃত্যগণ ভোজন করেন। যে দিন কোন অতিথি উপস্থিত থাকে না, সে দিন বাবাজী গ্রাম হইতে ২।৪ জন গরিব লোক ডাকিয়া আনিয়া তাহাদিগকে কিছু কিছু প্রসাদ দিয়া অবশিষ্ট নিজে ও অন্যান্য সকলে গ্রহণ করেন।

নরোত্তমদাস বাবাজী চিরকুমার হইলেও সংযতেন্দ্রিয়। তিনি কৈশোর কাল হইতে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। চির-অভ্যাস বশতঃ নারীমাত্রকেই তিনি আদ্যাশক্তির অবতার বলিয়া গণ্য করেন। বাবাজী অতি পবিত্রভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। প্রত্যহ রাত্রি ছয় দণ্ড থাকিতে তিনি নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করেন ও প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া ধ্যানমগ্ন হন। সূর্য্যোদয়ের কিছু পরে তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হয়। তখন তিনি বাহিরে আসিয়া মঠের যাবতীয় কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করেন। বাবাজী পশ্চিম দেশে বাস করিবার সময়ে একজন সন্ন্যাসীর নিকট অনেকগুলি কঠিন দুরারোগ্য রোগের অমোঘ ঔষধ শিখিয়াছিলেন। সে ঔষধগুলি কেবল গাছগাছড়া, তাহাতে বুজরুকি একটুও নাই। প্রত্যহ প্রভাতে অনেক রোগী তাঁহার নিকট ঔষধ পাওয়ার জন্য আসে। তিনি প্রত্যেকের অবস্থা বিশেষরূপে শুনিয়া ঔষধ ব্যবস্থা করেন। যাহারা তাঁহার নিকটে আসিতে পারে না, তিনি তাহাদের বাড়ীতে গিয়া ঔষধ দিয়া আসেন।

রোগী দেখিবার পর, বাবাজী মঠের গরুগুলির তত্ত্বাবধান করেন। যাহাতে তাহারা যথাসময়ে যথেষ্ট পরিমাণে খড়, ঘাস ও জল পায়, তাহা নিজে দেখেন। তাঁহার যত্নে মঠের গরুগুলি হৃষ্টপুষ্ট ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তাহাদের আহারের জন্য তিনি পূর্ব্ব হইতে অনেক খড় মজুত করিয়া রাখেন। গো-সেবার পর বাবাজী মঠের বাগানে বেড়াইতে

বাহির হন। বাগানের অধিকাংশ গাছগুলি তাঁহার স্বহস্তরোপিত। তিনি প্রত্যহ একবার করিয়া তাহাদিগকে দেখিয়া বেড়ান। যদি কোন গাছটী বন্যলতার দ্বারা আক্রান্ত হয়, তবে তিনি লতা কাটিয়া দিয়া গাছটীকে রক্ষা করেন। কোন চারাগাছ জল অভাবে শুকাইয়া যাইতেছে দেখিলে, তাহার জলসেচনের ব্যবস্থা করেন। কোনও একটী গাছে প্রথম ফুল কিম্বা ফল ধরিলে, বাবাজীর আর আনন্দের সীমা থাকে না। তিনি তাহা স্বহস্তে তুলিয়া আনিয়া গোপালজীকে উপহার দেন।

বাবাজী বেড়াইয়া আসিয়া স্নান করেন। ইতিমধ্যে যদি কোনও ব্যক্তি অভাবে পড়িয়া আসিয়া কোনও কথা জানায়, তখন তিনি তাহার বিষয় "বুঝাপনা" করেন। স্নানের পর ঠাকুরপূজা আরম্ভ করেন, তাহাতে প্রায় দুই ঘণ্টা অতীত হয়। ইতিমধ্যে ভোগরন্ধন শেষ হয়; পূজাশেষে ভোগনিবেদন করিয়া দেন ও অতিথিসেবা হইলে নিজে আহার করেন। আহারের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করেন; তৎপরে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত শাস্ত্র পাঠ করেন। ঠাকুরের সন্ধ্যা আরতির পর, বাবাজী সঙ্কীর্ত্তনে নিযুক্ত হন। সঙ্কীর্ত্তনের পর অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত মালাজপ করিয়া, ভোগনিবেদনের পর আহারাদি করিয়া শয়ন করেন।

মোহান্ত বাবাজীর বয়স প্রায় ৬০ বৎসর। তাঁহার শরীর দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ, গৌরবর্ণ। তাঁহার মুখশ্রী সুন্দর শান্তিপূর্ণ। চক্ষু দুইটী কেমন স্থিরদৃষ্টিসম্পন্ন। তাঁহার শুভ্র শ্মশ্রুরাজি বক্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত; মস্তকের লম্বা কেশরাশিও পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে। তাঁহার পরিধানে কৌপীন ও বহির্ব্বাস। গলায় একছড়া মোটা তুলসীর মালা। বাবাজীর বল অসাধারণ। তিনি যৌবনকালে রীতিমত মল্লদিগের সহিত কুস্তি করিতেন; এখনও মুগুর দিয়া ব্যায়াম করেন। তাঁহার দুইটী শিসু কাষ্ঠের মুগুর আছে, তাহার এক একটী ওজনে অর্দ্ধ মণ হইবে। এখনও তিনি পদব্রজে একদিনে ২৫।৩০ মাইল পথ চলিতে পারেন।

সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। আজ শুক্ল প্রতিপদ তিথি! চন্দ্রের কোন খোঁজখবর নাই। আকাশে এক একটী করিয়া নক্ষত্র ফুটিতেছে। সমুদ্রের হাওয়া প্রবলবেগে বহিতেছে, কিন্তু সমুদ্রের গভীর গর্জ্জন এখন শুনা যায় না। পুরীর মন্দিরে মন্দিরে সন্ধ্যা-আরতির বাদ্যধ্বনিতে তাহা নিমগ্ন হইয়াছে! প্রবল বাতাসে মঠের চারি দিকের বড় বড় গাছ থাকিয়া থাকিয়া আন্দোলিত হইতেছে; যেন প্রবলবেগে ঝড় বহিতেছে, আর গাছসকল কোমর বাঁধিয়া তাহার সঙ্গে লড়াই করিতেছে। মঠের ঠাকুরের সন্ধ্যা-আরতি শেষ হইয়া গিয়াছে। মোহান্ত বাবাজী পূজারি ও টহলিয়ার সঙ্গে মন্দিরের প্রাঙ্গণে সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া, এখন সেই তুলসীবেদীর পশ্চাৎ ঠাকুরের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া, ভাবে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ের ভাবসিন্ধু উথলিয়া উঠিতেছে, তাই দুই চক্ষু দিয়া অবিশ্রান্ত প্রেমাশ্রু বহিতেছে। পূজারি খোল বাজাইতে বাজাইতে ও টহলিয়া করতাল বাজাইতে বাজাইতে এখনও সঙ্কীর্ত্তনের আবেশে

"দীনদয়াল গৌরহরি,
মোরে দয়া কর হে।"

বলিয়া গান করিতে করিতে নাচিতেছে। আর তাহাদের নৃত্যের তালে তালে বাবাজীর শরীরও নাচিতেছে। এই সময়ে মঠের বাহিরে একটী লোক আসিয়া চীৎকার করিয়া পূজারিকে ডাকিল।

তখন রামদাস টহলিয়া "কে সে?" বলিয়া দরজার কাছে গেল।

আগন্তুক লোকটী বলিল—"আমি সপণী জেনা। আমি গড়কোদণ্ড-পুর হইতে আসিয়াছি।"

টহলিয়া। কেন? কি দরকার?

সপণী। খুব জরুর কাম আছে—একবার মোহান্ত বাবাজীকে ডাকিয়া দাও। মর্দ্দরাজ সাস্তের বড় বিপদ উপস্থিত।

ইহা শুনিয়া টহলিয়া গিয়া পূজারিকে ডাকিল। পূজারি খোল বাজান বন্ধ করিয়া সপণী জেনার কাছে আসিল। এ দিকে কিছুক্ষণ খোলকরতালের শব্দ বন্ধ হওয়াতে মোহান্ত বাবাজীর চৈতন্য হইল। তিনি পূজারিকে ডাকিলেন, পূজারি গড়কোদণ্ডপুর হইতে আগত সপণী জেনার কথা তাঁহাকে বলিল। তখন বাবাজী ঠাকুরের উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাণ্ড ঘরে আসিলেন। সপণী জেনা তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া মর্দ্দরাজ সান্তের বিপদের কথা সবিশেষ বলিল। মোহান্ত বাবাজী মর্দ্দরাজ সান্তের গুরু না হইলেও মর্দ্দরাজ তাঁহাকে গুরুর ন্যায় ভক্তিশ্রদ্ধা করেন। গড়কোদণ্ডপুরে বাবাজীর কয়েক ঘর শিষ্য আছে, সেখানে যাতায়াতে বীরভদ্রের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ পরিচয় হইয়াছিল। এখন সপণী জেনার নিকট বীরভদ্রের বিপদের কথা শুনিয়া বাবাজীর দয়ার্দ্র হৃদয় গলিয়া গেল। তিনি সপণী জেনাকে একখান পত্র দিয়া পুরীর এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনের নিকট পাঠাইয়া নিজে পদব্রজে গড়কোদণ্ডপুর যাত্রা করিলেন।
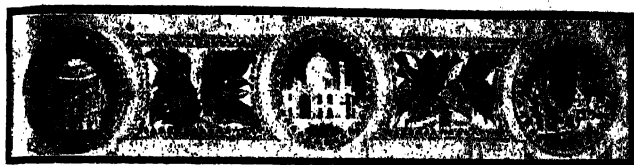
পঞ্চম অধ্যায়।

বীরভদ্রের উইল।

আজ চারি দিন হইল, বীরভদ্র আহত হইযাছেন। এই চারি দিন তিনি শয্যাগত আছেন; উত্থানশক্তি রহিত। আহত হওয়ার পরদিন পুরী হইতে বাবু গিরিশচন্দ্র দত্ত এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন আসিয়া, তাঁহার শরীরের ক্ষত পরীক্ষা করিয়া, ঔষধ লেপন করিয়া পটি বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু রোগীর অবস্থা ভাল হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমশঃ মন্দ হইতেছে। সেই দিনই রাত্রে ভয়ানক জর হইয়াছে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে নিউমোনিয়া দেখা দিয়াছে। আজ আবার ডাক্তারবাবু আসিয়াছেন। রোগীকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঔষধ দিতেছেন। কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইতেছে না।

এখন বেলা অপরাহ্ন। সূর্য্যের তেজ মন্দ হইয়া আসিতেছে। শয়নকক্ষে বীরভদ্র ভূমিতলে বিছানার উপর শুইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন। তাঁহার পদতলে শোভাবতী বসিয়া তাঁহাকে ব্যজন করিতেছে। শোভাবতী এ কয় দিন তাঁহার কাছ-ছাড়া হয় নাই, দিন-রাত্রি কাছে বসিয়া তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিতেছে। বীরভদ্র সূর্য্যমণিকে একবারও ডাকেন নাই, তিনিও বীরভদ্রের বিরক্তির ভয়ে নিকটে আসেন নাই; তবে দূর হইতে

সংবাদ লইতেছেন। শোভাবতী এ কয় দিন এক রকম আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়াছে। তাহার মুখ নিতান্ত মলিন, চিন্তার কালিমামাখা। কখন কখন চক্ষু দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতেছে, কিন্তু পাছে বীরভদ্র তাহা দেখিতে পান, সেই ভয়ে লুকাইয়া আঁচল দিয়া মুছিতেছে। তাহার আলুলায়িত কেশপাশ পৃষ্ঠদেশ ঢাকিয়া সেই অশ্রুপূর্ণ চক্ষু ও কালিমা-মাখা মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে।

বিছানার অদূরে নরোত্তমদাস বাবাজী একখানা গালিচা আসনে বসিয়া আপন মনে মালাজপ করিতেছেন। মোহান্ত বাবাজী এ কয়-দিন বীরভদ্রের নিকটে থাকিয়া তাঁহার চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষার তত্ত্বা-বধান করিতেছেন। বাসুদেব মান্ধাতাও নিকটে বসিয়া আছেন। দুই-জন দাসী রোগীর পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার সেবা করিতেছে।

ইতিমধ্যে বাহির হইতে ডাক্তারবাবু মোহান্ত বাবাজীকে ডাকিলেন। বাবাজী উঠিয়া দাওঘরে ডাক্তারবাবুর নিকট গেলেন। ডাক্তারবাবু বলিলেন, "রোগীর অবস্থা বড়ই খারাপ। উনি যে আজ রাত্রি কাটাই-বেন, এরূপ ভরসা করি না। উঁহার বিষয়সম্পত্তি সম্বন্ধে যদি কোন বন্দোবস্ত করিবার প্রয়োজন থাকে, তবে তাহা এই বেলা করা উচিত।"

মোহান্ত বাবাজী বলিলেন,—"কিন্তু অতি সাবধানে কথা পাড়িতে হইবে। রোগী যেন তাহার এরূপ খারাপ অবস্থা কোনক্রমে বুঝিতে না পারে। আচ্ছা—আমি আপনাকে সেখানে লইয়া যাইতেছি।"

মোহান্ত বাবাজী বীরভদ্রের শয়নগৃহে গেলেন ও শোভাবতীকে বলি-লেন "মা, তুমি একটু অন্যত্র যাও, ডাক্তারবাবু আসিবেন।"

শোভাবতী উঠিয়া গেল, কিন্তু পার্শ্বের ঘরে কপাটের আঁড়ালে দাঁড়া-ইয়া রহিল।

বাবাজী তখন ডাক্তারবাবুকে সংবাদ দিলেন। তিনি আসিয়া রোগীর নাড়ী দেখিলেন ও একটু ঔষধ খাইতে দিয়া বলিলেন—

"এখন কেমন আছেন? একটুও ভাল বোধ হয় না কি?"

মর্দ্দরাজ একটু কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া আস্তে আস্তে অস্ফুট স্বরে বলিতে লাগিলেন—"উঃ—কৈ একটুও ত ভাল বোধ হয় না, ডাক্তারবাবু। বুক চাপা দিয়া ধরিয়াছে—সর্ব্ব শরীরে ভয়ানক বেদনা, জ্বর ত একটুও কমিল না? ডাক্তারবাবু, আমাকে ঔষধ খাওয়ান বৃথা! আমি এ যাত্রা বাঁচিব না, আমি মরিব—নিশ্চয়ই মরিব! কিন্তু আমার শোভাবতীর কি দশা হইবে?"

ডাক্তার। আপনি যতদূর খারাপ মনে করিতেছেন, আপনার অবস্থা এখনও ততদূর খারাপ হয় নাই। আপনি অত ভীত হইবেন না। এখনও আপনার বাঁচিবার আশা আছে। তবে আপনার কন্যার কথা কি বলিতেছিলেন?

বীরভদ্র। আমার আর কেউ নাই, ডাক্তারবাবু। আমার ঐ একটী মেয়ে—আমার বড় আশা ছিল, উহাকে একটী সৎপাত্রে দান করিয়া যাব—কিন্তু—

ডাক্তার। সেজন্য ভাবনা কি? তবে আপনি কি কোন উইল করিয়াছেন?

বীরভদ্র। না—উইল করি নাই—করিবার ইচ্ছা ছিল, এ পর্য্যন্ত করিতে পারি নাই। তবে এখন করিতে পারি—এখনই করিতেছি। ডাক্তারবাবু, আপনি যাহাই বলুন, আমি এ যাত্রা বাঁচিব না। আমি এখনই উইল করিব।

ডাক্তার। তা, উইল করিতে ইচ্ছা করিলে, অবশ্যই করিতে পারেন। উইল সব সময়েই করা যায়।

ইহা বলিয়া ডাক্তারবাবু মোহান্ত বাবাজীকে ইঙ্গিত করিলেন। বাবাজী বলিলেন—

"হাঁ, উইল সব সময়েই করা যায়। উইল করিতে হইলে অবশ্যই

করিতে পার। বাবা! তোমার মেয়ের বিবাহ দেওয়া সম্বন্ধে তোমার মত কি?"

বীরভদ্র। বাবাজী! আমি আস্তে আস্তে সব বলিতেছি। যদু-মণি পট্টনায়ককে ডাকান, কাগজ কলম লইয়া আসুক—উঃ—বড় বেদনা!

বাসুদেব মান্ধাতা তখন যদুমণিকে ডাকিয়া আনিতে গেলেন। অল্প-ক্ষণ পরে যদুমণি দোয়াত কলম ও কাগজ লইয়া আসিল। বীরভদ্র বলিতে লাগিলেন, যদুমণি লিখিতে লাগিলেন। কিন্তু এক গোল বাধিল। যদুমণি পট্টনায়ক এতাবৎ প্রায়ই লৌহলেখনী দ্বারা তালপত্রের উপর লিখিয়া আসিতেছেন, কাগজের উপর কালী কলম দিয়া লেখা তাঁহার অভ্যাস নাই। তিনি অতি কষ্টে সেই কাগজখণ্ডকে হাতের উপর তালপত্রের মত রাখিয়া ও ময়ূরপুচ্ছের কলমটীকে সেই লৌহলেখ-নীর মত আঙ্গুল দিয়া ধরিয়া আস্তে আস্তে লিখিতে লাগিলেন। ডাক্তার বাবু তাঁহার পার্শ্বে একখানা চৌকীতে বসিয়া সময় সময় গুরুমহাশয়গিরি করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। একজন দাসী আসিয়া একটা পিত্তলের পিলসুজের উপর একটী পিত্তলের প্রদীপ রাখিয়া গেল। সন্ধ্যা উপস্থিত দেখিয়া, বাবাজী সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতে উঠিয়া গেলেন। তখন বীরভদ্র বাসুদেবকেও বাহিরে যাইতে ইঙ্গিত করিলেন।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে উইল লেখা শেষ হইল। যদুমণি পট্টনায়ক তাহা পড়িয়া শুনাইলেন। উইলের মর্ম্ম এইরূপ। বীরভদ্রের এক মাত্র কন্যা শোভাবতী তাঁহার বড় স্নেহের পাত্রী; তাহাকে তিনি এ পর্য্যন্ত সৎপাত্রে অর্পণ করিতে পারেন নাই। যাহাতে শোভাবতী একটী সুপাত্রে অর্পিত হইয়া সুখে থাকিতে পারে, ইহাই তাঁহার একান্ত ইচ্ছা। বীরভদ্রের স্বোপার্জ্জিত অর্থ নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরীর মোহান্ত

চতুর্ভুজ রামানুজ দাসের মঠে গচ্ছিত আছে। তিনি এই টাকা শোভাবতীকে বিবাহের যৌতুক স্বরূপ দান করিলেন। আর তাঁহার জমিদারী, খণ্ডাইত জাইগীর প্রভৃতি ভূমি-সম্পত্তি তাঁহার স্ত্রীর রহিল। তবে তিনি একটী পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়া, এ সকল ভোগদখল করিবেন। সে পোষ্যপুত্রটী খণ্ডাইতী কার্য্য করিবে। মোহান্ত নরোত্তমদাস বাবাজী ও বাসুদেব মান্ধাতা এই উইলের অছি নিযুক্ত হইলেন।

উইলপড়া শুনিয়া বীরভদ্র, বাসুদেব মান্ধাতা ও মোহান্ত বাবাজীকে ডাকিলেন। তাঁহারা আসিলে, উইল আবার তাঁহাদের সম্মুখে পড়া হইল। তখন বাবাজী বলিলেন।

"বাবা, আমি ফকির মানুষ, আমাকে ইহার মধ্যে জড়াও কেন? আমি আমার গোপালের সেবাতেই সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকি, আমার অবসর কোথায়?"

বীরভদ্র অতি ধীরে ধীরে বলিলেন—

"বাবাজী! এই পুরী জেলায় এ রকম আর একজন লোক নাই, যাহাকে বিশ্বাস করিয়া আমি এই গুরুতর ভার দিয়া যাইতে পারি। সেই জন্যই আপনাকে ডাকাইয়া আনিয়াছি। আমি ত মরিলাম, আমি মরিলে আমার সম্পত্তিটা বার ভূতে খাইবে। কত কষ্ট করিয়া এত দিন যে টাকাগুলি করিয়াছি, তাহা দুই দিনে উড়াইয়া ফেলিবে। আর আমার শোভাবতী অকূল সাগরে ভাসিয়া যাবে। বাবাজী, আপনি দয়া না করিলে কোন ক্রমেই চলিবে না। আপনাকে আবশ্যই এ ভার গ্রহণ করিতে হইবে। আমার এই ক্ষুদ্র সংসারটীকেও আপনার গোপালজীর সংসার বলিয়া ধরিয়া লউন!—উঃ—একটু জল—"

বাবাজী, বীরভদ্রের মুখে একটু জল ঢালিয়া দিয়া, বলিলেন—

"বাবা! তাতো ঠিক কথা, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোন্ বস্তু আমার গোপাল-ছাড়া? এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই ত তাঁহার একটী বৃহৎ সংসার,

তোমার এই ক্ষুদ্র সংসারটীও সেই বৃহৎ সংসারের অন্তর্গত। সে কথা তুমি ঠিকই বলিয়াছ। কিন্তু আমার ভয় হইতেছে, ঈশ্বর না করুন, এই বুড়া বয়সে যদি তোমার এই সংসারের ভার আমাকে গ্রহণ করিতে হয়, তবে শেষে আমাকে আবার সংসার-ধর্ম্মে লিপ্ত হইতে না হয়।”

বীরভদ্র। বাবাজী! আপনি কেবল পরামর্শ দিবেন, আর আমার দাদা বাসুদেব মান্ধাতা রহিয়াছেন, আমার বিশ্বাসী সরদার জয়সিং ও “সামকরণ” যদুমণি পট্টনায়ক আছে, ইঁহারা সকল কাজ করিবেন। আমার শোভাবতী যেন একটী সৎপাত্রে অর্পিত হয়, ইহাই আমার বিশেষ ও শেষ অনুরোধ।

বাবাজী। “আচ্ছা আমি স্বীকার করিলাম। কিন্তু বাবা! গোপাল-জীর নিকট প্রার্থনা করি যে, তুমি শীঘ্র আরোগ্য লাভ কর, আমাকে যেন কোন কাজ করিতে না হয়!”

বাসুদেব মান্ধাতাও সম্মত হইলেন। তখন বীরভদ্র উইল দস্তখত করিলেন; ডাক্তারবাবু, বাবাজী ও বাসুদেব মান্ধাতা সাক্ষী হইলেন।

এই সকল কথাবার্ত্তার মধ্যে পার্শ্বের ঘর হইতে শোভাবতীর অস্ফুট রোদনধ্বনি শুনা যাইতেছিল।

উইল দস্তখত শেষ হইলে, ডাক্তারবাবু এক দাগ ঔষধ খাওয়াইলেন। বীরভদ্র বলিলেন—

“আর ঔষধ খাইয়া কি হবে, ডাক্তারবাবু? আমার নিজের অবস্থা কি আমি নিজে বুঝিতে পারি না? আমার এখন অন্তিম কাল উপস্থিত! এখন আমার অন্তিম কালের ঔষধের প্রয়োজন। সে ঔষধ বাবাজীর নিকট। বাবাজী! উইল ত করিলাম, আমার জীবনও শেষ হইয়া আসিল, কিন্তু আমার পরকালে কি গতি হবে? আমি ঘোর পাপী, আজীবন পাপকার্য্য করিয়াছি। এই যে এত টাকা রাখিয়া গেলাম, ইহার জন্য যে কত লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছি, তাহা বলিয়া শেষ

করিতে পারি না। এত দিন কেবল বাহিরের দিকেই দৃষ্টি ছিল, অন্তরের দিকে তাকাইবার অবসর পাই নাই। কিন্তু এখন দেখিতেছি আমার অন্তর পাপে মলিন, একেবারে কালীমাখা। এখন পরকালের কথা ভাবিয়া বড়ই ভীত হইয়াছি, বাবাজী! আমার উপায় কি হবে?

বাবাজী। বাবা! কেবল তুমি কেন, আমরা সকলেই পাপী। আমাদের একমাত্র ভরসা, সেই দীন দয়াল গৌরহরি! অতি দীনভাবে তাঁহার শরণাপন্ন হও! আমাদের পাপ যত অধিক হউক না কেন, তাঁহার কৃপা-বারিধির নিকট তাহা অতি তুচ্ছ। এই জন্য তাঁহার একটী নাম কৃপাসিন্ধু। বাবা! জগাই, মাধাই যে চরণতলে আশ্রয় পাইয়াছিল, তোমার আমার সেই শ্রীচরণের ছায়ায় একটু স্থানও কি হবে না?

ইহা বলিতে বলিতে বাবাজীর কণ্ঠরোধ হইল, দুই নয়নে প্রেমধারা প্রবাহিত হইল।

স্পর্শমণির সংস্পর্শে যেমন লোহাও সোণা হয়, বাবাজীর সেই প্রেমাশ্রু দর্শন করিয়া আজ বীরভদ্রের চক্ষেও ধারা বহিল। ডাক্তারবাবু রুমাল দিয়া চক্ষু মুছিতে লাগিলেন! বাসুদেব মান্ধাতা "হাউ হাউ" করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বাবাজী প্রেমাবেশে "দীনদয়াল গৌরহরি" বলিতে বলিতে মহাভাব প্রাপ্ত হইলেন। প্রত্যহ এই সময়ে তাঁহার ভাবাবেশ হয়, আজও তাহা হইল। ক্ষণকালের জন্য সেই মুমূর্ষুর গৃহে পবিত্র প্রেমের স্রোত প্রবাহিত হইল। বীরভদ্র অন্ততঃ কিছু কালের জন্য এই মহাজনের সঙ্গ লাভ করিয়া মনে অনেকটা শান্তি পাইলেন। রাত্রি ১টার সময়ে তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার গৃহে হাহাকার পড়িয়া গেল। শোভাবতীর জীবনের একমাত্র আশার প্রদীপ নিবিয়া গেল।

রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে বীরভদ্রের মৃত্যুসংবাদ চারি দিকে ব্যাপ্ত হইল। অনেক লোক সে সংবাদ শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিল— যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। আবার যে সকল লোক তাঁহার দ্বারা

উপকার পাইয়াছিল, তাহারা আক্ষেপ করিতে লাগিল। তবে সকলেই একবাক্যে বলিল, দেশের মধ্যে এ রকম একজন বিচক্ষণ ও ক্ষমতাশালী লোক শীঘ্র জন্মে নাই।

দেখিতে দেখিতে শ্রাদ্ধের দিন উপস্থিত হইল। উড়িষ্যার অধিকাংশ জাতির ১১ দিনে অশৌচান্ত হয়, কেবল যে সকল জাতির শবদাহ করা হয় না, মাটিতে পুঁতিয়া ফেলা হয়, তাহাদের অশৌচ ২১ দিন। বীরভদ্রের শ্রাদ্ধ অবশ্যই যথোচিত ধুমধামের সহিত সম্পন্ন হইল। গড় কোদণ্ডপুরের নিকটবর্ত্তী অনেক ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করা হইল। প্রায় ৫০০ ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, কিন্তু উপস্থিত হইলেন প্রায় এক হাজার! উড়িষ্যার ব্রাহ্মণের আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান নাই বলিলেই চলে। তাঁহারা সকলেই অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে "চুড়া", "দহি", কাঁচালঙ্কা, নুন, তেঁতুল, কন্দ প্রভৃতি সামগ্রী ভোজন দ্বারা পরম পরিতোষ লাভ করিয়া প্রত্যেকে এক পয়সা করিয়া ভোজন-দক্ষিণা বা বিদায় গ্রহণ-পূর্ব্বক অতি প্রফুল্লচিত্তে বীরভদ্রের স্ত্রী ও কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন।

এই শ্রাদ্ধ সূর্য্যমণি, তাঁহার বাটীর কার্য্যকারক যদুমণি পট্টনায়ক, বাসুদেব মান্ধাতা ও ভীমজয়সিং সর্দ্দার ইঁহাদের তত্ত্বাবধানে নির্ব্বাহিত হইল। মোহান্ত বাবাজীও উপস্থিত ছিলেন। সূর্য্যমণির ভ্রাতা চক্রধর পট্টনায়কও শ্রাদ্ধের পূর্ব্ব দিন আসিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস পান নাই। শ্রাদ্ধের গোলযোগ মিটিয়া গেলে, পরদিন রাত্রে সূর্য্যমণির গৃহে চক্রধরের সহিত তাঁহার কথাবার্ত্তা হইতেছিল।

সূর্য্যমণি বিধবা হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার বেশভূষার পারিপাট্য বেশী কিছু কমে নাই, কেবল হলুদমাখাটা বন্ধ হইয়াছে। উড়িষ্যায় ব্রাহ্মণ-বিধবা ভিন্ন অন্য জাতির বিধবার পাড় দেওয়া সাড়ী ও অলঙ্কারাদি পরার কোন বাধা নাই।

সূর্য্যমণি বলিলেন "আর একদিন থাকিয়া যাও, আমি এখন কি করি, কিছুই ভাবিয়া পাই না।"

চক্রধর। আর এক দিন থাকিতে পারি—যেন থাকিলাম, কিন্তু তোমার কি উপকার হইবে ? সে উইলটা দেখিয়াছ ?

"না আমাকে দেখায় নাই। কিন্তু সে উইল রদের কি কোন উপায় নাই ? আমাকে যে একেবারে ফাঁকি দিয়া যাবে, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই, দাদা!"—সূর্য্যমণি ইহা বলিয়া অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিলেন।

"আর দেখ, কি অন্যায় অবিচার! সেই মেয়েই হইল সব, আর আমি কেউ না ? আমারে তবে কেন "বাহা" করিয়াছিল ? আজ যদি আমার পেটে একটা ছেলে হইত, তবে কি আমার এ দশা ঘটিত ? আমার কপাল মন্দ, আমি আর কাহার দোষ দিব ?"

চক্রধর। অদৃষ্ট মন্দ, তা বলিয়া আর কি করিবে ? এখন সে উইল রদের চেষ্টা করা বৃথা। মর্দ্দরাজ সাস্তও এমন কাঁচা লোক ছিলেন না। তিনি যে সকল লোককে সাক্ষী করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের কথা কেহই অবিশ্বাস করিবে না।

সূর্য্য। কেন ? সেই মোহান্ত বাবাজী আর মান্ধাতা সান্ত চক্রান্ত করিয়াই ত এই রকম উইল করাইয়াছেন। তা না হইলে, তাঁহাদের উপর সমস্ত ভার দিয়া যাবে কেন ?

চক্রধর। (একটু হাসিয়া) এ কথা তোমাকে কে বলিল ? আমারই তাহা বিশ্বাস হয় না, আর অন্যে সে কথা বিশ্বাস করিবে কেন ? মোহান্ত বাবাজীকে সকলে এক জন সাধু পুরুষ বলিয়া জানে, তিনি যে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কিছু করিয়াছেন, তাহা কেহই বিশ্বাস করিবে না। আর সেই ডাক্তারবাবু একজন "বঙ্গালী" ভদ্রলোক, তাঁহার কি স্বার্থ ছিল ? তিনি কি মিথ্যা কথা বলিবেন ?"

সূর্য্য। তবে আমার কি উপায় হইবে ? আমি যে ভাসিয়া গেলাম!

ইহা বলিয়া সূর্য্যমণি প্রদীপটা উস্কাইয়া দিলেন ও আর একবার আঁচল দিয়া চক্ষু মুছিলেন।

মর্দ্দরাজ সান্ত সূর্য্যমণিকে পাঁচ হাজার টাকা লাভের জমিদারী ও পাঁচ শত "মান" জায়গীর জমি দিয়া গিয়াছেন, তবুও সূর্য্যমণি ভাসিয়া গেলেন!

চক্রধর একটী তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে বলিলেন "যা হোক্, পঞ্চাশ হাজার টাকা সহজে ছাড়া যায় না! আমি তাহার এক সদুপায় উদ্ভাবন করিতেছি। শোভাবতীর সঙ্গে উদয়নাথের বিবাহ দাও, আমি তাহাকে ঘরজামাই করিয়া দিতেছি। তাহা হইলে শোভাবতীরও বিবাহ হইবে, আর ঘরের টাকাও ঘরেই থাকিবে।"

সূর্য্যমণি। (ব্যগ্র হইয়া) বেশ ত, এত খুব ভাল পরামর্শ! কিন্তু শোভাবতীর বিবাহ দেওয়ার ক্ষমতা আমার আছে কোথায়, দাদা? সেই দুই পোড়ারমুখোর উপরে যে সে ভার দিয়া গিয়াছে। তাঁরা যমের বাড়ী না গেলে, আমার যে কোন হাত নাই, দাদা?

চক্রধর। কেন? তুমি ইচ্ছা করিলেই ত এ বিবাহ দিতে পার? যাহা সহজ উপায়ে করা যায় না, তাহা ছলে বলে কৌশলে করিতে হয়। কোন ক্রমে একবার বিবাহ দিয়া ফেলিলেই ত হইল? তোমার মত হইলে, আমি সে উপায় করিতে পারি।

সূর্য্য। তা কর—তুমি যা বলিবে, আমি তাই করিব। দাদা! তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নাই! (ক্রন্দন)

চক্রধর। কিন্তু এই এক বৎসরের মধ্যে ত আর বিবাহ হবে না? এই এক বৎসর অকাল ও কালাশৌচ। যথেষ্ট সময় আছে—ইহার মধ্যে একটা না একটা উপায় করিতে অবশ্যই পারিব। কিন্তু সাবধান! তুমি এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না।

সূর্য্য। না দাদা—আমি কি "পেলা"?

চক্রধর। তবে, আমি কাল সকালেই বাড়ী যাব।

সূর্য্য। কিন্তু মধ্যে মধ্যে আসিও। তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নাই, দাদা। এ পুরীর মধ্যে সকলেই আমার শত্রু।

এই কথাবার্ত্তার পরে চক্রধর পট্টনায়ক উঠিয়া গেলেন। ঘরের বাহিরে লুকাইয়া থাকিয়া একটী স্ত্রীলোক তাঁহাদের এই কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল—সেও দরজা খোলার শব্দ হওয়া মাত্র পলাইয়া গেল। সে উজ্জ্বলা দাসী।

উজ্জ্বলা শোভাবতীর ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। সেই গৃহের কোণে পিলসুজের উপর একটী ক্ষীণ প্রদীপ জ্বলিতেছে। শোভাবতী ভূমিতলে একটী মাতুরের উপর শুইয়া আছে। তাহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন কোনও কঠিন রোগ হইতে সদ্যমুক্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার চক্ষু কোটরগত, মুখ বিবর্ণ, কেশ আলুথালু, বেশবিন্যাসে কিছুমাত্র যত্ন নাই। তাহার শোকসন্তপ্ত মূর্ত্তি দেখিলে বোধ হয়, যেন একটী মালতীলতা প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে আশ্রয়তরুবিহীন হইয়া ভূমিতে পড়িয়া প্রবল নিদাঘতাপে পরিশুষ্ক হইতেছে।

উজ্জ্বলা ঘরে গিয়া, প্রদীপটা উস্কাইয়া দিয়া, শোভাবতীর পার্শ্বে বসিল। সে এখন প্রায়ই শোভাবতীর কাছে থাকে। স্নানের সময় তাহাকে ধরিয়া স্নান করায় ও ভোজনের সময় জোর করিয়া কিছু খাওয়ায়। উজ্জ্বলা বলিল—"মা—একবার উঠিয়া ব'স। এই রকম দিন রাত্রি শুইয়া থাকিতে থাকিতে, শরীর যে একেবারে মাটি হইল!"

শোভাবতী চক্ষু মেলিয়া তাকাইল, কিন্তু কোন কথা বলিল না।

উজ্জ্বলা আবার বলিল—

"তুমি এখন এ রকম থাকিলে চলিবে না—ও দিকে কত "নবরঙ্গ" হইতেছে, তাহার কোন খবর রাখ কি?"

"মা, আমার কিছুই ভাল লাগে না—আমার সে সকল খবরে

কাজ কি? যাহা অদৃষ্টে আছে, তাহাই ঘটিবে।”—ইহা বলিয়া আবার চক্ষু মুদিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া শুইল। উজ্জ্বলা আর কোন কথা পাড়িবার অবসর পাইল না।

নরোত্তমদাস বাবাজী শোভাবতীকে অনেক সান্ত্বনা করিয়া শ্রাদ্ধের পরদিন মঠে ফিরিয়া গেলেন। তিনি নিশ্চিন্ত থাকিবার লোক নহেন, শোভাবতীর জন্য একটী ভাল বর খুঁজিতে লাগিলেন। হে পাঠক! আমরাও একবার খুঁজিয়া দেখিলে ভাল হয় না কি?

ষষ্ঠ অধ্যায়

কাটজুড়ী তীরে।

কটক নগরের দক্ষিণ প্রান্তে কাটজুড়ী নদী প্রবাহিত। এই বিশাল-কায়া নদীটী মহানদীর একটী শাখা, কটকের ছয় মাইল পশ্চিমে মহানদী হইতে বাহির হইয়াছে। মহানদীও এই শাখাটীকে বাহির করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই, আবার তাহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে কটকের পূর্ব্ব সীমায় আসিয়া তাহার দেখা পাইয়াছেন। কটক নগরটী এই দুইটী বড় নদীর মধ্যে অবস্থিত।

কটক নগরে কাটজুড়ীর তীরে একটী বড় পাকা বাঁধ আছে। কাটজুড়ীর বাঁধই কটকের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও মনোরম স্থান। কমিশনারের প্রাসাদ, কালেক্টরীর কাছারী, স্কুল, কলেজ প্রভৃতি এই বাঁধের শোভাবর্দ্ধন করিয়াছে। কটক নগরকে বর্ষাকালীন প্রবল বন্যা হইতে রক্ষা করিবার জন্য মহারাষ্ট্রীয় শাসনকর্ত্তৃগণ এই বিশাল পাষাণময় বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই বাঁধটি তাঁহাদের যে অদ্ভুত স্থপতি-বিদ্যার পরিচয় দেয়, তাহা আধুনিক পাশ্চাত্যবিজ্ঞানবিশারদ স্থপতিগণেরও অনুকরণীয়। এই বাঁধের প্রস্তরগুলি এরূপ সুদৃঢ়ভাবে গ্রথিত ও বাঁধটী নদীর স্রোতের গতি অনুসরণ করিয়া এরূপ আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে

যে, প্রতি বৎসর বর্ষাকালে নদীর প্রবল স্রোতের বেগ ও তরঙ্গাঘাত সহ্য করিয়াও এই ১৫০ বৎসরের মধ্যে উহার একখানা প্রস্তরও স্খলিত বা স্থানভ্রষ্ট হয় নাই।

প্রত্যহ অপরাহ্নে কটকের নাগরিকগণ এই বাঁধের উপর বেড়াইতে আসেন। এখন গ্রীষ্মকাল উপস্থিত; বৈশাখ মাস। এখন প্রত্যহ অনেক ভদ্রলোক ও বালকগণের এখানে সমাগম হয়। এখন নদীর অবস্থা কিন্তু বড়ই শোচনীয়, জল একেবারেই নাই, কেবল শুভ্র বালুকারাশি ধূ ধূ করিতেছে। আর সেই বালুকারাশির মধ্য দিয়া একটী ক্ষীণপ্রাণ ক্ষুদ্র স্রোতোধারা অতি ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া, সমাধিস্থ যোগীর ক্ষীণজীবনীশক্তির ন্যায়, নদীর জীবনীশক্তির পরিচয় দিতেছে। সেই স্রোতোধারার জল বাঁধের নিম্নে, একটী গভীর খাতের মধ্যে জমিয়া, কটকবাসীদিগের স্নানপানাদির উপযোগী জলের একটী নাতিক্ষুদ্র ভাণ্ডারে পরিণত হইয়াছে। নদীর এখনকার এই মৃতপ্রায় অবস্থা দেখিয়া কে অনুমান করিতে পারে যে, ইনিই আবার বর্ষা সমাগমে ভীষণ স্রোতঃসঙ্কুল উদ্দাম ভীম ভৈরব মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সমগ্র কটক নগরকে গ্রাস করিতে উদ্যত হন?

সূর্য্যাস্তের প্রাক্কালে একটী যুবক কাটজুড়ীর বাঁধের উপর দাঁড়াইয়া প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করিতেছিল। তাহার সম্মুখে শুভ্রদেহা বালুকাময়ী নদী। নদীর অপর পারে একটী বিস্তৃত আম্র-বিটপী, প্রবল সাগরোত্থ সমীরণে তাহার বৃক্ষগুলি আন্দোলিত হইতেছিল। পশ্চিম গগনে দিবাকর সুদূর নীল-শৈলমালার শিরে কনক কিরীট পরাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে অস্তগমন করিলেন। তখন সেই লোহিত গগনপটে নীল শৈলমালার ছবি অঙ্কিত হইয়া এক অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিল। দেখিতে দেখিতে, সন্ধ্যাদেবী সেই ছবিখানিকে তাঁহার ধূসর অঞ্চল দ্বারা ঢাকিয়া ফেলিলেন। দেখিতে দেখিতে, গগনশিরঃস্থ শুক্লাষ্টমীর অর্দ্ধ-

চন্দ্রের কিরণ ফুটিয়া উঠিল, সেই রজতচন্দ্রালোকে বালুকাময়ী নদীর শুভ্রদেহ অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। একদল বালক বাঁধের উপর বসিয়া উচ্চকণ্ঠে নিম্নলিখিত গানটী গাইতেছিল—

"কি সুন্দর মুরলীপাণি রে সজনী!
তাঙ্কু কে দিব অস্তা আনি রে সজনী।
দিনে যমুনাকু মু যে বে গলি গাধোই,
বাটরে দেখিলি মু প্রাণ মাধোই, রে সজনী।
বাঙ্ক বাঙ্ক করি মোতে দেলে অনাই,
তরকী তরকী মু অইলি পলাই, রে সজনী।
ধাঁই ধাঁই সে যে মো ধইলে অঞ্চল,
মু ডেঁই পড়িলি যাই যমুনা জল, রে সজনী॥"

* * * *

উল্লিখিত যুবক অদূরে দাঁড়াইয়া এই গানটী মনোনিবেশপূর্ব্বক শুনিতে লাগিল। এই যুবকটীর নাম অভিরাম সুন্দরা। তাহার বয়স ২৫ বৎসর, শরীর কিছু খর্ব্বাকৃতি, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। তাহার পরিধানে একখানা কালো ফিতাপেড়ে বিলাতী ধুতি, তাহার উপরে একটী সাদা সার্ট, গলার উপরে একখানি চাদর। মাথার চুল এক সময়ে লম্বা ছিল এখন ছাটা, তাহাতে আবার টেড়ি কাটা। বাল্যকালে তাহার দুই কাণে "মুলী" পরিবার জন্য দুইটী ছিদ্র করা হইয়াছিল, এখন মুলী নাই, সে দুইটী ছিদ্র ক্রমেক্রমে হতাশমনে মিলিয়া যাইতেছে। তাহার গলায় খুব সরু এক গাছ মালা সার্টের তলে নিজের অস্তিত্ব লুকাইয়া রাখিয়াছে, আবশ্যক হইলে প্রকট হইতে পারে। কেবল এই মালা ভিন্ন যুবকটীর পোষাক-পরিচ্ছদ সর্ব্বাংশে বাঙ্গালীর ন্যায়। সধবা বাঙ্গালী-রমণীর লৌহ-বলয়ের ন্যায়, এই মালাটীই এই উড়িয়া যুবকের জাতীয় বিশেষত্ব রক্ষা করিতেছে। পোষাকপরিচ্ছদাদি সম্বন্ধে বাঙ্গালীই উড়িয়া ভদ্রলোক-

গণের একরূপ পথ-প্রদর্শক। তবে কোন একটী বহুদূরবর্ত্তী নক্ষত্রের আলোক পৃথিবীতে পৌঁছিতে পৌঁছিতে যেমন সেই নক্ষত্রটী সুদূরাকাশে অন্তর্হিত হইয়া যায়, সেইরূপ বাঙ্গালীর পোষাকপরিচ্ছদের কোন একটী নূতন ফেশন কলিকাতা হইতে কটকে পৌঁছিতে পৌঁছিতে সেই ফেশনটী কলিকাতা হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়।

অভিরাম দাঁড়াইয়া গান শুনিতেছিল, এই সময়ে একটী ঘোড়ার পদশব্দ শুনিতে পাইল। পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল, একটা বড় লালরঙের ঘোড়ায় চড়িয়া আসিয়া, কোট-পেণ্টুলেন-টুপি-পরা চাবুক-হস্তে একটী যুবক সেই বাঁধের উপর লাফ দিয়া নামিল। এই যুবকটীর দেহ দীর্ঘ, বলিষ্ঠ; উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, বয়স, ২৭।২৮ বৎসর; মুখে লম্বা দাড়ী গোঁফ। ইহাঁর নাম নবঘন হরিচন্দন। ইহাঁকে দেখিয়া অভিরাম বলিল—

"এই যে,—হরিচন্দন কোথা থেকে?"

নবঘন। আমি জোবরার মাঠে বেড়াইতে গিয়াছিলাম, তুমি এখানে কতক্ষণ?

অভিরাম। এই অল্পক্ষণ আসিয়াছি। আজ বড় চমৎকার লাগিতেছে। দেখুন কেমন শীতল পবন, সুন্দর জোছনা, মনোরম দৃশ্য—ঐ গড়জাতের পাহাড়গুলি কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে!

নবঘন। আজ তোমার ভারি স্ফূর্ত্তি দেখিতেছি হে! ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই আর কোন গূঢ় কারণ আছে। এস, আমরা বাঁধের উপর একটু বসি!

নবঘন, অভিরামকে ধরিয়া লইয়া, বাঁধের উপর পা ঝুলাইয়া বসিলেন; বলিলেন—

"আচ্ছা তোমার বিবাহ কবে?"

অভিরাম। (একটু হাসিয়া) কেন, এই মাসের ২৫শে।

নবঘন। ওহো! তাই—তা, এতক্ষণ বল নাই কেন? এই জন্যেই

পাহাড় জঙ্গল আছে, ভবিষ্যতে তাহা হইতে অনেক আয়ও হইতে পারে। কিন্তু তা' হইলে কি হয়, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা বড় শোচনীয়। আমার পিতার ধরণ-ধারণ তুমি বোধ হয় জান না। তাঁহার ব্যয় বাহুল্য এত বেশী যে আমাদের দেনা প্রায় এক লক্ষের কাছে গিয়াছে। কিছু দিন হইল, আমার ভগিনীর বিবাহে তিনি পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন। আমার এই বিবাহ যদি হইত, তবে ইহাতেও অন্ততঃ দশ হাজার টাকা খরচ করিতেন। কিন্তু তাহার মধ্যে মজা এই, এ সব টাকা কর্জ্জ করিয়া খরচ করেন। আমি এ সব দেখিয়া শুনিয়া এখন হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়াছি। আমাদের "রাজগী" শীঘ্রই মহাজনগণ ভাগ-বণ্টন করিয়া লইবে, অতএব আমার কোন আশা নাই।

অভি। তাই বুঝি আপনি এখন এম্-এ পাশ করিয়া একজন প্রোফেসর হইবেন?

নব। দেখা যাক্, কি হয়। কিন্তু তোমার ওকালতীর মধ্যে যাওয়ার ইচ্ছা আমার একেবারেই নাই।

অভি। না, আপনি যেরূপ বিদ্বান্ লোক, আপনার প্রোফেসর হওয়াই ঠিক্ হবে। পরিশ্রম কম, লেখাপড়ার যথেষ্ট সময় পাইবেন। তবে বেতনও কম, কিন্তু আপনার তা'তে ভাবনা কি? আমাদের মত কেবল চাক্‌রীই ত আপনার ভরসা নয়। যাক্ সে কথা। আচ্ছা শুনিলাম, আপনি সে দিন কলেজিয়েট স্কুলের পুরস্কার বিতরণের সভায় উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া কমিশনর সাহেব নাকি খুব প্রশংসা করিয়াছেন? দুর্ভাগ্যক্রমে আমি সে দিন অসুখের জন্য সভায় উপস্থিত হইতে পারি নাই। আচ্ছা, আপনার মতে আমাদের দেশে এত পুনঃ পুনঃ দুর্ভিক্ষ হয় কেন? পুনঃ পুনঃ রাজস্ব-বন্দোবস্তই ইহার কারণ নহে কি?

নব। বাঙ্গালা দেশের ন্যায় উড়িষ্যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নাই,

সেজন্য বারম্বার রাজস্ব বন্দোবস্ত হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু সেই পুনঃ পুনঃ বন্দোবস্তই উড়িষ্যার এখন দুর্ভিক্ষের কারণ, আমি তাহা স্বীকার করি না। অবশ্য মাদ্রাজ, বোম্বাই, প্রভৃতি দেশে এই পুনঃপুনঃ রাজস্ব বন্দোবস্ত দুর্ভিক্ষের কারণ হইতে পারে, কিন্তু তাহা উড়িষ্যায় এ পর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষের কারণ হয় নাই। তবে ভবিষ্যতে হইতে পারে। এই দেখ না কেন, গত ৬০ বৎসরের মধ্যে ত আর বন্দোবস্ত হয় নাই, অথচ উড়িষ্যার যে সর্ব্বপ্রধান দুর্ভিক্ষ, ১৮৬৬ সালের, তাহা এই ৬০ বৎসরের মধ্যে প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। যদি বল ৬০ বৎসর পূর্ব্বে যে কঠোর বন্দোবস্ত হইয়াছিল, তাহারই ফল ৩০ বৎসর পরে ফলিয়াছিল। কিন্তু এ কথাও খাটে না; কারণ, তাহা হইলে সেই দুর্ভিক্ষ একবার প্রকাশ পাইয়া আবার থামিয়া গেল কেন? উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়াইত উচিত ছিল? আরও দেখ দুর্ভিক্ষটা সাধারণতঃ কৃষক-শ্রেণীর মধ্যেই অধিক ঘটে, কিন্তু রাজস্ব বন্দোবস্তে কৃষকদিগের জমা বেশী বাড়ে না, অন্ততঃ এ পর্য্যন্ত বাড়ে নাই। এখন যে বন্দোবস্ত হইবে, ইহাতেও গবর্ণমেণ্ট কৃষকসাধারণের কর বেশী বাড়াইতে পারিবেন না। কেবল জমিদার ও মকদ্দমদের (১) করই বেশী বাড়িবে।

অভি। কেন?

নব। এই কথাটা বুঝিলে না? এবার ৬০ বৎসর পরে বন্দোবস্ত হইতেছে। ইহার মধ্যে অনেক অনাবাদী জমির আবাদ হইয়া এবং "পাহি" জমির খাজানা বৃদ্ধি হইয়া প্রায় সকল জমিদারেরই আয় দ্বিগুণ বাড়িয়াছে। এখন গবর্ণমেণ্ট যদি রায়তদিগের খাজানা আর একেবারেই বৃদ্ধি না করেন ও জমিদারদিগের নিকট গত বন্দোবস্তের হারে রাজস্ব গ্রহণ করেন, তাহা হইলেও গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব অনেক বাড়িয়া যাইবে। আবার কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে জমিদারদিগের আয়ও সেই পরিমাণে

(১) মকদ্দম—জমিদার ও রায়তদিগের মধ্যবর্ত্তী, মধ্যস্বত্বাধিকারী।

কমিয়া যাইবে; কিন্তু ইহার পর আবার যদি রায়তদিগের করও বৃদ্ধি করা হয়, তবে গবর্ণমেণ্টের আয় এত অধিক বাড়িবে যে, গবর্ণমেণ্ট তত-দূর বাড়ান যুক্তিসঙ্গত মনে করিবেন না। আমি একটা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছি। ধর না কেন, গত বন্দোবস্তের সময়ে অর্থাৎ ৬০ বৎসর পূর্ব্বে তোমার একটী মৌজায়, তোমার প্রজার নিকট আদায় হইত ২০০ টাকা। গবর্ণমেণ্ট তোমাকে শতকরা ৪০ টাকা হিসাবে মালিকানা দিয়া, তোমাকে মোট ৮০ টাকা দিয়াছিলেন; আর বাকী ১২০ টাকা রাজস্ব ধার্য্য করিয়াছিলেন। এই ৬০ বৎসরের মধ্যে অনেক নূতন জমি আবাদ হইয়া ও "পাহি" জমির জমা বৃদ্ধি হইয়া এখন তোমার প্রজাদিগের নিকট আদায় হইতেছে ৪০০ টাকা। ইহার মধ্যে তুমি কিন্তু সেই ১২০ টাকাই রাজস্ব স্বরূপ গবর্ণমেণ্টকে দিতেছ, আর বাকী ২৮০ টাকা তুমি নিজে ভোগ করিয়া আসিতেছ। এখন এই বন্দোবস্তে গবর্ণমেণ্ট রায়ত-দিগের জমা আর বৃদ্ধি না করিলেও এবং তোমাকে পূর্ব্ব বন্দোবস্তের সেই ৪০ টাকা হারে মালিকানা দিয়া ৬০ টাকা হিসাবে রাজস্ব গ্রহণ করিলে, এই ৪০০৲ টাকা মফস্বল জমার উপর ২৪০ টাকা সদর জমা হইবে। অর্থাৎ গত বন্দোবস্তের সদর জমার দ্বিগুণ হইবে। তোমার মুনফা থাকিবে ২৮০ টাকার স্থলে মাত্র ১৬০ টাকা, অর্থাৎ প্রায় অৰ্দ্ধেক কম। কিন্তু হঠাৎ তোমার বার্ষিক আয় অৰ্দ্ধেক কমিয়া গেলে, তোমার সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করা বড় কঠিন হইবে। এই কারণে আমার বোধ হয় গবর্ণ-মেণ্টকে মালিকানার হার বৃদ্ধি করিয়া শতকরা ৪০ টাকা স্থলে ৫০ টাকা কিম্বা ৫৫ টাকা করিতে হইবে, নচেৎ জমিদারগণের সর্ব্বনাশ হইবে। অতএব তুমি দেখিলে রায়তদিগের খাজানা কিছুমাত্র বৃদ্ধি না করিলেও, গবর্ণমেণ্টের এই আগামী বন্দোবস্তে কত লাভ হইবে। ইহার উপরে আর রায়তদিগের জমা কেন বাড়াইবেন? তবে নূতন জমি চাষ করি-বার জন্য যদি সামান্য কিছু বাড়ে।

অভি। কিন্তু আপনি বলিলেন, জমিদারেরাই রায়তদিগের খাজানা অনেক বাড়াইয়া ফেলিয়াছে, নচেৎ তাহাদের আয় এত বাড়িল কেন? ইহার উপরে আর গবর্ণমেণ্টের বাড়াইবার অবকাশ কোথায়?

নব। জমিদারেরা "থানী"—(১) রায়তদিগের খাজানা বাড়াইতে পারে নাই, কারণ তাহাদের জমা গত বন্দোবস্ত হইতে অন্য বন্দোবস্ত পর্য্যন্ত স্থির করিয়া ধার্য্য করা হইয়াছিল। জমিদারেরা "পাহি" জমির জমা ক্রমশঃ রায়তদিগের প্রতিযোগিতা দ্বারা কিছু কিছু বাড়াইয়াছে। কিন্তু বাড়াইয়া থাকিলেও সে এই ৬০ বৎসরের পরিমাণে অতি সামান্য বাড়িয়াছে, এখনও "থানি" রায়তদিগের জমার সমান হয় নাই। আর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যেখানে আছে, সেখানকার জমিদারগণ রায়তদিগের জমা ইহার চেয়ে অনেক বেশী বৃদ্ধি করে। আর ইহাও বিবেচনা করিয়া দেখ যে ফসলের দাম এই ৬০ বৎসরে যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, পাহি রায়তদিগের জমা সেই অনুপাতে অতি সামান্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। অতএব দেখা গেল, উড়িষ্যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অভাব দুর্ভিক্ষের কারণ নহে—অন্ততঃ এ পর্য্যন্ত হয় নাই।

অভি। একটু দাঁড়ান,—আমার বিশ্বাস, রায়তদিগের খাজানা অন্য দেশের বা অন্য সময়ের তুলনায় এখানে অত্যন্ত বেশী।

নব। না, তাহা কখনই নয়। এখানে এক একর (acre) সাধারণ ধানী জমিতে গড়ে ১৪ মণ ধান উৎপন্ন হয়। তাহার দাম হইবে আজ-কাল-কার দরে (অর্থাৎ টাকায় ১৬সের চাউল বা ৩২সের ধান হিসাবে) ১৭॥০ টাকা। কিন্তু সেই এক একর জমির খাজানা ২ হইতে ৩ টাকার মধ্যে হইবে—ধর যেন ২॥০ টাকা হইল। ইহা উৎপন্ন ফসলের মূল্যের এক সপ্তমাংশ মাত্র। তবে সেই ফসল উৎপাদন করিতে কৃষকের যে

(১) "থানী" অর্থাৎ গ্রামের অধিবাসী রায়ত (খোদথাস্তা), "পাহি"—অন্য গ্রাম-বাসী রায়ত—(পাইখাস্তা)

খরচ পড়ে, তাহা যদি ধর, তবে ১৭৷৷০ টাকা হইতে সেই খরচটা বাদ দিতে হইবে। এ দেশে এক একর জমি চাষ করিতে গড়ে ৫।৬ টাকা খরচ পড়ে,—কৃষকের মজুরি, বীজ ধান্যের দাম ইত্যাদি সব ধরিয়া এখন এই ১৭৷৷০ টাকা হইতে ৬ টাকা বাদ দিলে ১১৷৷০ টাকা থাকে; ২৷৷০ টাকা খাজানা ইহার প্রায় এক পঞ্চমাংশ। এরূপ স্থলে, আমাদের দেশে রায়তদিগের জমির বর্ত্তমান খাজানা যে বড় বেশী, তাহা বোধ হয় না। কিন্তু, ইহার মধ্যে আর একটী কথা আছে। অর্থনীতিবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, কৃষকদিগের জমির খাজানা এরূপ হওয়া উচিত যে, সেই খাজানা তাহারা বিনা ক্লেশে আদায় করিয়া, যেন জমির উৎপন্ন ফসল হইতে তাহাদের পরিবারের ভরণপোষণ সহজে নির্ব্বাহ করিতে পারে। আমাদের দেশের কৃষকদের বিলাসিতামাত্রেই নাই, তাহাদের অভাব নিতান্ত অল্প; Standard of comfort ও নিতান্ত low, কিন্তু তবুও এই অল্প খাজানা দিয়া তাহাদের পরিবারের উপযুক্তরূপে ভরণপোষণ সঙ্কুলান হয় না। এই হিসাবে তাহাদের খাজানা কম নহে।

অভি। তবে দুর্ভিক্ষের কারণ কি? অতিরিক্ত প্রজাবৃদ্ধি?

নব। অতিরিক্ত প্রজাবৃদ্ধিই বা কি করিয়া দুর্ভিক্ষের কারণ বলিব? অন্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে লোকসংখ্যা বেশী বাড়ে কোথায়? আর যে পরিমাণে বাড়িতেছে, সেই পরিমাণে না বাড়িলে, কালক্রমে লোকসংখ্যা একেবারে ক্ষয় হইতে পারে। আজ কাল ফ্রান্সদেশে নীতিতত্ত্ববিদ্‌গণের এই ভাবনা হইয়াছে। তবে এ কথা আমি স্বীকার করি যে, ৬০ বৎসর আগে যে পরিবারে ৫টী লোক ছিল, এখন সেখানে ৮।১০টী হইয়াছে। কিন্তু সেই পরিমাণে আবার আবাদী জমিও বাড়িয়াছে। তুমি অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবে, পূর্ব্বে যে পরিবারে হয়ত মাত্র ৩ একর জমি ছিল, এখন নূতন আবাদী জমি লইয়া ৫।৬ একর জমি তাহারা চাষ করে। তবে অবশ্য নূতন আবাদী জমির ক্রমেই অভাব

হইতেছে। ইহার পরে আর চাষ করিবার জন্য বেশী জমি পাওয়া যাইবে না। এখনই স্থানে স্থানে তাহার অত্যন্ত অভাব ঘটিয়াছে। কিন্তু এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে অন্য রকম রোজগারের দ্বারা পরিবারের আয়ও বাড়িয়াছে। আমাদের দেশে কার্য্যক্ষম লোক একজনও অলস হইয়া বসিয়া থাকে না—তাহারা সকলেই পরিশ্রমী। তাহারা আর কিছু না পারিলেও মজুরি খাটে—তাহা দেশে না জুটিলে, বিদেশে চলিয়া যায়। এইরূপে জনসংখ্যাবৃদ্ধির অনুপাতে পারিবারিক আয়ও বৃদ্ধি পাইতেছে।

অভি। কেহ কেহ বলেন, কৃষকেরা মিতব্যয়ী নহে, বিবাহ শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে অনেক টাকা ব্যয় করিয়া ফেলে, সে জন্য তাহাদের দারিদ্র্য ঘোচে না।

নব। আমি সে কথা মানি না। তুমি এ কথা জান, কৃষকেরাও মানুষ, তাহারা সুখদুঃখবোধবিহীন জড়পদার্থ নহে। তাহাদের আজীবন-ব্যাপী গুরুতর কষ্টের মধ্যে সময় সময় একটু আমোদ আহ্লাদ দরকার। কিন্তু তাই বলিয়া ইয়ুরোপের কৃষকের মত ইহারা মদ খাইয়া টাকা উড়ায় না। সমাজে থাকিতে গেলে, একেবারে পশুর ন্যায় জীবনযাপন না করিতে হইলে, সমাজের দশজনকে লইয়া যে একটু আমোদ করা দরকার, ইহারা তাহার অতিরিক্ত কিছুই করে না। তাই বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে সাধ্যানুসারে কিছু কিছু খরচ করে। কিন্তু সেও ১০।২০ টাকার অধিক নহে। আর সেই বিবাহশ্রাদ্ধাদি ত আর প্রত্যহ হয় না, এক জনের জীবনে বড় জোর ২।৩ বার। অতএব তাহাদের কিছুমাত্র মিত-ব্যয়িতার অভাব নাই।

অভি। আচ্ছা, ফসলের দাম যখন অনেক বাড়িয়াছে,—৬০ বৎসর আগে ১ গৌণী (৪ সের) ধানের মূল্য এক পয়সা ছিল, এখন সে স্থলে যখন /০ আনা হইয়াছে,—তখন কৃষকের আয়ও সেই পরিমাণে বাড়ি-য়াছে। ইহাতে তাহাদের দরিদ্রতা ঘোচে না কেন? গবর্ণমেণ্ট-

কর্ম্মচারিগণ ত এই ফসলের দাম বাড়িয়াছে বলিয়াই আমাদের দেশের লোকের অত্যন্ত prosperity (সুখসমৃদ্ধি) দেখেন ?

নব। ফসলের দাম বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা কৃষকগণের বিশেষ কিছু লাভ নাই। যাহারা ফসল বিক্রয় করিতে পারে, এই মূল্যবৃদ্ধি দ্বারা তাহাদের লাভ হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু একজন কৃষকের জমিতে যত ধান জন্মে, তাহাতে তাহার পরিবারের বছর খরচই কুলান হয় কি না সন্দেহ; সে আবার বিক্রয় করিবে কোথা থেকে? সেই বছর-খরচ অনেকের কুলায় না বলিয়া, তাহাদের মহাজনের নিকট হইতে ধান কর্জ্জ করিতে হয়। ধান কর্জ্জ করিলে, তাহা আবার জমির উৎপন্ন ধান দিয়াই শোধ দিতে হয়। বৎসরের খোরাক, বীজধান্য, মহাজনের দেনাশোধ, এই সকল বাদে যদি কিছু ধান উদ্বৃত্ত থাকে, তবে ভবিষ্যতের অনাটন আশঙ্কা করিয়া কৃষকেরা তাহা মাটির নীচে পুঁতিয়া রাখে। সকল বৎসর ত সমান ফসল জন্মে না—কোন কোন বৎসর হয় ত উপযুক্ত বৃষ্টির অভাবে একেবারেই ফসল জন্মে না। তবে কৃষকগণ যে একেবারেই ফসল বিক্রয় করে না, তাহা নহে। জমিদারের খাজানা দেওয়ার জন্য ও লবণ, তেল, কাপড়, ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনিতে হয় বলিয়া, সকলকেই কিছু কিছু ধান বিক্রয় করিতে হয়।

অভি। এরূপ ফসল বিক্রয় ত অতি সামান্য। কিন্তু বৎসর বৎসর আমাদের দেশ হইতে যে কত কত ফসল রপ্তানি হইয়া যাইতেছে, সে সকল কোথা হইতে আসে ?

নব। কৃষকেরা উল্লিখিত কারণে প্রায় সকলেই কিছু কিছু বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। আর যাহারা মহাজনের নিকট হইতে নগদ টাকা কর্জ্জ করে, তাহারা ফসল বেচিয়া সে দেনা শোধ করে। আর জমিদার, মহাজন, প্রভৃতি মধ্যবিত্ত লোকেরাও অনেক রকম দায়ে ঠেকিয়া কিম্বা লাভের জন্য ফসল বিক্রয় করে। এতদ্ভিন্ন এই উড়িষ্যার মধ্যে যে

অঞ্চলে নালের জল দ্বারা (Canal irrigation) জমির চাষ হয়, সে অঞ্চলের কৃষকেরা বেশ সমৃদ্ধিসম্পন্ন। তাহারা বছর-খরচ রাখিয়া বেশ দশ পাঁচ টাকার ধান বিক্রয় করিতে পারে। সে যাহা হউক, এই ধানের রপ্তানি ও সেই সঙ্গে মূল্যবৃদ্ধি হওয়াতে, আপাততঃ কতক কতক লোকের উপকার হইতেছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার পরিণাম বড়ই ভয়াবহ।

অভি। কেন? আমি বুঝিতে পারিলাম না।

নব। প্রথমতঃ এই দেখ না কেন, আমাদের দেশ হইতে বৎসর বৎসর যত ধান অন্য দেশে রপ্তানি হইতেছে, সেগুলি দেশে থাকিলে ধানের দর কত কম থাকিত। আমাদের দেশের কৃষক-শ্রেণীর ও মধ্যবিত্ত লোকের নগদ টাকার অত্যন্ত অভাব। ধানের দাম কম থাকিলে, তাহাদের শস্যাভাব ঘটিয়া ধান কিনিতে হইলে অল্প টাকায় চলে। কিন্তু রপ্তানির প্রতিযোগিতায় ধান চাউলের মূল্য অনেক বাড়িয়াছে বলিয়া, ক্ষেতে ধান না জন্মিলে অধিকাংশ লোকেই টাকার অভাবে ধান-চাউল কিনিতে পারে না। তখন বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে মহাজনের নিকট হইতে অত্যন্ত বেশী সুদে টাকা কিম্বা ধান কর্জ্জ করিতে হয়। তাহা না পাইলে, অগত্যা গবর্ণমেণ্টের আশ্রয় লইতে হয়। আর দেখ, যাহারা ধান বেচিতে পারে, তাহাদের অপেক্ষা যাহাদের ধান কিনিতে হয়, তাহাদের সংখ্যা অনেক বেশী। সেইজন্য রপ্তানি দ্বারা মূল্যবৃদ্ধি হইয়া অধিকাংশ লোকের অনিষ্ট হইতেছে। দ্বিতীয় কথা এই, দেশের ধান-চাউল অন্য দেশে রপ্তানি হওয়াতে, দেশের খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ ক্রমশঃ কমিতেছে, দেশে মজুদ থাকিতে পারিতেছে না। আমরা অবশ্য অন্য দেশ হইতে ধান চাউলের বিনিময়ে নানা রকম জিনিষ পাইতেছি, কিন্তু তাহা খাদ্য দ্রব্য নহে। বিদেশের শোষণদ্বারা ভারতবর্ষ আজ এরূপ শস্যশূন্য হইয়াছে যে, এখন যদি কোন বৎসর এ দেশে ফসল না জন্মে, তবে ভারতবাসীকে উদরান্নের জন্য অন্য দেশের মুখাপেক্ষী হইতে হইবে।

কেবল টাকা থাকিলে চলিবে না, খাদ্য দ্রব্যের অভাব ঘটিবে। তখন ব্রহ্মদেশ কিম্বা আমেরিকা হইতে শস্য না আসিলে, আমাদিগকে অন্নাভাবে মরিতে হইবে। অতএব এই দেশশোষক রপ্তানি ও তজ্জনিত মূল্যবৃদ্ধির পরিমাণ বড়ই অশুভ। এই মূল্যবৃদ্ধি দ্বারা লোকের দরিদ্রতা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। যতই দরিদ্রতা বাড়িবে, ততই লোক সহজে দুর্ভিক্ষের গ্রাসে পতিত হইবে।

অভি। আচ্ছা, এখন বলুন, আপনার মতে পুনঃ পুনঃ দুর্ভিক্ষের কারণ কি?

নব। বড় বালি উড়িতেছে—এস আমরা উঠিয়া একটু বেড়াই।

ইহা বলিয়াই দুই জনে উঠিলেন ও বাঁধের উপর বেড়াইতে বেড়াইতে কথা কহিতে লাগিলেন।

"পুনঃ পুনঃ দুর্ভিক্ষের কারণ কি, এ সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বে যাহা বলিলাম, তাহা হইতেই একরূপ বুঝিয়াছ। দুর্ভিক্ষের কোন একটা বিশেষ কারণ নাই—নানা কারণে দুর্ভিক্ষ ঘটে। প্রথম কারণ এবং সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী কারণ হইতেছে—বৃষ্টির অভাবে শস্যহানি। জমিতে ধান না জন্মিলে, কৃষকগণ প্রথমতঃ তাহাদের যে যৎকিঞ্চিৎ সঞ্চিত ধান থাকে, তাহা দিয়া কতক দিন চালায়। পরে তাহাতে না চলিলে, গরু বাছুর, থালা ঘটী বাটী, কিম্বা ছেলে মেয়ে ও স্ত্রীর গায়ের দুই চারিখানা রূপা বা কাঁসার গহনা যদি থাকে, তাহা বিক্রয় করিয়া ধান কেনে। অথবা ঐ সকল জিনিষের কিছু মহাজনের নিকট বন্ধক রাখিয়া কিম্বা জমি বন্ধক রাখিয়া, অথবা অত্যন্ত বেশী সুদে, ধান কিম্বা টাকা কর্জ্জ করে। মহাজনগণ এত বেশী সুদ নেয় যে, পরের বৎসর যদি ভাল ফসল জন্মে তাহা হইলেও, বছরের খরচ রাখিয়া ও জমিদারদের খাজানার জন্য ধান বিক্রয় করিয়া, বাকী যে ধান থাকে, তাহা দিয়া মহাজনের সকল দেনা শোধ করা ঘটিয়া উঠে না। যে একবার মহাজনের কবলে পতিত হইয়াছে, তাহার

আর নিস্তার নাই। তাহার দেনা ক্রমে ক্রমে শোধ হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমে ক্রমে বাড়িতে থাকে। ইহাতে কৃষকগণের স্বাধীনতা থাকে না, দারিদ্রতা বাড়ে। সুতরাং, মহাজনের বেশী সুদ নেওয়াটা লোকের দরিদ্রতার (সুতরাং দুর্ভিক্ষের) দ্বিতীয় কারণ। তবে এ কথাও ঠিক যে কৃষকগণ দরিদ্র না হইলে আর মহাজনের নিকটে কর্জ্জ করিতে যায় না; সুতরাং তাহাদের ঋণগ্রহণ দরিদ্রতার, কারণ নহে, ফল। কিন্তু তুমি এ কথা জানিও, Cause and effect reciprocal, যেমন কারণ হইতে ফল জন্মে, সেইরূপ ফল হইতেও কারণ জন্মে। আমের গাছ আগে ছিল, কি ফল আগে ছিল, এ প্রশ্নের মীমাংসা করা কঠিন। সেইরূপ কৃষকের দরিদ্রতা আগে ছিল, কিম্বা বেশী সুদে ঋণ গ্রহণের জন্যই সে অধিকতর দরিদ্র হইতেছে, এ কথারও সুনিশ্চিত উত্তর দেওয়া কঠিন। তবে আমার মতে, যেমন দরিদ্রতা ঋণগ্রহণের কারণ, সেইরূপ একবার বেশী সুদে ঋণ গ্রহণ করিলে, তদ্দ্বারা কৃষকগণের দরিদ্রতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। যাহা হউক, ফসলের অভাব ঘটিলে, কৃষকগণ যদি ধান কর্জ্জ না লইয়া, টাকা কর্জ্জ করিয়া কিম্বা গরু বাছুর প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া, ধান কেনে, তবে শস্যের মূল্য অত্যন্ত বাড়িয়া যাওয়ায় তাহাদিগকে খুব বেশী দাম দিয়া ধান কিনিতে হয়। ৬০ বৎসর পূর্ব্বে যাহার ১ টাকার ধান কিনিলে এক মাস চলিত, এখন তাহার সেই জায়গায় ৪ টাকার ধানের প্রয়োজন। কিন্তু কৃষকগণের পয়সা রোজগারের অন্য উপায় নাই বলিয়া, তাহাদের নগদ টাকার অত্যন্ত অভাব। যাহারা মজুরি খাটিয়া খায়, তাহারা সারাদিন পরিশ্রম করিয়া প্রত্যেকে ৵০ কি ৴১০ পয়সা পায়। ধানের মূল্য বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু শ্রমজীবিগণের বেতন বাড়ে নাই। কারণ, এ দেশে শ্রমজীবিগণের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। সুতরাং শস্যের রপ্তানিবশতঃ মূল্যবৃদ্ধি কৃষকের দরিদ্রতার তৃতীয় কারণ। আমার মতে, কৃষকগণের দরিদ্রতার এইগুলি মুখ্য

কারণ এবং এই জন্যই পুনঃ পুনঃ দুর্ভিক্ষ ঘটে। এতদ্ভিন্ন গৌণ কারণ আরও আছে সন্দেহ নাই। যেমন direct and indirect taxation, Home charges ইত্যাদি।

অভি। কিন্তু এই মজ্জাগত দরিদ্রতা নিবারণের উপায় কি?

নব। বৃষ্টির অভাবে শস্যহানি নিবারণের উপায় কূপ ও নালের জল দ্বারা শস্যরক্ষা। গত "ন-অঙ্ক" দুর্ভিক্ষের পরে গবর্ণমেণ্ট উড়িষ্যার স্থানে স্থানে খাল কাটিয়া জল সিঞ্চনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সে সকল স্থানের প্রজাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। তাহারা কখনও না খাইয়া মরে না—বরং তাহাদের বৎসর বৎসর ধানসঞ্চয় হইতেছে। তবে নাল-এলাকার অধস্তন কর্ম্মচারিগণের জুলুমও আছে। তাহার প্রতীকার আবশ্যক। মহাজনদিগের জুলুম নিবারণের উপায় কৃষি-ভাণ্ডার (Agricultural Bank) স্থাপন। সম্প্রতি এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতে কালে সুফল ফলিবে আশা করা যায়। গবর্ণমেণ্ট অবাধবাণিজ্যের পক্ষপাতী, সুতরাং এদেশ হইতে শস্যের রপ্তানি বন্ধ হওয়া ও তজ্জন্য মূল্যের হ্রাস হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু প্রথম দুইটী প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে, কৃষকদিগের আর বেশী কিনিতে হইবে না, তাহাদিগকে নির্ম্মম মহাজনের নিকট চির-ঋণগ্রস্ত হইয়াও থাকিতে হইবে না। সুতরাং ক্রমশঃ তাহাদের দরিদ্রতা ঘুচিতে পারে।

অভি। মহাজনদিগের উপর আপনার বড়ই কোপ দেখিতেছি, কিন্তু তাহাদের দ্বারা কি সমাজের কোন উপকার হয় না?

নব। হয় বৈ কি? দেশে মহাজন না থাকিলে, গরিব প্রজারা অভাবে পড়িলে কাহার নিকট ধান ও টাকা কর্জ্জ পাইত? আর দুর্ভিক্ষের বৎসর মহাজনদিগের মজুত করা ধান্যই ত প্রজাদিগের জীবনরক্ষা করে। দেশে যে কিছু অল্প ধান মজুত থাকিতেছে, তাহা কেবল মহাজনদিগের জন্য; নচেৎ সকল ধান বিদেশে চলিয়া যাইত।

অভি। তবে মহাজনদিগের দোষ কি?

নব। দোষ এই, অধিকাংশ মহাজনই অত্যন্ত বেশী সুদ নেয়; তাহাদের সুদের পীড়নে গরিব প্রজাগণ অধিকতর গরিব হইতেছে! আর যে কৃষক একবার কোন মহাজনের ঋণ-জালে আবদ্ধ হইয়াছে, তাহার আর নিস্তার নাই—সে কখনও সে ঋণ শোধ দিয়া উঠিতে পারে না।

অভি। এ কথা সত্য। কিন্তু মহাজনদের দিক্ হইতেও ত দেখা উচিত; এই তেজারতী কারবারই তাহাদের উপজীবিকা। এই ব্যবসায়ে যেমন লাভ আছে, তেমন লোকসানও আছে। এক দিকে যেমন বেশী সুদ নেয়, অন্য দিকে আবার তাহাদের কত টাকা একেবারে ডুবিয়া যায়। অনেক সময়ে তাহাদিগকে ন্যায্য পাওনা আদায় করিবার জন্য মামলা মোকর্দ্দমা করিতে হয়।

নব। তা ত বটেই। কিন্তু আমার বিশ্বাস এত অধিক সুদ না নিলেও এ ব্যবসায় উত্তমরূপে চলিতে পারে।

অভি। আচ্ছা, এখন মধ্যবিত্ত লোকের উপায় কি? আপনি বলিলেন, আগামী বন্দোবস্ত দ্বারা তাহাদের আয় অনেক কমিয়া যাইতে পারে

নব। গবর্ণমেণ্ট বারংবার বন্দোবস্ত করিলে, তাহাদের আয় আরও কমিবে বৈ কি? কৃষক অপেক্ষা মধ্যবিত্ত লোকের বেশী দরিদ্রতা হইবে, কেননা তাহাদিগকে প্রায়ই কিনিয়া খাইতে হয়। সুতরাং ফসলের দাম যত বাড়িবে, তাহাদের দরিদ্রতাও তত বাড়িবে। অতএব তাহাদিগকে আর জমিদারী-মকদ্দমির আয়ের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না। তাহাদিগকে অন্য উপায়ে টাকা রোজগার করিতে হইবে। তাহাদিগকে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদিগের ন্যায় বিদ্যাশিক্ষা করিয়া, চাকরী, ব্যবসা, বাণিজ্য, প্রভৃতি অবলম্বন করিতে হইবে।

অভি। আর ভবিষ্যৎ কোন বন্দোবস্তে যদি রায়তদিগেরও খাজানা বাড়ে, তবে তাহাদের দশা কি হইবে?

নব। তাহাদেরও দরিদ্রতা বাড়িবে, সন্দেহ নাই। তবে ভবিষ্যৎ বন্দোবস্তে যদি কেবল শস্তের মূল্যবৃদ্ধির অনুপাতে প্রজার জমাবৃদ্ধি করা হয়, তবে প্রজাকে সেই বৰ্দ্ধিত জমার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে না। এখন তাহাকে যত ধান বিক্রয় করিয়া খাজানা দিতে হয়, তখনও সেই পরিমাণে ধান বেচিলেই সেই বৰ্দ্ধিত জমা দিতে পারিবে। অনেক রাত্রি হইল। চল এখন আমরা—”

এই সময়ে একটী লোক পশ্চাৎ হইতে আসিয়া, নবঘনকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল ও তাঁহার হাতে একখানা পত্র দিল। তাহাকে দেখিয়া নবঘন বলিলেন—

“কি রে হাড়িয়া, তুই কোথা থেকে আইলি?” এই লোকটীর নাম হাড়িবন্ধু বেহারা। সে বলিল—

“মণিমা! আমি গড়কনকপুর হইতে আসিতেছি। পেস্কার বাবু এই পত্র দিয়াছেন, আর আপনাকে অবিলম্বে গড়ে যাইতে বলিয়াছেন। “রজা”র বড় “দেহ-দুঃখ”—

নব। (ব্যস্ততার সহিত) কি?

ইহা বলিয়া নবঘন একটী আলোকস্তম্ভের নিকটে গিয়া চিঠি খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন। সে পত্রখানা এই :—

“শ্রীশ্রীজগন্নাথ জিউঙ্কর চরণ শরণ।

“পরম মান্যবর শ্রীল শ্রীশ্রীশ্রী বাবু নবঘন হরিচন্দন মহাপাত্র মহোদয়ঙ্ক শ্রীচরণে দাসানুদাস শ্রীদয়ানিধি পট্টনায়কঙ্ক প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন। ব্রতমান লিখিবা কারণ এহি কি শ্রীহজুরঙ্ক পিত্র শ্রীশ্রীরাজা বাহাদুর আজি দিন অকস্মাৎ গোটিয়ে দৈব দুর্ঘটনা জোগু বিশেষতঃ বাস্তরে অচ্ছন্তি। সেথিরে তাঙ্কর জীবন সংশয় অটে। অতএব আজ্ঞাধীনর নিবেদন এহি কি শ্রীহজুর এহি ভাষা খণ্ডিয়ে পাইলা মাত্রকে এথিসঙ্গরে যাইথিবা

সোয়ারীরে গড়কু বিরাজমান হেবে। সেথিরে অন্যথা ন হেব, নিবেদন ইতি। তা১৭রিখ বৈশাখ ১৩০১স্ন।

আজ্ঞাধীন সেবক
শ্রীদয়ানিধি পট্টনায়ক, পেস্কার।"

পত্র পড়িয়া নবঘনের মুখ বিষণ্ণ হইল। তিনি অভিরামকে পত্র পড়িতে দিলেন। অভিরাম বলিল "তাইত, এ যে এক বিপদ উপস্থিত। আপনি এখনই বাড়ী যান।"

নব। কিন্তু আমার মনে সন্দেহ হইতেছে। আমাকে বিবাহ দেওয়ার জন্য ফাঁকি দিয়া বাড়ী লইয়া যাওয়ার এ একটা কৌশল নয় ত?

ইহা শুনিয়া হাড়িবন্ধু বলিল—

"মণিমা, তা কখনই না। এ কথা যদি মিথ্যা হয়, তবে আমার মুণ্ড কাটিয়া ফেলিবেন—আমাকে এক শ জুতা মারিবেন। আমি ত সঙ্গেই যাইতেছি! যথার্থই "রজা" "বেমারি" হইয়াছেন, বাঁচিবেন কিনা সন্দেহ। আপনি আর দেরী করিবেন না।"

নবঘন অভিরামের নিকট বিদায় লইয়া বাসায় আসিলেন ও তৎক্ষণাৎ পাল্কী আরোহণে বাটী যাত্রা করিলেন।

---

* ইহার অর্থ—বর্ত্তমান লিখিবার কারণ এই যে শ্রীহুজুরের পিতা শ্রীশ্রীরাজা বাহাদুর আজ অকস্মাৎ একটী দৈব দুর্ঘটনার জন্য, বিশেষ কাতর আছেন। তাহাতে তাঁহার জীবন সংশয় বটে। অতএব আজ্ঞাধীনের নিবেদন এই যে শ্রীহুজুর এই পত্র পাওয়া মাত্র এই প্রেরিত সোয়ারীতে গড়ে বিরাজমান হইবেন। তাহাতে যেন অন্যথা না হয়।

উড়িষ্যার চিত্র।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

কনকপুরের রাজা।

কটক জেলার পূর্ব্ব-দক্ষিণ ভাগে কিল্লা কনকপুর একটী বড় পরগণা। কনকপুরের রাজার নাম ক্ষত্রিয়বর-ব্রজসুন্দর-বিদ্যাধর-ভ্রমরবর-মানসিং-ভূমীন্দ্র-মহাপাত্র; ইহার মধ্যে ব্রজসুন্দর হইতেছে তাঁহার প্রকৃত নাম, অন্যগুলি উপাধি। "ক্ষত্রিয়বর" এই আখ্যাটী তাঁহার কৌলিক উপাধি। বোধ হয়, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ ক্ষত্রিয় কি না, এ বিষয়ে এক সময় সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল; তাই যাহাতে ভবিষ্যতে এরূপ আর না ঘটে, সেই জন্য এই পাকাপাকি বন্দোবস্ত।

এই রাজার এলাকা কিল্লা কনকপুর। এখানে "কিল্লা" কথাটার একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। উড়িষ্যায় দুই শ্রেণীর রাজা আছেন—গড়জাতের রাজা ও কিল্লাজাতের রাজা। গড়জাতের রাজারা (Tributary chiefs) কতকটা স্বাধীন, করদ ও মিত্র রাজাদের ন্যায়। ইঁহারা গবর্ণমেণ্টকে অল্প স্বল্প কিছু কিছু কর দিয়াই খালাস—শাসন-কর্তৃত্ব বিষয়ে ইঁহাদের অনেকটা স্বাধীনতা আছে। ইঁহাদের নিজের পুলিস, নিজের বিচারবিভাগ, নিজের রাজস্ববিভাগ, নিজের পূর্ত্তবিভাগ, ইত্যাদি আছে। এই সকল রাজাদের ফৌজদারী বিচারবিষয়ে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা আছে। তাঁহাদের বিচারের বিরুদ্ধে আপীল হয় কমিশনার ও তাঁহার সহকারীর (Assistant Superintendent of Tributary Mahals) নিকট। উড়িষ্যার কমিশনার এই সকল রাজাদিগের উপরিস্থ মালিক, অর্থাৎ, তত্ত্বাবধায়ক ; এজন্য তাঁহার উপাধি Superintendent of Tributary Mahals—তাঁহার সহকারীর সেসন জজের ক্ষমতা আছে। তিনি ফাঁসির হুকুম দিলে, তাহা কমিশনার মঞ্জুর (confirm) করেন। এই বিচারকার্য্য ভিন্ন গড়জাতের রাজাদিগের উপর সাধারণ কর্ত্তৃত্বভারও কমিশনারের হাতে আছে। তিনি দেখিবেন, কোন রাজা যেন অন্য রাজার সঙ্গে কোনরূপ বিবাদ-বিসম্বাদে লিপ্ত না হন, অথবা প্রজাপীড়ন না করেন। এই সকল বিষয়ে সাবধান হইয়া চলিলে, গড়জাতের রাজাদিগের আর কোন জবাবদিহি নাই।

কিল্লাজাত মহালের রাজাদিগের উল্লিখিত কোনরকম ক্ষমতা নাই। তাঁহারা একরকম বাঙ্গালা দেশের জমিদার। উড়িষ্যার জমিদারদিগের রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় নাই, কিন্তু এই সকল কিল্লাজাতের রাজাদিগের অনেকেরই রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে। কোনরকম ক্ষমতা বা স্বাধীনতা না থাকিলেও এই সকল কিল্লাজাতের রাজাদিগেরও চাল-চলন, আচার-ব্যবহার, গড়জাতের রাজাদিগের মত।

কিল্লা কনকপুরের রাজধানী গড় চান্দ্রমৌলি। চান্দ্রমৌলি একটি ক্ষুদ্র পাহাড়, প্রায় ২০০ হাত উচ্চ। পাহাড়টীর শিরোদেশে তিন দিকে তিনটি বৃক্ষলতা-সমাবৃত শৃঙ্গ উঠিয়াছে, তাহার মধ্যস্থল সমতল। এই সমতল ক্ষেত্রের উপর একটি ক্ষুদ্র গ্রাম অবস্থিত। ইহাই রাজার গড়। পাহাড়ের নাম চান্দ্রমৌলি বলিয়া এই গড়ের নামও চান্দ্রমৌলি হইয়াছে। এই গ্রামটি পূর্ব্বমুখ। পাহাড়ের পাদদেশ হইতে গড়ে উঠিবার জন্য একটি প্রশস্ত পথ আছে। তাহা দূর হইতে দেখায় যেন পাহাড়ের গায়ে একটি উপবীত ঝুলিতেছে। এই পথ দিয়া উপরে উঠিলে, সম্মুখে গড়ের সিংহ-দ্বার দেখিতে পাওয়া যায়। গড়ের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া একটি বৃহৎ বৃত্তাকার প্রস্তরময় প্রাচীর আছে, তাহার দুই মুখ এখানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এই সদর দরজা ভিন্ন সেই প্রাচীরের উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ-দিকে তিনটি ছোট দরজা আছে, সেগুলি প্রায়ই বন্ধ থাকে। কিন্তু সিংহদ্বার সর্ব্বদা খোলা থাকে। এই সিংহদ্বারে "প্রথম পহরা"। সিংহ-দ্বার পার হইয়া পূর্ব্বদিকে কিছুদূর গেলে, আর একটি দরজা দেখিতে পাওয়া যাইবে। এখানে সেই বৃহৎ প্রাচীরের মধ্যবর্ত্তী আর একটি বর্ত্তুলাকার ছোট প্রাচীরের দুই মুখ মিলিয়াছে। এই দ্বারে "দ্বিতীয় পহরা"। এই দুইটি পহরায় দুই জন করিয়া দ্বারবান মাথায় লাল পাগড়ী বাঁধিয়া, ঢাল-তলোয়ার-হাতে, দাঁড়াইয়া আছে। এই দুইটী প্রাচীরের মধ্যে বিস্তৃত জায়গা আছে। তাহার উত্তরাংশে অর্থাৎ সদর দরজার দক্ষিণ ধারে একটি বড় পুষ্করিণী, ফুলের বাগান ও গোশালা। দক্ষিণাংশে অর্থাৎ সদর দরজার বামে আমলাদিগের বাসা ও ঘোড়ার আস্তাবল। দেবমন্দিরটি পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরের অনুকরণে নির্ম্মিত। তাহার উচ্চ শৈলসোপানাবলী বড়ই সুন্দর। এই মন্দিরে শ্রীশ্রীরাধাবনজীউ বিগ্রহ বিরাজমান। পাহাড়ের উপরে আবার পুষ্করিণী! তাহার জল কোথা হইতে আসে? বলিতেছি। পূর্ব্বে যে তিনটি শৃঙ্গের

কথা বলিয়াছি, তাহার একটি শৃঙ্গ হইতে একটি নির্ঝরধারা প্রবাহিত হইয়া এই পুষ্করিণীর মধ্যে পড়িয়াছে। সেই নির্ঝরের অনাবিল স্বচ্ছ বারিরাশিতে এই পুষ্করিণীটি সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকিবার কথা। তবে যে, জল ময়লা হইয়া গিয়াছে, সে লোকের দোষে।

দ্বিতীয় পহরা পার হইয়া পশ্চিম দিকে ভিতরে প্রবেশ করিলে, সম্মুখে সর্ব্বাগ্রে বৈঠকখানা পড়ে। বৈঠকখানাটী একটি ছোট একতলা কোঠা—পাথর দিয়া গাঁথা। তাহার সম্মুখে একটী "পিণ্ডা" বা বারান্দা আছে, তাহা মাত্র দুই হাত চৌড়া, কিন্তু ছয় হাত উচ্চ। মনি সাহুর সেই পিণ্ডারই মত। মধ্যে একটি বড় ঘর, তাহার পশ্চাতে দুইটি ছোট ঘর। তাহার একটী শয়ন-কক্ষ; অন্যটি পূজার ঘর। বৈঠকখানার দেওয়ালে অনেক রকম কদাকার ছবি আঁকা। তাহার মধ্যে লম্বা-গোঁফ-দাড়ী, দাঁত-বাহির-করা, বন্দুক-হাতে সিপাহীর ছবিই অধিক। বোধ হয়, রাজার পূর্ব্বকালীন সৈন্যসামন্তগণ মরিয়া এই ছবিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে! অথবা, এই সকল ছবি দ্বারা তাহাদের স্মৃতি জাগরূক রাখা হইয়াছে। বৈঠখানার সম্মুখে তিনটী দরজা, পশ্চাতে দুইটী ছোট দরজা; কোন জানালার কারবার নাই। তবে দুই দিকে দুইটী জানালা আঁকিয়া দেওয়া হইয়াছে। বারান্দা এত উচ্চ হইলেও তাহার সম্মুখে কোন রেলিং নাই। বারান্দায় দুই খানি পুরাতন কেদারা; তাহারা তৈলাক্ত শরীর-সংযোগে নিতান্ত ময়লা। আর একখানা বড় জলচৌকী আছে, তাহার উপর বসিয়া রাজা স্নানাদি করেন।

বৈঠকখানার উত্তরে একটি ছোট কোঠা আছে, ইহার নাম তোষা-খানা। এখানে রাজার মূল্যবান্ পোষাকপরিচ্ছদ, অস্ত্র, শস্ত্র, প্রভৃতি রক্ষিত হইয়াছে। বৈঠকখানার দক্ষিণে আর একটী কোঠা—ইহা রাজার কাছারি। কাছারি ঘরে আধুনিক ফেসন অনুসারে একটী উচ্চ এজ-লাস, তাহার উপরে একটী টেবিল ও একখানা চেয়ার ও একখানা বেঞ্চ

আছে। আমলাগণ মেজের উপর সতরঞ্চ কিম্বা মাছুর পাতিয়া বসিয়া কাজকর্ম্ম করে। এই কোঠাটীর একটী ক্ষুদ্র ঘরে রাশীকৃত তালপত্র মজুত আছে। এটি মহাফেজখানা। কাছারি ঘরের সম্মুখে একটী পাষাণময় উচ্চ বেদি। প্রতি বৎসর মাঘ মাসে পুণ্যাভিষেকের দিন এখানে বসিয়া রাজার অভিষেক হয়।

বৈঠকখানা ও কাছারি ঘরের মধ্য দিয়া একটী রাস্তা পশ্চিম দিকে গিয়াছে। এই রাস্তা দিয়া "ওয়াস" অর্থাৎ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে হয়। অন্তঃপুরে প্রবেশের এই একটী মাত্র দরজা। ইহাকে "ভিতর পহরা" বলে। এই দরজার দক্ষিণে ও বামে উচ্চ প্রাচীর, বাড়ীর ভিতর-কার বর্ত্তুলাকার প্রাচীরের সহিত, একটী ধনুকের ছিলার ন্যায়, মিলিত হইয়াছে। এই ভিতর পহরা পর্য্যন্ত পুরুষ লোকের অধিকার, অন্তঃপুরে পুরুষ চাকরদিগের প্রবেশ নিষেধ। অন্তঃপুর রাণী ও দাসীদিগের এলাকা, রাণীর দাসীদিগকে পহলী বলে। অন্তঃপুরের স্ত্রী প্রহরীদিগকে "পরিয়াড়ী" (প্রতিহারী) বলে।

এই রাজার দুইটী রাণী ;—সেইজন্য অন্তঃপুর দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রত্যেক রাণীর আবাসের জন্য একটী পাকা কোঠা ও দাসীদিগের থাকি-বার জন্য কতকগুলি কাঁচাঘর (কাঁইঘর) আছে। রাণীদিগের প্রত্যে-কের বন্দোবস্ত পৃথক্, একের সঙ্গে অন্যের কোন সম্বন্ধ নাই, এমন কি, দেখা সাক্ষাৎও হয় না। বড় রাণীর নাম চন্দ্রকলা দেবী ; ছোট রাণীর নাম রসলীলা দেবী। রাণীদিগের শয়নকক্ষকে "রাণী হংসপুর" বলে। রাজার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে হইলে, পরিয়াড়ী দ্বারা রাণীকে প্রথমে সংবাদ পাঠাইতে হয় ; পরে অনুমতি হইলে প্রবেশ করিতে পারেন। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক রাণীর দশ বার জন "পহলী" আছে। তাহাদের কতকগুলি বিবাহের সময়ে রাণীদের সঙ্গে আসিয়াছিল। প্রত্যেক পহ-লীর কাজ ধরাবাঁধা আছে—যেমন একজন রাণীর চুল বাঁধে, তাহার নাম

"সিঙ্গারী"। আর একজন রাণীর গায়ে হলুদ মাখায়, একজন তেল মাখায়, একজন বিছানা পাড়ে, একজন হাত ধোয়ায়—ইত্যাদি। রাজা যখন কোন স্থানে যাওয়ার জন্য শুভযাত্রা করেন, তখন অন্তঃপুর হইতে বাহির হইবার সময় একজন পহলী মঙ্গলাষ্টক গান ("গাণী") বলিতে বলিতে আগে আগে যায়। "ওয়াস্" হইতে ভিতর পহরা পর্য্যন্ত রাজা যখন পদব্রজে গমন করেন, তখন তিনি দুই ধারে দুইটী পহলীর করতলে নিজের করতল বিন্যস্ত করিয়া ভর দিয়া চলেন, (বোধ হয়, ইহারা রাজার Centre of Gravity (ভারকেন্দ্র) ঠিক রাখে! আর একজন পহলী আগে আগে কোঁচার খোঁট ধরিয়া চলে। ভিতর পহরা পার হইলে, এই সকল দাসীর স্থল পুরুষ চাকরগণ অধিকার করে। রাত্রিকালে রাজা বাহির হইলে, এই সকল দাসী বা চাকর ভিন্ন আরও দুই জন দাসী কিংবা চাকর আগে আগে দুইটী মশাল ধরিয়া চলে। এই সকলের আগে আর একজন লোক রাজার আগমন-বার্ত্তা ঘোষণা করিতে করিতে চলে। রাজা অন্তঃপুরের এ ঘর ও ঘর ভিন্ন অন্য কোন স্থানে পদব্রজে গমন করা নিতান্ত অপমানের কাজ মনে করেন। তাই আট জন বেহারা নিযুক্ত আছে; তাহারা "তাঞ্জান" (খোলা পালকী) লইয়া প্রস্তুত থাকে। রাজা ভিতর পহরা পার হইয়াই সেই তাঞ্জানে আরোহণ করিয়া বৈঠকখানায়, কিংবা কাছারি ঘরে, কিংবা দেবমন্দিরে, কিংবা পুষ্করিণীতে স্নান করিতে, কিংবা বাগানে বেড়াইতে যান।

রাজার চাকরদিগের সাধারণ নাম "খটনী" কিংবা ভাণ্ডারী। উপরে যে সকল চাকরের নাম করিলাম, তদ্ভিন্ন রাজার আরও অনেক "খটনী" আছে; তাহাদের প্রত্যেকের কর্ত্তব্য কাজ নির্দ্দিষ্ট আছে। একজন রাজার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদা পাণের বাটা লইয়া চলে, আর একজন পিকদানী লয়। একজন রাত্রে কিংবা স্নানের পূর্ব্বে রাজার গাত্রমর্দ্দন করে। একজন রাজার বিছানা করে, তাহাকে "সেজুয়া খটনী" বলে। রাজা

যখন রাত্রিকালে পালঙ্কে শয়ন করেন, তখন একজন "খটনী" তাঁহার পদতলে বসিয়া "পহরা" দেয়। সে ঘুমাইলে, আর একজন তাহার স্থান অধিকার করে। এইরূপে পাহারা বদল হয়। রাজা রাণীহংসপুরে শয়ন করিলে, সেখানে অবশ্যই "পহলী"গণ এই পাহারার কাজ করে। রাজার 'দেহলগা" পহলীকে "ফুল-বাই" বলে, সে রাজার বিশেষ অনুগ্রহপাত্রী। তাহার আবার পহলী আছে।

রাজা ও রাণীর জন্য রন্ধন পৃথক্ হয়, একজন ব্রাহ্মণী রসুই করে। রাজার ভাই, ছেলে, মেয়ে প্রভৃতির রসুই করে একজন "পণ্ডা"। রাজা যদি সদরে বা "দাণ্ডে" আহার করেন, তবে আর একজন ব্রাহ্মণ তাঁহার রসুই করে, তাহার উপাধি "পত্রী"। যে ভাণ্ডারী রাজার স্নানের জল দেয়, তাহাকে "পানি-আপট" বলে। একজন মালী প্রত্যহ রাজার পূজার সময় ফুল দেয়। উল্লিখিত পত্রী, রাজার রন্ধন করা ভিন্ন, রাজার ঠাকুর পূজার আয়োজন করিয়া দেয়। একজন পুরোহিত প্রত্যহ দেবার্চ্চ-নের সময় রাজার মাথায় তণ্ডুল ও হরিদ্রা দিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। রাজার পূজার সময় কাহালীওয়ালাগণ—(বাদ্যকর) "কাহালী" (এক রকম সানাই) বাজায়; আর তৈলঙ্গী বাদ্যও হয়। যত প্রকার ভাণ্ডারী আছে, তাহার মধ্যে প্রধান হইতেছেন "খানসামা"। রাজার তোষা-খানার ভার ইঁহার উপর। প্রত্যহ রাজার পরিধেয় ধুতি ধোবার বাড়ী দেওয়া হয়—একখানা ধুতি একবারের বেশী এক দিন পরা হয় না। এগুলি দেশী, লালপেড়ে, মোটা ধুতি। ইহার নাম "খটনী-নোগা"—ইহা "খটনী"দিগের প্রাপ্য। কিন্তু, রাজা দরবারে বসিলে, কিংবা বাহিরে বেড়াইতে গেলে, অন্যরকম পোষাক পরেন।

এই সকল গৃহ-ভৃত্য ভিন্ন রাজার আম্‌লা কর্ম্মচারীও অনেক; এক-জন পেস্কার—তাঁহার কাজ কতকটা 'প্রাইভেট সেক্রেটরী'র কাজের ন্যায়। একজন "বিষয়ী" বা দেওয়ান। একজন "বেবর্ত্তা", (ব্যবহর্ত্তা) ইঁহার

কাজ ব্যবহারশাস্ত্র অর্থাৎ আইন-কানুন সংক্রান্ত; অর্থাৎ মামলা-মোকদ্দমার তদ্বির করা। "ছামপট্টনায়ক," "ছামকরণ," তহশীলদার, নায়েব "কার্য্যী,"—ইহাদের কাজ আদায়-তহশীল করিয়া কতকাংশ রাজাকে দেওয়া, ও অধিকাংশ নিজেরা বাঁটিয়া লওয়া, আর সেই চুরি যাহাতে ধরা না পড়ে, সেজন্য মিথ্যা হিসাব প্রস্তুত করা। একজন "কৌড়ি ভাগিয়া" আছেন, তিনি পূর্ব্বকালে যখন কড়ির প্রচলন ছিল, তখন সেই কড়ি ভাগ করিতেন, এখন কড়ির অভাবে টাকাপয়সা ইহাঁর জিম্বায় থাকে আর একজনের নাম "মুদকরণ," ইহাঁর নিকট চাবি থাকে। রাজার যে সকল পাইক ও বরকন্দাজ আছে, তাহাদের যিনি সর্দ্দার, তাঁহাকে "দলবেহারা" বলে। প্রহরীদিগেরও উপাধি আছে—উত্তরকপাট, দক্ষিণকপাট, পশ্চিমকপাট ইত্যাদি। রাজার বাড়ীতে যে চৌকীদার রাত্রিকালে পাহারা দেয়, তাহার রাজদত্ত উপাধি হইতেছে "রণবিজলি"। রাজার নিকট প্রত্যহ পাঁজি কহিবার জন্য একজন জ্যোতিষী নিযুক্ত আছেন, তাঁহার উপাধি "খড়ীরত্ন"।

অন্যান্য রাজপরিবারের ন্যায় এই রাজপরিবারেও রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রই একমাত্র উত্তরাধিকারী। রাজার আর আর ছেলে থাকিলে, তাঁহারা কেবল খোরাক-পোষাক পাইয়া থাকেন। এই রাজার পিতার দুইটী ভাই ছিলেন, তাঁহারা এই নিয়মে দুইখানি গ্রাম খোরাক-পোষাক স্বরূপ পাইয়াছেন। তাঁহাদের বাড়ী ঘর পৃথক্।

পাঠক! এখন একবার আমাদের রাজা সেই ক্ষত্রিয়বর ব্রজসুন্দর-বিদ্যাধর-ভ্রমরবর-মানসিংহ-ভূমীন্দ্র-মহাপাত্র বাহাদুরের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়া দিব। ইহাঁর নামসদৃশ আকার, কিন্তু, আকারসদৃশী প্রজ্ঞা নহে। ইহাঁর শরীর একমাত্র জীবাণুতত্ত্ববিদের জ্ঞেয়, অণুবীক্ষণ-গোচর, জীবাণুর (Protoplasm) এক অদ্ভুত বিশাল পরিণতি। প্রসিদ্ধ 'জনবুল' গ্রন্থের লেখক বলেন, বিলাতে সকল শ্রেণীর লোকের পোষাকই এক

রকম ; তবে কে ছোট, কে বড়, তাহা কেবল সেই ব্যক্তির পরিধেয় পোষাকের মলিনতার তারতম্য দেখিয়া ঠিক করিতে হয়।* উড়িষ্যায়ও কে ছোট, কে বড়, তাহা ঠিক করিবার একটী মাপকাঠি আছে—সেইটী শরীরের মসৃণতা ও স্থূলতার তারতম্য। এই মাপকাঠি দিয়া মাপিলে, যে কোন ব্যক্তিই রাজাকে রাজা বলিয়া চিনিতে পারিবে, তাহার কিছুমাত্র সংশয় নাই। ক্ষত্রিয়বরের উদরটী তিন থাক্, মুখ দুই থাক্। মাথার কেশ ছোট করিয়া ছাঁটা, কিন্তু পশ্চাদ্‌ভাগে খোঁপা বা "গণ্ঠি" বাঁধার জন্য এক গোছা চুল লম্বা আছে। তাঁহার শরীরের বর্ণ কালোও নয় আবার তেমন ফরসাও নয়, মধ্যম রকমের। মাথাটী খুব বড়। মুখে খুব মোটা গোঁফ—দাড়ী কামানো, কিন্তু দুই দিকে, কাণের নীচে, জুলফী অনেক দূর পর্য্যন্ত নামিয়াছে। তাঁহার বয়স প্রায় ৫০ বৎসর। তাঁহার চক্ষু দুইটী কোটরগত, তাহাতে উজ্জ্বলতা একটুও নাই, তাহা বিলাসালসতা-ব্যঞ্জক, সর্ব্বদা ঢুলু ঢুলু। বোধ হয়, ইহা প্রত্যহ সিকি ভরি মাত্রায় অহিফেন সেবনের ফল।

এই রাজা তাঁহার পিতার পোষ্যপুত্র ছিলেন, তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে পোষ্যপুত্র করিয়াছিলেন। ইহাঁর বিদ্যাশিক্ষার জন্য তিনি একজন পণ্ডিত রাখিয়া দিয়াছিলেন। সেই পণ্ডিত প্রত্যহ আসিয়া তাঁহাকে "মণিমা! ক পড়িবা হন্তু" (হুজুর! ক পড়ুন।) "মণিমা! খ পড়িবা হন্তু" (হুজুর! খ পড়ুন!) এইরূপ রাজোচিত মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, অনেক দিন পর্য্যন্ত অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। সাত বৎসর অধ্যাপনার পরে, রাজা কোনক্রমে নিজের নামটী দস্তখত করা ও অমরকোষের একটী অধ্যায় মুখস্থ বলা, এবং উড়িয়া ভাষায় হস্তাক্ষর কোনক্রমে পড়িতে পারা পর্য্যন্ত বিদ্যালাভ

---

* The form of dress is the same in all classes ; it is only from the degree of dirtiness of an Englishman's coat that you can judge to which class he belongs."

করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার পিতা ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য যে একজন সর্দ্দার নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার নিকট তীর-চালা কতক কতক অভ্যাস করিয়াছিলেন। এই মূলধন পুঁজি করিয়া লইয়া, তিনি পিতার মৃত্যুতে ২৩ বৎসর বয়সে রাজ্যভার নিজের শিরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কোনরূপ ব্যয়ের অভাবে, তাঁহার এই মূলধন মজুদ থাকারই সম্ভব, তবে নিশ্চয়ই কোনরূপে স্নদে বাড়ে নাই!

সরস্বতীদত্ত বিদ্যার ন্যায় রাজার লক্ষ্মীদত্ত বিষয়বুদ্ধিও খুব অগাধ। তাঁহার বিষয়কার্য্যের সম্পূর্ণ ভার আমলাগণের উপর। আমলারা যাহা করে, তিনি তাহাই মঞ্জুর করেন,—যে পরামর্শ দেয়, তিনি তাহাই পালন করেন। তবে এ স্থলে কথা হইতে পারে, তাঁহার এতাদৃশ অগাধ বুদ্ধি সত্বেও, তাঁহার একমাত্র পুত্র নবঘন হরিচন্দনের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা কে করিল? তাহাতে রাজার কোন হাত নাই। ইহা তাঁহার বড়রাণী চন্দ্রকলা দেবীর (হরিচন্দনের মাতার) পরামর্শে ও কর্ত্তৃত্বে ঘটিয়াছে। চন্দ্রকলা দেবী আড়ম্বার রাজার দুহিতা; তাঁহার পিতা একজন বিচক্ষণ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। সুতরাং, তিনি যে নিজ পুত্রকে সুশিক্ষিত করিতে সবিশেষ যত্ন করিবেন, তাহতে আশ্চর্য্য কি?

আমাদের রাজা বিষয়কর্ম্ম অলোচনায় সম্পূর্ণ বিমুখ। তিনি রাজা হইয়া সাধারণ লোকের ন্যায় বিষয়কর্ম্মের আলোচনা করিবেনই বা কেন? আর তাঁহার সময়ই বা কোথায়? প্রত্যহ "রাজনিতি" চর্চ্চাতেই তাঁহার সময় অতিবাহিত হয়। পাঠক হয় ত মনে করিতেছেন, রাজা বার্ক, ব্রাইট, সেরিডেন, গ্লাডষ্টোন, প্রভৃতি বিখ্যাত রাজনীতিবিৎ পণ্ডিতগণের গ্রন্থের আলোচনা করেন। সেটা আপনাদের ভুল। রাজা যাহার চর্চ্চা করেন, তাহা "রাজনীতি" নহে "রাজনিত্তি" অর্থাৎ রাজার অবশ্যকরণীয় নিত্য-কর্ম্ম। সে নিত্য-কর্ম্ম কি, জানিতে ইচ্ছা করেন কি? তবে সংক্ষেপে বলিতেছি! পাঠক দেখিবেন, এই সমস্ত নিত্যক্রিয়ার প্রত্যেক-

টার এক একটা রাজোচিত নাম আছে। সে সকল নাম অন্ত লোকের মধ্যে প্রচলিত নাই।

প্রত্যুষে, ভোর পাঁচটার সময়, রাজা শয্যাত্যাগ করেন। তখনকার প্রথম কাজ "মুহপহলা" অর্থাৎ মুখ প্রক্ষালন। পরে "সলইকি বিজে" হওয়া অর্থাৎ পায়খানায় বিরাজমান হওয়া। সে সকল হইলে, "কাঠি-লাগি" অর্থাৎ দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দাঁত-ঘসা। দাঁত ঘসিয়া মুখ ধোয়াটা বৈঠকখানার বারান্দায় বসিয়া হয়। সেখানে একটা পিত্তলের কুণ্ড রাখা হয়, একজন খটনী জল ঢালিয়া দেয়, রাজা মুখ প্রক্ষালন করেন। এই সকল ঘটনাতে বেলা ৮টা বাজে। তৎপরে সেখানে বসিয়া "মর্দ্দন" আরম্ভ হয়—অর্থাৎ, এক পোয়া তিলের তৈল শরীরে মাখান হয়। এখানে বলিয়া রাখি, রাত্রে শয়নের পূর্ব্বেও এইরূপে তৈল দিয়া আর একবার "মর্দ্দন" হয়। মর্দ্দনের পর "পোছা"—একখানা গামছা দিয়া গা পোঁছা হয়। বেলা ৯টার সময় রাজার "নির্তিবঢ়ে" অর্থাৎ সাধারণ কথায়, স্নান হয়। স্নান-কার্য্যটা সেই বারান্দায় বসিয়াই সমাধা হয়, নচেৎ যে দিন খুসী হয়, রাজা তাঞ্জানে চড়িয়া পুষ্করিণীতে স্নান করিতে যান। স্নানের পর অবশ্যই "নোগাপিন্ধা" অর্থাৎ কাপড় পরা হয়। পরে বেলা ১০টার সময় বৈঠকখানায় বসিয়া রাজা দেবার্চ্চনা করেন। তখন নানা-রকম বাদ্য বাজান হয়। পূজাশেষে পুরোহিত আসিয়া মস্তকে তণ্ডুল-হরিদ্রা দিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। তৎপরে কিছুক্ষণ ভাগবত কিংবা গীতা শ্রবণ চলে।

অতঃপর রাজা ১১টার সময় "শীতল মুনিহিকুবিজে হস্তি" অর্থাৎ জল-খাবার ঘরে বিরাজমান হন। তোষাখানার একটা ঘরে জলখাওয়ার আয়োজন করা হয়। জলখাওয়ার পর কাছারিতে বিরাজমান হন। সেখানে আমলারা যে সকল কাগজপত্র উপস্থিত করে, তাহা কতক বুঝিয়া, কতক না বুঝিয়া, দস্তখত করেন; বরকন্দাজ ও পিয়াদাদের রুবকারী

শ্রবণ করেন ; প্রজাদের দরখাস্ত শুনিয়া, আমলাদের পরামর্শ অনুসারে, হুকুম দেন। এই সকল কাজ করিতে রাজা বড়জোর এক ঘণ্টার বেশী সময় পান না।

তৎপরে বেলা আন্দাজ দুই প্রহরের সময় রাজা "ঠাকুবিজে করন্তি" অর্থাৎ অন্তঃপুরে ভোজন করিতে যান। রাজার অন্তঃপুরে গমনাগমনের প্রণালী পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে, এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। খাওয়ার ঘরে পাচিকা ব্রাহ্মণী খাবার জিনিষ সকল সাজাইয়া রাখিয়া চলিয়া যায়। রাজা সেখানে গিয়া দরজা ভেজাইয়া দিয়া খাইতে বসেন। কখনও বা কোন রাণী, অর্থাৎ, সেই অন্তঃপুরের অধিষ্ঠাত্রী যিনি, তিনি সেখানে উপস্থিত থাকিতে পারেন।

বেলা ১টার সময় রাজার "ঠা বাহোড়া" হয়, অর্থাৎ, ভোজনঘর হইতে ফিরিয়া আসিয়া, রাণীর অঞ্চল দিয়া মুখ হাত মুছিয়া, "পহোড়কু বিজেহন্তি" অর্থাৎ শয়ন-গৃহে গিয়া শয়ন করেন। "পহোড়" আবার দুই রকমের—"চ্যা পহোড়" অর্থাৎ শুইয়া শুইয়া কথা বলা (বলা বাহুল্য, একজন পহলী তখন পদসেবা করিতে থাকে) আর ২নং "পহোড়" হই-তেছে শুইয়া নিদ্রা যাওয়া।

বেলা ৩ টার সময় নিদ্রাভঙ্গ হয়। তখন আবার "মুহপহলা," তার পর বৈঠখানায় বসিয়া এক ঘণ্টা খোসগল্প হয়, অর্থাৎ আত্মপ্রশংসা ও পর-নিন্দা শ্রবণ। অথবা, কোন দিন ইচ্ছা হইলে, তাঞ্জানে চড়িয়া বেড়াইতে যান। সন্ধ্যার পর রাত্রি ১০।১১টা পর্য্যন্ত বৈঠকখানায় বসিয়া পুরাণ-শ্রবণ, নাচ-দর্শন কিম্বা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সঙ্গে শাস্ত্রালাপ হয়। ইতি-মধ্যে একবার "শীতল মুনিহি"র (জলখাবার খাওয়ার) ব্যবস্থা আছে। রাত্রি ১১টার সময় "ঠাকুবিজে হন্তি" ; ১২টার সময় "ওয়াস্‌কুবিজেহন্তি" অর্থাৎ "রাণীহংসপুরে" শয়ন করিতে গমন করেন। কিন্তু কোন কোন দিন বৈঠকখানার মধ্যস্থ শয়নকক্ষেও শয়ন করেন।

এইরূপে রাজার "রাজনিতি" সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম। রাজা ব্রজসুন্দর এই সকল নিত্যক্রিয়া যথোচিতরূপে সম্পন্ন করেন। তাহার এক চুল এদিক্ ওদিক্ হওয়ার যো নাই। কারণ, এগুলি তাঁহার বিলাস-ব্যসনাসক্ত অলস প্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুকূল। এইবার রাজাকে পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। তাঁহাকে একবার নিজ নিজ চক্ষে দেখিয়া চক্ষু সার্থক করুন।

সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। রাত্রি প্রায় ৮টা। রাজা এখন বৈঠক-খানায় দরবারে বসিয়াছেন। বৈশাখ মাসের রাত্রি, বড় গরম। বিকালে মেঘ হইয়াছিল, কিন্তু হঠাৎ বাতাস হইয়া সে মেঘ উড়িয়া গিয়াছে। আকাশে ষষ্ঠীর চাঁদ মৃদুতরল জ্যোৎস্নারাশি বিকিরণ করিতেছে। চারি দিকে উজ্জ্বল তারকারাজি ফুটিয়াছে। বৈঠকখানার পশ্চাতে জ্যোৎস্না পড়িয়াছে, সম্মুখে অন্ধকার। ঘরের মধ্যে পশ্চিম দিকে রাজা একখানা বড় গালিচার উপরে বসিয়াছেন। তাঁহার তিন দিকে তিনটী বড় বড় "মাণ্ডি" (তাকিয়া), তাহার দুইটী গোলাকার, পশ্চাতেরটী লম্বা ও মোটা। রাজা পূর্ব্বমুখ হইয়া বসিয়াছেন। তাঁহার দক্ষিণ ধারে দুই খানা শতরঞ্চ পাতা—পশ্চিমের শতরঞ্চে রাজার "ভাইমানে" (অর্থাৎ জ্ঞাতিকুটুম্ব) পাঁচ জন বসিয়াছেন। পূর্ব্বের শতরঞ্চে রাজার "বেয়াদার" অর্থাৎ অন্ত্যজ (দাসীপুত্র) ভাই তিন জন ও খুড়া চারি জন বসিয়াছেন। ভাই ও বেয়াদারগণ দরবারের বেশ পরিধান করিয়াছেন; তাঁহাদের লম্বা চুল পশ্চাতে খোঁপা বাঁধা; লম্বা মোটা গোঁফ; দাড়ি কামানো। কানে মোটা মোটা সোণার "ঝুলী"। যাহারা অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক অর্থাৎ ২৫।৩০ বৎসরের, তাহাদের হাতে রূপার বালা, কোমরে রূপার গোট; দুই জনের গলায় সোণার হার। ইহাদের খালি গা; ধুতি "মাল-কোছা" মারিয়া পরা; কোমরে "কটারি" (ছোরা) বাঁধা। ইহাদিগকে রাজদরবারে হাঁটুগাড়া দিয়া গরুড় পক্ষীর মত বসিতে হয়।

রাজার বাম পার্শ্বে একখানা বড় শতরঞ্চ পাতা—তাহাতে ছয় জন আমলা বসিয়াছেন। আমলাদিগের মধ্যে "বিষয়ী"র (দেওয়ানের) সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। ইনি ছোটখাট লোকটী, গৌরবর্ণ, চুল পাকা, মাথায় খোঁপা বাঁধা, পরিধানে সরু কালো ফিতাপেড়ে ধুতি; এই বেজায় গরমের মধ্যেও একটী কালো আলপাকার কোট পরিয়াছেন, তাহার উপরে কয়েকটী সোণার মাদুলীযুক্ত মালা গলার সঙ্গে লাগিয়া আছে। আর সকল আমলার খালি গা।

আমলাদিগের শতরঞ্চের পূর্ব্বভাগে, রাজার কিঞ্চিৎ সম্মুখে অথচ দূরে একখানা ছোট শতরঞ্চ পাতা। তাহাতে একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বসিয়াছেন। ইনি শিখণ্ডীপুরের রাজার সভাপণ্ডিত, নাম আর্ত্তত্রাণ-শতপন্তী, উপাধি সভারত্ন। পণ্ডিতমহাশয়ের মস্তকে লম্বা একগোছা চুল, তাহা পশ্চাতে ছাড়িয়া দিয়ছেন, শরীর ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, বয়স প্রায় ৪০ বৎসর। দাড়ীগোঁফ কামানো। কানে দুইটী বড় বড় সোণার কুণ্ডল ঝুলিতেছে। গলায় এক দীর্ঘ রুদ্রাক্ষের মালা। পরিধানে এক জোড়া মূল্যবান সাদা গরদের ধুতি-চাদর। কোমরে একটী পাণের বোটুয়া ঝুলিতেছে।

বৈঠকখানার দ্বারদেশে দুই দিকে দুই জন বরকন্দাজ—লাল-পাগড়ী, খালি গা, হাতে ঢাল ও তলোয়ার।

রাজা এখন দরবারের বেশ পরিধান করিয়াছেন। তাঁহার পরি-ধানে একখানা পরিষ্কার সাদা সরু সিমলাই ধুতি, তাহার কালো-ফিতে পাড়। গায়ে মিরজী, তাহার বোতাম নাই, চাপকানের মত বাঁধা। মাথায় মিহি সাদা কাপড়ের একটি টুপি; তাহা মাথার কেবল উপরের অর্দ্ধাংশ ঢাকিয়াছে, পশ্চাতে লম্বা চুলের "গণ্ঠি" দেখা যাইতেছে। কানে সোণার কুণ্ডল প্রদীপের আলোতে ঝিকিমিকি করিতেছে। শরীরে এখন আর কোন সোণার গহনা নাই, বয়সের আধিক্য প্রযুক্ত অল্প দিন

হইল সোণার হার, হাতের বাজু ও বালা খুলিয়া রাখিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন দুই কাণে দুইটী ছোট ফুলের তোড়া গুঁজিয়াছেন।

রাজা তাকিয়া ঠেসান দিয়া বসিয়া অৰ্দ্ধনিমীলিতনেত্রে, আফিঙের মৃদুমন্দ নেশায় মধ্যে মধ্যে হাই তুলিতেছেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে সভাস্থ সকলে হাতে তুড়ী মারিতেছে। রাজা অলসভাবে বসিয়া থাকিলেও তাঁহার মুখের কিছুমাত্র অবসর নাই, তাহা অনবরত পাণের জাবর কাটি-তেছে। রাজার দক্ষিণে একজন "খটনী" সোণার বাটায় অনেকগুলি পাণ লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। বাম দিকে আর একজন খটনী সোণার পিকদানী হস্তে দণ্ডায়মান। রাজার পশ্চাতে একজন খটনী একখানা খুব বড় পাখা হস্তে বাতাস করিতেছে। ঘরের দুই পার্শ্বে পিলশুজের উপর দুইটী প্রদীপ জ্বলিতেছে—তাহার উপরে আবার "আড়ানি" দেওয়া, কারণ কোন ব্যক্তির ছায়া যেন রাজার গায়ে না পড়ে।

পণ্ডিতমহাশয় প্রথমতঃ সভাস্থ হইয়াই রাজাকে নিম্নলিখিত বাক্য উচ্চারণ-পূৰ্ব্বক আশীৰ্ব্বাদ করিলেন :—

বেদোক্ত মন্ত্রার্থাঃ সিদ্ধয়ঃ সন্তু,
পূর্ণাঃ সন্তু মনোরথাঃ।
শত্রূণাং বুদ্ধিনাশোঽস্তু
মিত্রাণামুদয়স্তব॥
ধনং ধান্যং ধরাং ধৰ্ম্মং
কীৰ্ত্তিমায়ুর্যশঃ শ্রিয়ং।
তুরগান্ দন্তিনঃ পুত্রান্
মহালক্ষ্মীঃ প্রযচ্ছতু॥

আশীৰ্ব্বাদ করিয়া ভেটস্বরূপ একটী খোসা-ছাড়ানো নারিকেল ফল রাজার হাতে দিলেন। রাজা যুগ্মহস্ত মস্তকে উত্তোলন করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিলেন ও হাত বাড়াইয়া সেই নারিকেলটী গ্রহণ করিলেন।

প্রথমতঃ উঠিয়া দাঁড়াইবার জন্য একটু চেষ্টাও করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রবল মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির তীব্র আকর্ষণে ও নিকটে ভারকেন্দ্র (Centre of Gravity) ঠিক রাখিবার লোক উপস্থিত না থাকাতে আবার বসিয়া পড়িলেন। পণ্ডিতজীও "থাউ—থাউ" (থাকুক, থাকুক) বলিয়া চীৎকার করিয়া, ব্যগ্রতা সহকারে রাজাকে সেই দুঃসাহসের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে নিষেধ করিয়া, নিজে আসন পরিগ্রহ করিলেন। রাজাকে উঠিবার উদ্যোগী দেখিয়া, সভাস্থ পাত্রমিত্র ও ভাই বেরাদারগণ আগেই উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহারা নিজেদের শ্রমটা পণ্ড হইল দেখিয়া, হতাশ মনে যে যাহার স্থানে বসিয়া পড়িলেন।

তখন রাজা পণ্ডিতজীকে বলিলেন, "আজ আমার বড় শুভদিন, আপনি শিখণ্ডীপুরের মহারাজার সভাপণ্ডিত,—আপনার ন্যায় দেশ-বিখ্যাত পণ্ডিতের আজ দর্শন মিলিল।"

পণ্ডিত। মহারাজ! মহর্ষি মনু বলিয়াছেন, অতিশয় পুণ্য সঞ্চয় হইলে তবে রাজাদিগের দর্শনলাভ হয়। মহারাজের "চ্ছামকু" (১) দর্শন মেলা আমার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বহু পুণ্যের ফল বলিতে হইবে। শাস্ত্রে আছে. "রজা হউছন্তি বিষ্ণুস্কর অবতার" (২) – গীতায় আছে—

"শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে"

যে সকল মহাত্মামানে যোগ হইতে ভ্রষ্ট হন, তাঁহারাই পুণ্যবলে রাজবংশে "রজা" হইয়া জন্মলাভ করেন।"

এই সকল স্তুতিবাদ শ্রবণ করিয়া, রাজা একটু সোজা হইয়া বসিলেন। তাঁহার মুখ হর্ষপ্রফুল্ল হইল—কৃষ্ণবর্ণ দন্তগুলিও কিঞ্চিৎ দেখা গেল। তাঁহার পার্শ্বে যে ভৃত্যটী পাণের বাটা হস্তে দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকে ইঙ্গিত করাতে সে পাণের বাটা আনিয়া সম্মুখে ধরিল, রাজা পণ্ডিতজীকে একটী

(১) রাজাকে "চ্ছাম" কিম্বা "মণিমা" বলিয়া সম্বোধন করিতে হয়।

(২) রাজা হইতেছেন বিষ্ণুর অবতার।

পাণ অর্পণ করিলেন ও নিজে আর একটী মুখবিবরে নিক্ষেপ করিলেন। পণ্ডিতজী উঠিয়া আসিয়া সেই রাজদত্ত প্রসাদ সযত্নে দুই হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিলেন।

পণ্ডিতজী তখন আবার বসিয়া বলিতে লাগিলেন—

"চ্ছাম, অবধান করিবা হন্তু—(১)
হিমাচলো মহাগিরিশ্চন্দ্রমৌলিস্তথৈবচ।
হিমালয়ে হরো রাজা চন্দ্রে ত্বং ব্রজসুন্দরঃ॥
রঘুরিব প্রজাপালঃ অর্জ্জুনইব বীর্য্যবান্।
সুধাংশুরিব তে কীর্ত্তিঃ দাতা ত্বমসি কর্ণবৎ॥

মহারাজ! এই পৃথিবীতে দুইটী মাত্র মহাগিরি আছে—একটী হিমালয়, আর একটী এই চন্দ্রমৌলি পর্ব্বত। হিমালয়ে "রজা" হইতেছেন মহাদেব—আর চন্দ্রমৌলি পর্ব্বতে "রজা" হইতেছেন শ্রীশ্রীমহারাজ ক্ষত্রিয়বর-ব্রজসুন্দর-বিদ্যাধর-ভ্রমরবর-মানসিং-ভুমীন্দ্র-মহাপাত্র বাহাদুর। আপনি কিরকম "রজা"? না, সূর্য্যবংশীয় নরপতি রঘুর ন্যায় আপনি প্রজাপালক। কালিদাস বলেন "স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ" অর্থাৎ রঘুরাজাই তাঁহার প্রজাদিগের "প্রক্রত" পিতা ছিলেন, প্রজাদিগের নিজ নিজ পিতা কেবল তাহাদিগকে জন্ম দিয়াছিল মাত্র। "এতাদ্রুশ" প্রজাপালক যে রঘু "রজা", তাঁহার ন্যায় আপনি প্রজাদিগের পালনকর্ত্তা! আর মহাপরাক্রমশালী বীর অর্জ্জুনের ন্যায় আপনি বীর্য্যবান্। আর আপনার যশঃকান্তি চন্দ্রের ন্যায় ধবল। আর আপনি কর্ণের ন্যায় দাতা। কর্ণ নিজ পুত্রকে—"

ঠিক এই সময়ে বাহিরে একটা কোলাহল শুনা গেল। কতকগুলি লোক বৈঠকখানার সম্মুখে আঙ্গিনায় আসিয়া, হাত পা ছড়াইয়া, অধোমুখে সটান মাটিতে শুইয়া পড়িয়া, সমস্বরে চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল—

(১) মহারাজ! অবধান করা হউক।

"মণিমা! রক্ষা করিবা হন্ত! আম্ভেমানে হজুরঙ্কর কলসপুর মৌজার প্রজা—তহশীলদার বাঞ্ছানিধি মাহান্তি আম্ভমানঙ্কর সত্ত্বনাশ কলে-- খাইবা বিনা আম্ভমানঙ্কর পেলা কুটুম মরি যাউছন্তি, সে জুলুম করি কিরি ডবল খজনা আদায় করুছন্তি—এ বর্ষ মরুড়িরে সবু ধান মরি গলা— আম্ভেমানে কোঁয়াড়ু এতে টঙ্কা দেবুঁ—মণিমা আপন মা বাপ—হুজুর-চ্ছামকু শরণ পশিলুঁ—আপন ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির—ধর্ম্ম বুঝাপনা হউ!" (১)

রাজা কোনও কথা বলিবার পূর্ব্বেই রাজার "বিষয়ী" (দেওয়ান) শ্যামবন্ধু পট্টনায়ক, বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া গিয়া, প্রজাদিগকে খুব শক্ত এক ধমক দিলেন—"কাঁহিকি পাটি করুছুঁ—ছড়া দুষ্ট লোক গুড়া—আবিকা রজাঙ্কর দরবার হউচি—উঠি যা—মিচ্ছারে ওজোর করিবাকু আউচ্ছুঁ— খজনা ন দেই কিরি মাগনা জমি খাইবুঁ—উঠি যা—ছড়া"—(২)

তখন দ্বারদেশে বর্ত্তমান সেই দুই জন দ্বারবান নামিয়া আসিয়া, লোকগুলিকে অর্দ্ধচন্দ্র প্রদানপূর্ব্বক নিঃসারিত করিয়া দিল। রাজা জড়পিণ্ডবৎ বসিয়া থাকিয়া এই সকল কার্য্যের নিঃশব্দ অনুমোদন করিলেন।

তখন পণ্ডিতজীর সঙ্গে আবার কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। পণ্ডিতজী

(১) মণিমা! রক্ষা করা হউক। আমরা হুজুরের কলসপুর মৌজার প্রজা— তহশীলদার বাঞ্ছানিধি মহান্তি আমাদের সর্ব্বনাশ করিলেন। খাইতে না পাইয়া আমাদের স্ত্রী পুত্র মরিয়া যাইতেছে—তিনি জুলুম করিয়া ডবল খাজানা আদায় করিতেছেন। এই বৎসর অনাবৃষ্টিতে সব ধান মরিয়া গিয়াছে, আমরা কোথা হইতে এত টাকা দিব? মণিমা! আপনি মা বাপ—হুজুরের নিকট শরণ পশিলাম—আপনি ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির—ধর্ম্ম বিচার হউক!

(২) শালারা—কেন গোল করিস্—দুষ্ট লোকগুলা—এখন রাজার দরবার হই-তেছে—উঠিয়া যা—মিছা মিছি ওজোর করিতে আসিয়াছিস্—খাজানা না দিয়া মাগনা জমি খাইবি? উঠিয়া যা শালারা!

ভাগবতের একটী শ্লোক আবৃত্তি করিয়া, তাহার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইতেছিলেন, এই সময়ে পশ্চাৎ হইতে একটি লোক আসিয়া রাজাকে কি ইঙ্গিত করিল। তখন রাজা পণ্ডিতজীকে ২৫ টাকা বিদায় ও এক জোড়া গরদের ধুতি পারিতোষিক দিতে আদেশ দিলেন। পণ্ডিতজী মহা খুসী হইয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে গাত্রোত্থান করিলেন, এবং রাজার দিকে মুখ রাখিয়া, পিছু হাঁটিয়া দরবার-গৃহ হইতে নিক্রান্ত হইলেন। অন্যান্য সকলেও দরবার ভঙ্গ করিয়া সেই ভাবে পিছু হাঁটিয়া ঘরের বাহিরে গেলেন। তখন ঘরে কেবল রাজা একাকী রহিলেন। আর সেই লোকটীও আসিল। রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কি সংবাদ ?

সে বলিল—"হুজুর! সংবাদ ভাল। হুজুরের আশীর্ব্বাদে আমি আর একটী লোক পাইয়াছি—খুব সুন্দরী, বয়সও অল্প—কিন্তু—"

"কিন্তু কি ?"

"সে রাজি হবে কিনা, সন্দেহ!"

"কেন, যত টাকা লাগে দিয়া তাহাকে আন।"

"হুজুরের যে হুকুম--কিন্তু দুইশত টাকার কমে হবে না।"

"আচ্ছা, তাই নিয়া যাও,—কবে আনিবে ?"

"কাল আনিতে "চেষ্টা" করিব।"

"চেষ্টা কেন ? কালই আনিতে হইবে।"

ইহা বলিয়া রাজা অন্তঃপুরে যাইবার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন।
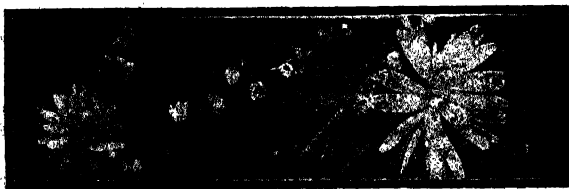
দ্বিতীয় অধ্যায়।

শ্রীশ্রীকল্যাণেশ্বর মহাদেব।

দূর হইতে চন্দ্রমৌলি পাহাড়ের পশ্চিম দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, কেবল কতকগুলি অবিরল-সন্নিবিষ্ট গাঢ়-শ্যামবর্ণ বৃক্ষশ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। আর একটু নিকটে অগ্রসর হইলে দেখিবে, সেই শ্যামল বৃক্ষশ্রেণী ভেদ করিয়া, একটী ত্রিশূল-শোভিত মন্দিরের চূড়া আকাশের পানে উঠিয়াছে। আরও নিকটে যাও দেখিবে, সেই তরুরাজির মধ্য দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া একটী অতি প্রশস্ত পথ ঊর্দ্ধদিকে উঠিয়াছে, আর তাহার দুই ধারে গাছগুলি বিচ্ছিন্নভাবে একটীর উপরে আর একটী থাকে থাকে উঠিয়াছে। সেই পথ দিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলে একটী বৃহৎ দেব-মন্দির ও তৎসংলগ্ন একটী ক্ষুদ্র পল্লী আবিষ্কৃত হইবে। এই মন্দিরে শ্রীশ্রীকল্যাণেশ্বর মহাদেব বিরাজমান, এই গ্রামটীর নাম কল্যাণপুর মন্দিরটী চন্দ্রমৌলি পাহাড়ের সংলগ্ন ও পার্শ্বদেশে অবস্থিত।

মন্দিরটী প্রস্তরনির্ম্মিত, পাহাড়ের সঙ্গে গাঁথা। তাহাতে উঠিবার জন্য সুবিস্তৃত ও সুপ্রশস্ত সোপানশ্রেণী বিদ্যমান। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে থরে থরে সাজান বৃক্ষশ্রেণী। চারিদিকের ফুলগাছে চাঁপা, নাগকেশর

করবীর, টগর, জবা প্রভৃতি ফুল এবং বন্যলতায় নানাবর্ণের বনফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। পাহাড়ের শৃঙ্গ হইতে একটী নির্ঝরধারা শুষ্ক পত্ররাশির মধ্য দিয়া ধীরে নীরবে অবতরণ করিয়া মন্দিরের সম্মুখে একটী প্রস্তরময় বাপীর মধ্যে অলক্ষিতভাবে সঞ্চিত হইতেছে ও সেই জল তাহার মধ্য হইতে একটী পিত্তলনির্ম্মিত ব্যাঘ্রমুখ নলের দ্বারা সশব্দে তীব্রবেগে মন্দিরপাদ-প্রান্তে উদ্গীর্ণ হইতেছে। এই নির্ঝরবারি স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ ও নির্ম্মল—যেন দ্রুত-রজতধারা প্রবাহিত হইতেছে। সেই সুশীতল বারিশীকরস্পর্শে সমস্ত উপবনটী প্রচণ্ড মধ্যাহ্নকালেও সুস্নিগ্ধ। এখানে প্রায়ই সূর্য্যের আলো প্রবেশ করিতে পারে না। ইহা পাহাড়ের পশ্চিম দিকে অবস্থিত বলিয়া বেলা দুই প্রহরের পূর্ব্বে এখানে সূর্য্যের মুখ দেখা যায় না। সূর্য্য মস্তকের উপর আসিলে বৃক্ষরন্ধ্রের মধ্য দিয়া যে অল্প আলোকরেখা প্রবেশ করে, তাহা শ্যামবর্ণ পত্ররাজির উপরে নিপতিত হওয়াতে এক প্রকার স্নিগ্ধ তরল শ্যামল ছায়াময় আলোকে সমস্ত উপবন আলোকিত হয়। তখন সেই শ্যামোজ্জ্বল আলোকপ্রবাহে, শ্বেত, পীত, নীল, লোহিত প্রভৃতি নানাবর্ণের পুষ্পগুলি, মৃদু বায়ুবিধূননে, হেলিয়া দুলিয়া ভাসিতে থাকে। উপবনের শান্তিময় গম্ভীর নিস্তব্ধতা সেই বারিধারা পতনের ঝঙ্কৃতনিনাদে ভগ্ন হইয়াছে। আর থাকিয়া থাকিয়া ময়ূরের কর্কশধ্বনি, কোকিলের পঞ্চমতান, পাপিয়ার স্বরলহরীও অন্যান্য পক্ষীর স্বরে সেই বনভূমি কম্পিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীকল্যাণেশ্বর মহাদেবের মন্দিরটী এই সুরম্য উপবনের ক্রোড়ে অবস্থিত। মন্দিরটী বহু প্রাচীন, এখন প্রায় জীর্ণ হইয়াছে। বাহিরের গায়ে প্রস্তরগুলি স্থানে স্থানে স্খলিত হইয়াছে। মন্দিরের ভিতরে ঘোর অন্ধকার, এমন কি দিবা দুই প্রহরে আলো ব্যতিরেকে প্রবেশ করা কঠিন। ভিতরে প্রবেশ করিয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতে হয়। নামিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলে, মন্দিরের মধ্যস্থলে একটী সুচিক্কণ কৃষ্ণ প্রস্তর-

নির্ম্মিত বৃহৎ বাণলিঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই কল্যাণেশ্বর মহাদেবের মূর্ত্তি।

কল্যাণেশ্বর মহাদেব জাগ্রত দেবতা। এই অঞ্চলের আবালবৃদ্ধবণিতা সকলে তাঁহাকে ভয় ও ভক্তি করে। প্রতি বৎসর শিবরাত্রির সময়ে এখানে সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হয় ও সাত দিন পর্য্যন্ত একটী মেলা বসে। অন্য সময়েও দেশ বিদেশ হইতে অনেক যাত্রী দেবদর্শনে আসিয়া থাকে।

মন্দিরের নিম্নে কল্যাণপুর গ্রামে ৮।১০ ঘর সেবক ব্রাহ্মণের বাস। তাঁহারা এই ঠাকুরের সেবা পূজা করেন। কনকপুরের কোন এক পূর্ব্বতন রাজা এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণপল্লী স্থাপন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের নামে ৫০ মান (একর) জমি "খঞ্জা" আছে, তদ্দ্বারা ব্রাহ্মণগণ ঠাকুরের সেবা ও নিজ নিজ সেবা নির্ব্বাহ করেন; এই ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ-পল্লীতে বিনন্দ পণ্ডার বাস।

বেলা এক প্রহর হইয়াছে, কিন্তু এখনও কল্যাণপুরগ্রামে সূর্য্যের আলোক প্রবেশ করে নাই। সূর্য্যের মুখ দেখা না গেলেও সম্মুখবর্ত্তী প্রান্তর হইতে তাঁহার কিরণের প্রভা উদ্ভাসিত হইয়া গ্রাম আলোকিত করিয়াছে। বিনন্দ পণ্ডা তাঁহার ঘরের পিণ্ডায় বসিয়া তালপত্রে উড়িয়া ভাগবতগ্রন্থ নকল করিতেছেন। পিণ্ডার নীচে একটী গরু বাঁধা আছে, সে খড় খাইতেছে। ঘরের সম্মুখে কয়েকটী আম ও কাঁটাল গাছে অনেক ফল ধরিয়াছে। এক ঝাঁক বানর সেই আম গাছে বসিয়া কাঁচা আমের সর্ব্বনাশ করিতেছে। পণ্ডা ঠাকুর এক একবার উঠিয়া গিয়া "হো—হো—মলা—মলা" রবে তাহাদিগকে তাড়া করিতেছেন, কিন্তু তাহারা আবার আসিয়া বসিতেছে ও ঠাকুরের দিকে তাকাইয়া দাঁত খিচাইতেছে। বিনন্দের বয়স প্রায় ৩৫ বৎসর, চেহারা গৌরবর্ণ, খর্ব্বাকৃতি। মাথায় লম্বা চুল, বুকের লোমও বিলক্ষণ লম্বা। তাঁহার ঘরে

একমাত্র স্ত্রী—তাঁহার বয়স ১৮ বৎসর। বিনন্দ তাঁহাকে দশ বৎসর পূর্ব্বে বিবাহ করিয়াছিলেন; কিন্তু ব্রাহ্মণ জাতির রীতি অনুসারে তাঁহাকে ৬ বৎসর পিত্রালয়ে থাকিতে হইয়াছিল—পুনর্ব্বিবাহের পর আজ দুই বৎসর হইল স্বগৃহে আনিয়াছেন।

অন্যান্য সেবকদিগের সহিত ভাগ বণ্টনে বিনন্দ কেবল দুই মান দেবোত্তর জমি পাইয়াছেন। ইহাই তাঁহার একমাত্র উপজীবিকা। এই জমির উৎপন্ন হইতে মাসের মধ্যে পাঁচ দিন তাঁহাকে মহাদেবের অন্ন-ভোগ দিতে হয়। এতদ্ভিন্ন নিজের গৃহে পৈত্রিক কুলদেবতা শ্রীশ্রীলক্ষ্মী জনার্দ্দন বিগ্রহও আছেন। তাঁহাকেও প্রত্যহ পূজা করিতে হয় ও ভোগ দিতে হয়। তবে এই গৃহদেবতার ভোগ দেওয়া বড় কঠিন কথা নহে। তাঁহার স্ত্রী তাঁহাদের উভয়ের ভোজনের জন্য প্রত্যহ যে অন্ন ব্যঞ্জন রন্ধন করেন, তাহাই প্রথমে এই বিগ্রহের নিকট নিবেদন করা হইলে, তাঁহারা সেই প্রসাদ ভোজন করেন। ইহা ছাড়া বিনন্দের কয়েকঘর যজমানও আছে। তাহাদের বাড়ীতে শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে মাসে আট আনা কিম্বা এক টাকা প্রাপ্তি ঘটে। এই পৌরহিত্য ব্যবসায়ে তিনি খুব পটু। অর্থাৎ অর্থ না বুঝিয়া অনেক গুলি মন্ত্র তন্ত্র আওড়াইতে পারেন, আর মহিম্নস্তোত্র ও বিষ্ণুর সহস্র নাম বেশ সুর করিয়া পড়িতে পারেন, এবং গীতগোবিন্দের দুই একটী শ্লোকও তাঁহার কণ্ঠে বিরাজ করে। তাঁহার হাতের লেখাটী ভাল, তিনি খুব দ্রুতবেগে তালপত্রে লিখিতে পারেন। সেজন্য ভাগবত পুঁথি নকল করিয়া বিক্রয় করাতে তাঁহার কিঞ্চিৎ লাভ হয়। মোট কথা, এই ব্রাহ্মণটী এক হিসাবে খুব দরিদ্র, কিন্তু অন্য আর এক হিসাবে খুব ঐশ্বর্য্যশালী। তাঁহার স্ত্রী সাবিত্রীদেবী অসাধারণ রূপলাবণ্যবতী। বিনন্দের দোষের মধ্যে এই, তাঁহার বুদ্ধিটা বড় মোটা।

বিনন্দ পণ্ডা বানর তাড়াইয়া আসিয়া আবার সেই লেখনীহস্তে

পিণ্ডার উপরে বসিলেন, এমন সময়ে দুইজন লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। বিনন্দ তাহাদিগকে বসিতে বলিবার পূর্ব্বেই তাহারা পিণ্ডার উঠিয়া বসিল ও তন্মধ্যে দৈত্যারি দাস নামক এক ব্যক্তি এইরূপে কথা আরম্ভ করিল। "পণ্ডা! এ কি করিতেছ?"

বিনন্দ তাঁহার লেখনী ও তালপাতা রাখিয়া বলিলেন "কেন? ভাগবত লিখিতেছি।"

"ভাগবত লিখিয়া তুমি পাও কি?"

"এক একটী অধ্যায় লিখিয়া দুই পয়সা পাই।"

"একটী অধ্যায় লিখিতে কত সময় লাগে?"

"তা শ্লোক সংখ্যা বুঝিয়া—তবে এক দিনে একটী অধ্যায় শেষ হইতে পারে।"

"এক দিন পরিশ্রম করিয়া, তুমি পাইলে মাত্র দুই পয়সা, মাসে পাইলে প্রায় এক টাকা! আচ্ছা একশ টাকা এইরূপে রোজগার করিতে তোমার কত দিন লাগিবে?"

এতগুলি টাকা তাঁহার দ্বারা রোজগার হইবার সম্ভাবনা শুনিয়া বিনন্দের মুখে একটু হাসি দেখা দিল। তিনি দন্ত বাহির করিয়া বলিলেন "কেন? এ কথা জিজ্ঞাসা কর কেন? এত টাকা রোজগার করা আমার এ জীবনেও ঘটিবে না! আমি গরিব ব্রাহ্মণ!"

দৈত্যারি একটু অগ্রসর হইয়া বসিয়া বলিল "আচ্ছা, যদি তুমি একসঙ্গে একশ টাকা আজই পাও, তবে তোমার কেমন লাগে?"

বিনন্দ ঈষৎ কোপ প্রকাশ করিয়া বলিল—"তুমি আমাকে ঠাট্টা কর কেন? আমি একশ টাকা আজ কোথায় পাব? তুমি দিবে নাকি?"

দৈত্যারি হৃষ্টচিত্তে বলিল—"হাঁ আমিই দিব—বাস্তবিক ঠাট্টা নয়—আমি যথার্থই তোমাকে একশ টাকা আজ —এখনই—দিতে পারি, যদি তুমি আমার একটা কথা রাখ।"

ইহা বলিয়া দৈত্যারি দাস ঝনাৎ করিয়া একটা টাকার তোড়া বাহির করিয়া বিনন্দের সম্মুখে রাখিল।

কোন চির-অনশনগ্রস্ত ব্যক্তির সম্মুখে এক থালা অন্ন ব্যঞ্জন রাখিলে তাহার জিহ্বায় যেমন জল আসে, সেই টাকার তোড়া দেখিয়া বিনন্দের জিহ্বায়ও জল আসিল। সে এক সঙ্গে এত টাকা এজীবনে কখনও দেখে নাই, তাই সতৃষ্ণ নয়নে পুনঃপুনঃ সেই তোড়ার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। তাহার এই অবস্থা দেখিয়া দৈত্যারি ভাবিল, বঁড়শি মাছে ঠোকরাইতেছে, এবার টান দিলেই হয়। সে বলিল—

"কি দেখিতেছ? টাকা গুলি নেবে? যদি আমার কথা মত কাজ কর, তবে এখনি এগুলি তোমাকে গণিয়া দিতেছি।"

বিনন্দ হাসিয়া বলিল—"আমাকে কি করিতে হইবে বল না?"

তখন দৈত্যারি তাহার কাণের কাছে মুখ লইয়া অস্ফুটস্বরে কি বলিল। তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া এক হাত দূরে গিয়া সরিয়া বসিল। তাহার মুখ বিবর্ণ হইল। সে ক্রোধভরে বলিল—

"তুমি কেন এরূপ জাতি যাওয়ার কথা বল? তুমি কেন এখানে আসিয়াছ? তুমি এখনই চলিয়া যাও। আমার দ্বারা কখনই সে জাতি যাওয়ার কাজ হবে না।"

দৈত্যারি বলিল "আরে ঠাকুর রাখিয়া দাও তোমার জাতি! তুমি ত কোথাকার এক সেবক ব্রাহ্মণ—কত কত শাসন (১) ব্রাহ্মণ, শ্রোত্রিয়-ব্রাহ্মণ রাজার নিকট তাহাদের ভার্য্যা পাঠাইয়া দিয়া থাকে। কেন, তুমি মাধব মিশ্র, মায়াধর সতপথী, রত্নাকর ষড়ঙ্গী ইহাদের কথা জান না? ইহারা বরং ইহাতে বিশেষ গৌরব মনে করে। আর তোমার এত ভয় কেন—রাজাইত তোমার জাতি দিবার ও জাতি লইবার মালিক। আর

(১) যে সকল বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে উড়িষ্যার পূর্ব্বতন রাজারা গ্রাম দান করিয়া স্থাপিত করিয়াছিলেন তাহাদিগকে শাসন-ব্রাহ্মণ বলে। শাসন অর্থ রাজদত্ত দানপত্র।

রাজা ত তোমার ভার্য্যাকে রাখিয়া দিবেন না, আজই রাত্রে আমি পাল্‌কি করিয়া রাখিয়া যাইব, কেহ একথা জানিতেও পারিবে না।”

এই প্রবোধবাক্যে বিনন্দের মুখ আবার একটু প্রসন্ন হইল। ইহার মধ্যে টাকার তোড়াটার উপরে তাহার একবার দৃষ্টি পড়িল। সে বলিল—“আমার ভার্য্যা ইহাতে সম্মত হইবে না।”

তখন দৈত্যারি আবার ধমক দিয়া বলিল—“দেখ পণ্ডা, তুমি এখন রাজার এলাকায় বাস কর, রাজার দত্ত জমি খাও, আজই ইচ্ছা করিলে রাজা তোমার ঘরবাড়ী ভাঙ্গিয়া দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতে পারেন, আর তোমার জমিটুকু কাড়িয়া লইতে পারেন। তুমি বিবেচনা করিয়া কথা বল। রাজার হুকুম, তুমি সম্মত না হইলে তোমাকে ধরিয়া লইয়া যাইব।”

বিনন্দ সভয়ে বলিল—“আমি কি নাস্তি করিতেছি? আমার ভার্য্যা যদি আমার কথা না শুনে?”

“আরে তোমার ভার্য্যা তোমার কথা শুনিবে না, সে কি কখনও সম্ভব? তুমি তাহাকে বলিয়া দেখ না কেন? যাও একবার ঘরের ভিতরে যাও—আর এই টাকার তোড়াটাও হাতে করিয়া লইয়া যাও।”

ইহা বলিয়া দৈত্যারি টাকার তোড়াটা ঘরের দরজায় রাখিয়া দিল। বিনন্দ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাকে বেশী দূর যাইতে হইল না। তাহার স্ত্রী সাবিত্রী বাসন মাজা শেষ করিয়া, সে গুলি রাখিবার জন্য ঘরে আসিয়াছিলেন। তিনি বাহিরে কি কথাবার্ত্তা হইতেছিল তাহা শুনিবার জন্য কপাটের আড়ালে উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। বিনন্দকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া তাহাকে ডাকিয়া লইয়া অন্তঃপুরের আঙ্গিনায় গেলেন।

সাবিত্রীদেবীর পরিধানে একখানা নীল রঙ্গের “কচ্ছ”-সাড়ী, হাতে পায়ে সামান্য রকমের সিসের গহনা—গলায় একছড়া রূপার মালা। তাঁহার পরিহিত বস্ত্রের মধ্য দিয়া উজ্জ্বল লাবণ্যছটা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তিনি বিনন্দকে বলিলেন—

"ও কি কথা হইতেছিল? ঐ টাকা কিসের?"

বিনন্দ সন্ত্রস্তভাবে বলিল "কেন তুমি ত দাঁড়াইয়া সব কথা শুনিয়াছ। এই এক বিপদ উপস্থিত—"রজা" আমার ভিটা মাটি উচ্ছন্ন দিতে বসিয়াছেন—ইহার কি করা যায়?"

সাবিত্রী। কেন? তুমি ত আমাকে ঐ একশ টাকায় বিক্রয় করিয়াছ! তোমার আর বিপদ কি? তোমার এই রকম বুদ্ধি না হইলে, আমার কপালে আর এই দুর্দ্দশা ঘটিবে কেন?"

ইহা বলিতে বলিতে সাবিত্রীর কণ্ঠ আর্দ্র হইল—চক্ষে জল আসিল। তিনি অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিলেন।

বিনন্দ বলিল—"আমি কি সাধ করিয়া এই জাতি যাওয়ার কথায় সম্মত হইয়াছি? তিনি হইতেছেন রজা—"দুর্ব্বল" (১) হাকিম—তাঁহার কাছে আমার কি বল আছে? আজ যদি উহারা তোমাকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া যায়, তবে সাধ্য কি যে আমি তোমাকে রাখিতে পারি?"

সাবিত্রী। তাই বুঝি টাকার লোভে, আপন খুসিতে আমাকে বেচিয়া ফেলিতেছ? ধিক্ তোমারে! আর তোমারই বা দোষ দিই কেন? দোষ আমার কপালের।

বিনন্দ। তবে এখন উপায়? আমিত বাহিরে গেলেই উহারা আমাকে ধরিয়া লইয়া যাইবে।

সাবিত্রী। তুমি তোমার নিজের পথ দেখ—তুমি নিজে পলাইয়া প্রাণ বাঁচাও—আমার পথ যাহা আছে তাহা আমি জানি।

ইহা শুনিয়া বিনন্দ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া রহিল, অনেক্ষণ "ন যযৌ ন তস্থৌ" ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, আস্তে আস্তে রসুই ঘরের এক পার্শ্বে কুকুরের মত গিয়া বসিল। দৈত্যারির নিকট বাহির হইতে তাহার সাহসে কুলাইল না। সাবিত্রী সেই আঙ্গিনায় বসিয়া নিঃশব্দে রোদন

(১) দুর্ব্বল অর্থাৎ দুষ্ট বল যাহার, অত্যাচারী, প্রবল।

করিতে লাগিলেন, ও আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য নানা রকম চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এদিকে ব্রাহ্মণের দেরী দেখিয়া দৈত্যারি দাস দাণ্ড হইতে ডাকা ডাকি হাঁকাহাঁকি করিতে লাগিল। কোন সাড়াশব্দ নাই। কতক্ষণ পরে সাবিত্রী উঠিলেন, তাঁহার চক্ষে তখন জল নাই—দৃষ্টি স্থির, মুখ গম্ভীর। তিনি উঠিয়া গিয়া ঘরের মধ্য হইতে সেই টাকার তোড়া দরজা দিয়া বাহিরে ঝনাৎ করিয়া সজোরে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন ও দরজা বন্ধ করিয়া ফেলিলেন। দৈত্যারির সম্মুখে হঠাৎ যেন একবার তড়িৎপ্রভা চমকিয়া গেল সে সভয়ে চক্ষু মুদিল। পরক্ষণেই সে সাবিত্রীর এই ব্যবহার দেখিয়া তেলে বেগুনে জলিয়া উঠিল এবং ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিনন্দ ও তাহার স্ত্রীকে নানা প্রকার অশ্রাব্যভাষায় গালি দিতে লাগিল। দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করিবে এরূপ ভয়ও দেখাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে, নিতান্ত অসহ্য বোধ হওয়ায় সাবিত্রী আস্তে আস্তে দরজা খুলিলেন ও অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া স্থির গম্ভীর অথচ আর্দ্র-কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—

"দেখ, তুমি কি ভয় দেখাইতেছ? তুমি নিশ্চয় জানিও, যে সতী রমণী তাহার নিজের ধর্ম্ম রাখিতে চায়, কেহই তাহার ধর্ম্ম নাশ করিতে পারে না। এ সংসারে ধর্ম্ম কি একবারেই নাই? তুমি যদি এখন বেশী বাড়াবাড়ি করিবে, তবে নিশ্চয়ই আমি আত্মহত্যা করিব। আর তোমাকে একথাও বলি, আমি যদি যথার্থ সতী হই, কল্যাণেশ্বর মহা-প্রভুকে যদি আমি যথার্থ ভক্তিপূর্ব্বক সেবা করিয়া থাকি, তবে তুমি নিশ্চয় জানিও আমার উপর অত্যাচার করিলে তোমার রজার কখনই কল্যাণ হইবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস মহাপ্রভু আমাকে রক্ষা করিবেন।"

ইহা বলিয়া সাবিত্রী পুনর্ব্বার দরজা বন্ধ করিলেন—দ্রুতবেগে অন্তঃ-পুরে প্রস্থান করিলেন। দৈত্যারি দাস হঠাৎ এইরূপে বাধা পাইয়া

দমিয়া গেল। সে বুঝিল, এখন বেশী বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়, পাছে সাবিত্রী আত্মহত্যা করিয়া বসেন। সে তাহার সঙ্গী লোকটাকে টাকার তোড়া কুড়াইয়া লইতে বলিল ও উভয়ে আস্তে আস্তে প্রস্থান করিল। যাইবার সময় উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া গেল, সায়ংকালে রাজার লোকজন পাল্কী লইয়া আসিবে সাবিত্রী যেন তেল হলুদ মাখিয়া প্রস্তুত থাকেন।

সাবিত্রীদেবী কি করিলেন? তিনি স্বামীকে কোন কথা বলিলেন না, বিনন্দও আর তাঁহার কাছে আসিতে সাহসী হইল না। তিনি স্নান করিয়া ধৌত বস্ত্র পরিধান করিলেন ও পূজার উপকরণাদি সংগ্রহ করিয়া লইয়া কল্যাণেশ্বরের মন্দিরে গমন করিলেন। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া মহাদেবের পূজা করিলেন ও দুই বাহু দ্বারা সেই মূর্ত্তিকে বেষ্টন করিয়া ভূমিতলে পড়িয়া ধন্না দিয়া রহিলেন। বিপদভঞ্জন কল্যাণেশ্বর তাঁহাকে কি এই আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন কি?
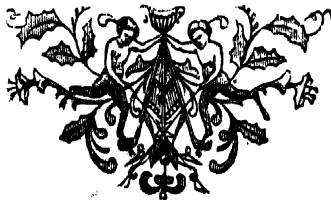
তৃতীয় অধ্যায়

নাটদর্শন।

সেদিন অপরাহ্নে রাজবাড়ীতে বড় ধুম। দক্ষিণদেশ (মান্দ্রাজ প্রদেশ) হইতে একটি নৃত্যগীতের দল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। রাজা নৃত্যগীতের বড় ভক্ত। ভিন্নদেশ হইতে কোন দল আসিয়া উপস্থিত হইলে, রাজ-বাড়ীতে একদিন "নাট" না হইয়া যায় না। তাই আজ মহা-আড়ম্বরের সহিত এই দক্ষিণী দলের নৃত্যগীত দর্শনের আয়োজন হইতেছে।

পাঠকগণ বোধ হয় জানেন, উড়িষ্যা বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত হইলেও মান্দ্রাজ-বিভাগ উড়িষ্যার অধিকতর নিকটবর্ত্তী। অর্থাৎ বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যার মধ্যে যে নীল পর্ব্বতায়মান তরঙ্গমালারূপী একটা দুর্লঙ্ঘ্য প্রাকার বর্ত্তমান, মান্দ্রাজ ও উড়িষ্যার মধ্যে সেরূপ কোন ব্যবধান নাই। বরং পুরী জেলা হইতে গঞ্জাম্‌রোড্ নামক যে সুপ্রশস্ত রাস্তা মান্দ্রাজাভিমুখে গিয়াছে, তদ্দ্বারা বার মাস যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা আছে। এইজন্য উড়িষ্যা ও মান্দ্রাজের মধ্যে অনেক বিষয়ে আদান প্রদান ঘটিয়াছে। (১) মান্দ্রাজ বিভাগের গঞ্জাম্, বহরমপুর প্রভৃতি কয়েকটা

(১.) বঙ্গদেশের মধ্যে এক মেদিনীপুর জেলার সহিত উড়িষ্যার কতকটা এইরূপ সম্বন্ধ দেখা যায়।

জেলাকে উড়িষ্যা বলিলেও চলে। আবার মান্দ্রাজ হইতে অনেক তেলেঙ্গাজাতীয় লোক উড়িষ্যায় আসিয়া বসত বাস করিতেছে। কটকের একটা বাজারের নাম তেলেঙ্গা বাজার। উড়িষ্যায় তেলিঙ্গী বাজনা বলিয়া এক রকম বাদ্যযন্ত্র প্রচলিত আছে। উড়িষ্যায় রাজপরিবারের মহিলাগণ তেলিঙ্গী রমণীগণের ন্যায় বস্ত্র ও আভরণ পরিধান করেন। ইহাই তাঁহাদের ফেসন্। এইরূপে উড়িষ্যায় প্রচলিত নৃত্যকলাও মান্দ্রাজ হইতে গৃহীত হইয়াছে। মুসলমান বাদসাহদিগের আমলে উত্তর ভারতে সঙ্গীত-বিদ্যা যে চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, মান্দ্রাজ অঞ্চলে প্রচলিত সঙ্গীত কলা তাহার কিছুই গ্রহণ না করিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে উৎকর্ষলাভ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এইজন্য উড়িষ্যায় প্রচলিত রাগ-রাগিনী আমাদের দেশে প্রচলিত রাগ-রাগিনী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। তবে আধুনিক সময়ে এদেশ হইতে উড়িষ্যায় অনেকানেক রাগ-রাগিণীর প্রচার হইতেছে।

রাজবাটীর বৈঠকখানার সম্মুখভাগে যে বিস্তৃত প্রাঙ্গন আছে, তাহার মধ্যে গানের আসর হইয়াছে। সেখানে পিপ্‌লীর শিল্পকারের হস্তরচিত বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত এক বিশাল চন্দ্রাতপ টাঙ্গান হইয়াছে, তাহার তলে মাদুর ও শতরঞ্চ পাড়া। সামিয়ানার নীচে ৪টী ঝাড় ও কয়েকটা লণ্ঠন ঝুলিতেছে। সন্ধ্যা হয় হয় দেখিয়া ভৃত্যগণ আলো জালিয়া দিল। সন্ধ্যার পরক্ষণেই নাট আরম্ভ হইবে।

দেখিতে দেখিতে আসরে অনেক লোক সমবেত হইল। তাহারা নাট-দলের লোকদিগকে বেষ্টন করিয়া বসিল। বৈঠকখানার বারান্দায় রাজার জন্য একখানা চৌকী রাখা হইল, তিনি সেখানে বসিয়া নৃত্য দর্শন করিবেন।

আমার বোধ হয় এই নৃত্য দর্শনের কথা শুনিয়া কোন কোন পাঠক পাঠিকা পুস্তক বন্ধ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। কিন্তু আমি তাঁহা-

দিগকে এই সৎসাহস(moral courage)দেখাইবার অবসর দিতেছি না। কারণ এই নাট্টে কুরুচির কোন সংশ্রব নাই। ইহা বালকের নৃত্য, বার-বিলাসিনীর লাস্য নহে। "গোটী পেলার" নাচ উড়িষ্যার একটী বিশেষত্ব।

সেই আসরে যথারীতি বেহালা, সেতার, তানপুরা, ডুগী, তবলা, মন্দিরা এই সকল বাদ্য-যন্ত্রের আবির্ভাব হইল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত টুং টাং করিয়া তাহাদের সুরসাধা হইল। তবে সকল যন্ত্রের সুর বাঁধিতে সময় অতিবাহিত করিতে হয় না। ডুগী, মন্দিরা এগুলি যেন পরিণতবয়স্কা মুখরা ভার্য্যা। তাহাদের সুর পূর্ণমাত্রায় বাঁধা থাকে, একটুও টোকা সয় না, যখন তখন ঘা মারিলেই খরবেগে শব্দস্রোত বহিতে থাকে। কিন্তু সেতার, তানপুরা, বেহালা ইহাঁরা হইতেছেন নবপরিণীতা কিশোরী। ইহাঁদের ব্রীড়াবিমুখ মুখমণ্ডল হইতে কথা বাহির করা বড় শক্ত, অনেক সাধ্যসাধনার প্রয়োজন। তবে প্রভেদের মধ্যে এই, উক্ত বাদ্যযন্ত্রগুলিকে কথা বলাইতে হইলে, তাহাদের কাণ মোচড়াইতে হয়। আর কোন কোন নব বধূর মুখচন্দ্র হইতে বিন্দুমাত্র বাক্য-সুধা বাহির করিতে হইলে স্বামী বেচারীকে তাঁহাদের ভূমিস্পর্শকারী অঙ্গবিশেষ ধারণ করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু এ সকল হইতেছে পাঠকপাঠিকাগণের ঘরের কথা—ইহাতে আমার প্রয়োজন কি?

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বাদ্যযন্ত্রগুলির সুর বাঁধা হইলে পর দুইটী সুন্দর মূর্ত্তি কিশোরবয়স্ক বালক নটবেশে সভায় প্রবেশ করিল। তাহাদের সুচিক্কণ গাঢ়কৃষ্ণ কেশপাশ সুঠাম ভাবে কবরীনিবদ্ধ। তাহার উপরে "অলকা," "বেণী," "চন্দ্রসূর্য্য," "কেতকী" এই সকল উজ্জ্বল রজতাভরণ ঝক্ ঝক্ করিতেছে। তাহাদের কাণে "কর্ণফুল" ও "ঝুমকা" দুলিতেছে। গলায় "কণ্ঠী" ও সরসিয়া হার" এবং কটিতটে রূপার চন্দ্রহার ও "কিঙ্কিণী" ঝুলিতেছে। বাহুতে "বাজু-বন্ধ," "তাড়" "কঙ্কণ" ও "পইচ" এই সকল স্বর্ণাভরণ এবং পায়ে "নূপুর" ও "পাহুড়" বাজিতেছে। কিন্তু তাহাদের

নাসিকায় নথ ও "বসনি" থাকাতে একেবারে সব মাটি হইয়াছে। এই দুইটী বালকের পরিধানে লালরঙ্গের বহরমপুরের পট্টসাটী—পশ্চাদ্‌ভাগে পুরুষের স্থায় কাছা দেওয়া ও সম্মুখভাগে ফুলকোচা ঝুলিতেছে।

নটবালকদ্বয় আসরে আসিয়া সকলকে নতশিরে অভিবাদন করিয়া সিল। তখন সুরতালসংযোগে বাদ্য আরম্ভ হইল। নৃত্য আরম্ভ ওয়ার পক্ষে কেবল রাজার শুভাগমনের অপেক্ষা। ইতিমধ্যে সময় অতিবাহিত করিবার জন্য দলের অধিপতি, এক টিকিধারী বৃদ্ধ, বেহালা হস্তে গাত্রোত্থান করিলেন ও "ডারে-ডারে" সুরে আরম্ভ করিয়া, বেহালার সুমধুর ধ্বনির সহিত তাঁহার ভাঙ্গা গলা মিলাইয়া শ্রোতৃবর্গের মনোহরণ করিবার জন্য কিয়ৎক্ষণ বৃথা চেষ্টা করিলেন।

এই সময়ে "রজা বিজে হউছন্তি" (রাজা বিরাজমান হইতেছেন) বলিয়া একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল ও আটজন বেহারার স্কন্ধে এক খানা সুবৃহৎ তাঞ্জানে আরোহণ করিয়া, মশালচি, পাঙ্খাবাহক, তাম্বুলকরঙ্ক-বাহক, পিক্‌দানীধারক, প্রভৃতি ভৃত্যগণ পরিবৃত হইয়া রাজা ব্রজসুন্দর সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। তখন সকল লোক উঠিয়া দাঁড়াইল। রাজা তান্‌জান হইতে অবতরণ করিয়া বারান্দায় সেই চৌকীর উপর বিরাজমান হইলেন। অধিকারী মহাশয় তাঁহার গানটী শীঘ্র শীঘ্র শেষ করিয়া বসিয়া পড়িলেন ও বালকদ্বয় উঠিয়া দাঁড়াইল।

তাহারা মস্তক অবনত করিয়া রাজাকে অভিবাদন করিল ও নৃত্য আরম্ভ করিল। বাদ্যযন্ত্র সকল বাজিতে লাগিল। একজন বেহালাদার বালক দুইটীর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া বাজাইতে লাগিল। বালকদ্বয় তালে তালে হস্ত পদ ঘুরাইয়া, ফিরাইয়া, হেলাইয়া, দুলাইয়া নাচিতে লাগিল। সেই নৃত্য এক অদ্ভুত ব্যাপার। যাঁহারা দেখেন নাই, তাঁহাদিগকে বর্ণনা করিয়া বুঝান শক্ত। বালক দুইটী বাদ্যের সহিত মিল করিয়া ও পরস্পরের সহিত ঐক্য করিয়া এরূপ সুন্দরভাবে হস্তপদ সঞ্চালন করিতে লাগিল,

যেন বোধ হইল একটী বালক নাচিতেছে। যাঁহারা এই নৃত্যের সমজদার তাঁহাদের কাছে শুনিয়াছি, নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে যে গান হইতে থাকে, বালকগণ শরীরের নানা স্থানে করস্পর্শ করিয়া সেই গীতের ব্যাখ্যা করিয়া দেয়। এই নৃত্যে লম্ফ ঝম্ফ নাই, কিম্বা অশ্লীলভাব কিছুমাত্র নাই

এইরূপে কতকক্ষণ নৃত্য করিয়া, বালকগণ কণ্ঠ মিলাইয়া নিম্নলিখিত সংস্কৃত গানটী ধরিল। এখানে একটী কথা বলা আবশ্যক। আমাদের দেশে যেমন কান্নু ছাড়া কীর্ত্তন নাই, উড়িষ্যায় তেমনি নাচ ছাড়া গান নাই। যে রকম গানই হউক না কেন, তাহা গাইবার সময় নৃত্য করা হয়। বলা বাহুল্য নিম্নলিখিত গানটীর মধ্যেও বালকদ্বয় নৃত্যের অবসর বাহির করিয়াছিল।

(বালকদ্বয় একত্র)

"জয় কৃষ্ণ মনোহর যোগতরে।
যদুনন্দন নন্দকিশোর হরে॥
জয় রাসরসেশ্বর-পূর্ণতমে।
বরদে বৃষভানুকিশোরি রমে॥
জয়তীহ কদম্বতলে ললিতম্।
কলবেণু-সমীরিত-গানরতম্॥
সহ রাধিকয়া হরিরেব মতঃ।
সততং তরুণীজন-মধ্যগতঃ॥
বৃষভানুসুতে পরমপ্রকৃতে।
পুরুষো ব্রজরাজসুতঃ সুকৃতে॥
ইহ নৃত্যতি গায়তি বাদয়তে।
সহ গোপিকয়া বিপিনে রমতে॥
যমুনা-পুলিনে বৃষভানু-সুতা।
তরুণী-ললিতাদি-সখীসহিতা॥

রমতে হরিণা সহ নৃত্যরতা।
গতি-চঞ্চল-কুণ্ডল-হার-লতা ॥
বৃষভানু-সুতা সহ কুঞ্জবনে।
যদুনন্দন এতি সুখং বিজনে ॥

*　*　*　*

স্ফুটপদ্মমুখী বৃষভানুসুতা।
নবনীত-সুকোমল-দেহলতা ॥
পরিরভ্য হরিং প্রিয়মাত্র-সুখং।
পরিচুম্বতি শারদচন্দ্র মুখং ॥

*　*　*　*

১ম বালক। জগদাদিগুরুং ব্রজরাজ-সুতং।
২য় বালক। প্রণমামি সদা বৃষভানু-সুতাং ॥

১ম। নবনীরদসুন্দর-নীলতনুং।
২য়। তড়িদুজ্জ্বল-কুণ্ডলিনীসুতনুং ॥

১ম। শিখিকণ্ঠ-শিখণ্ডক-সম্মুকুটম্।
২য়। কবরীপরিবদ্ধ-কিরীটঘটাম্ ॥

১ম। কমলাশ্রিত-খঞ্জন-নেত্রযুগম্।
২য়। পরিপূর্ণ-শশাঙ্ক-সুচারুমুখীম্ ॥

১ম। মৃদুহাস-সুধাময়-চন্দ্রমুখম্।
২য়। মধুরাধর-সুন্দর-পদ্মমুখীম্ ॥

১ম। মকরাঙ্কিত-কুণ্ডল-গণ্ডযুগম্।
২য়। মণিকুণ্ডল-মণ্ডিত-কর্ণযুগাম্ ॥

১ম। কনকাঙ্গদ-শোভিত-বাহুধরম্।
২য়। মণিকঙ্কণ-শোভিত-শঙ্খকরাম্ ॥

১ম। মণি-কৌস্তুভ-ভূষিত-হারযুগম্।
২য়। কুচকুম্ভ-বিরাজিত-হারলতাম্ ॥

১ম। তুলসীদল-দাম-সুগন্ধিপরম্।
২য়। হরি-চন্দন-চর্চ্চিত-গৌর-তনুম্॥

১ম। তনু-ভূষণ-পীত-ধটী-জড়িতম্।
২য়। বসনাবৃত নীল নিচোলযুতাম্॥

১ম। তরুণীকৃত-দিগ্গজরাজ-গতিম্।
২য়। কল-নূপুর-হংস-বিলাস-গতিম্॥

১ম। রতিনাথ-মনোহর-বেশ-ধরম্।
২য়। রতিমন্মথ-পঙ্কজ-কাম-হরাম্॥

১ম। মুরলী-মধুর-শ্রুতিরাগপরম্।
২য়। স্বর-সপ্ত-সমন্বিত-গান-পরাম্॥

(উভয়ের একত্র)

নবনায়কবেশ কিশোরবয়াঃ।
ব্রজরাজসুতঃ সহ রাধিকয়া॥
স্থিতকেউর (?) বদ্ধকরে স্বকরম্।
কুরুতে কুসুমায়ুধ কেলি-পরম্॥
অধিকাধিক মাধবরাধিকয়োঃ।
কৃতরাস-পরস্পর-মণ্ডলয়োঃ॥
মণি-কঙ্কণ-শিঞ্জিত-তালস্বনং।
হরতে সনকাদি-মুনেঃ সুমনঃ॥

* * * *

ভ্রমন্তং রাসচক্রেণ নৃত্যন্তং তালশিঞ্জিতৈঃ।
গোপীভিঃ সহ গায়ন্তং রাধাকৃষ্ণং ভজাম্যহম্।
রাসমণ্ডলমধ্যস্থং প্রফুল্লবদনাম্বুজম্।
চান্যোহন্যহৃদয়াসক্তং রাধাকৃষ্ণং ভজাম্যহম্॥

বিদ্যুদ্ গৌরীং ঘনশ্যামং প্রেমালিঙ্গনতৎপরম্।
পরস্পরয়োরর্দ্ধাঙ্গং রাধাকৃষ্ণং ভজামাহম্॥
রাধিকারূপিণং কৃষ্ণং রাধাং মাধবরূপিণীম্।
রাসযোগানুরাগেণ রাধাকৃষ্ণং ভজামাহম্॥"

* * * *

বালক দুইটীর কোমলকণ্ঠে গীত এই বিশুদ্ধপদবিন্যাসসংযুক্ত সঙ্গীত নিয়া সভাস্থ সকলে মুগ্ধ হইল। উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে ইহার অর্থ বোধ হয় কেহই বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু বিশুদ্ধ তান-লয়-সিদ্ধ সঙ্গীতের এরূপ মোহিনীশক্তি যে তাহাতে মুগ্ধ হইবার জন্য অর্থবোধের আর বড় অপেক্ষা থাকে না। রাজারও সেই দশা হইল। তিনি প্রথম প্রথম দুই একটী পদ শুনিয়া অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার বাল্যকালে অধীত অমরকোষের প্রথম অধ্যায়ে পরিসমাপ্ত সংস্কৃত বিদ্যায় কোন কূলকিনারা পাইলেন না। তবুও ভাবের আপছায়া যেটুকু তাঁহার মনে প্রতিবিম্বিত হইল, তাহাতেই তিনি চিত্রার্পিতের ন্যায় মুগ্ধ হইয়া সেই সঙ্গীত-সুধা পান করিতে লাগিলেন। আবার তখন তাঁহার আফিমের নেশাটারও বিলক্ষণ ঝোঁক ছিল। সেই সঙ্গীতের মাদকতা ও আফিমের মাদকতায় আত্মহারা হইয়া মনে মনে তিনি নিজকে ইন্দ্রের অমরাবতীতে অধিষ্ঠিত মনে করিতে লাগিলেন। তিনি মনে ভাবিলেন, তিনিই দেবরাজ ইন্দ্র, আর সেই নট বালক দুইটী দেবসভার অপ্সরা উর্ব্বশী ও রম্ভা। এই সময়ে একটী লোক তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডবৎ করিল। রাজা চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন সে দৈত্যারি দাস। সে রাজাকে চুপে চুপে বলিল—

"মণিমা! সব প্রস্তুত। পাল্কী, বেহারা, পাইক সর্দ্দার লইয়া আমি অপেক্ষা করিতেছি। এখন হুজুরের অনুমতি পাইলেই কল্যাণপুরে গিয়া তাহাকে আনিতে পারি।"

রাজা তখন উর্ব্বশী রম্ভার চিন্তায় নিমগ্ন। দৈত্যারি দাসের এই লোভনীয় প্রস্তাবে তাঁহার অমত হইবে কেন? তিনি সাবিত্রী দেবীকে আনিবার জন্য তাহাকে আদেশ করিলেন। দৈত্যারি দাস তখন মশাল-ধারী ১০।১২ জন লোক, ৪ জন বেহারা ও পাল্কী লইয়া কল্যাণপুর অভিমুখে যাত্রা করিল। কিন্তু তাহাকে বড় বেশীদূর যাইতে হইল না। সেই অনাথা সতী রমণীর কাতর রোদনে শ্রীশ্রীকল্যাণেশ্বরমহাপ্রভু যথার্থই কর্ণপাত করিলেন।

নট বালকদ্বয় উক্ত সংস্কৃত সঙ্গীতটী শেষ করিয়া নিম্নলিখিত উড়িয়া গানটী ধরিল।

"আহা মো লাবণ্যনিধি!
এবে হরাই বসিলি বুদ্ধি॥
শিব সেবি অনুবন্ধে, পাইথিলি ধন তোতে
এবে কেমন্তে মুর্চ্ছিবি সতে রে।
য়েনিকি রহিলে ধন, দিশে তো চন্দ্রবদন,
এবে কেমন্তে বঞ্চিবি দিন রে॥
সখি মু ধরুচ্ছি কর, এথিকু উপায় কর,
এবে তো চিন্তা মো হৃদে হার রে।
শ্রীকৃষ্ণ বিরহ বাণী, তোষ হেলে রাধা রাণী,
রসে রামচন্দ্র দেবে ভণি॥"

শ্রীকৃষ্ণের বিরহগীতি শুনিতে শুনিতে রাজার বিরহ আবার জাগিয়া উঠিল। আফিমের ঝোঁকে তিনি আবার অমরাবতীর দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই উর্ব্বশী ও রম্ভা নাচিতে নাচিতে ক্রমে তাঁহার সম্মুখে আসিল। তাহারা ক্রমে ক্রমে রাজার কাছে আসিয়া নাচিতে নাচিতে পুরস্কার লাভ প্রত্যাশায় হাত বাড়াইল। তখন রাজা নেশার ঝোঁকে স্থান কাল পাত্র ভুলিয়া গিয়া, তাহাদিগকে ধরিবার জন্য সেই

উচ্চ বারান্দা হইতে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। যেমন ঝম্প প্রদান, অমনি পতন। তাঁহার মস্তক ভয়ানক জোরের সহিত সশব্দে বারান্দার নিম্নে স্থিত একখানা তীক্ষ্ণাগ্র প্রস্তরের উপর পড়িয়া গেল। সমস্ত শরীরের গুরুভার মাথার উপর পড়াতে মাথা ফাটিয়া গেল। রাজা সেই গুরুতর আঘাতে যে চৈতন্য হারাইলেন, তাহা আর ফিরিয়া আসিল না।

রাজার পতন শব্দে চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। গান ভাঙ্গিয়া গেল। ভৃত্যগণ ধরাধরি করিয়া রাজাকে বৈঠকখানার মধ্যে লইয়া গেল। তখন অমাত্যবর্গ পরামর্শ করিয়া রাজবৈদ্যকে সংবাদ দিলেন। তিনি আসিয়া অনেকানেক সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইয়া কস্তুরি, মুক্তা, প্রবাল, সোণা রূপা প্রভৃতি মূল্যবান্ পদার্থসম্বলিত এক ব্যবস্থাপত্র লিখিলেন। রাজার ব্যারাম, সামান্য গাছগাছড়ার ঔষধে তাহা সারিবে কেন? এই সংবাদ রাণী চন্দ্রকলা দেবীর নিকট পোঁছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজাকে দেখিবার জন্য অন্তঃপুর হইতে পাল্কীতে চড়িয়া বৈঠকখানায় আসিলেন। তাঁহার আদেশে রাজার মস্তকে জলপটী বাঁধা হইল ও কটক হইতে ডাক্তার আনিবার জন্য লোক প্রেরিত হইল। কিন্তু কিছুই হইল না। রাজার মাথা ফাটিয়া মস্তিষ্ক বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। মাথা ফুলিয়া উঠিল ও অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল। সেই নৃত্যগীতপূর্ণ রাজপুরী অল্পক্ষণের মধ্যেই হাহাকারধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইল।

রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই রাণীর আদেশে কটকে নবঘনর নিকট লোক প্রেরিত হইল।
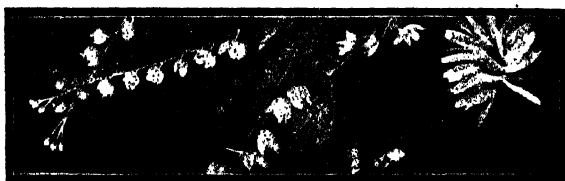
চতুর্থ অধ্যায়

রাণী চন্দ্রকলা

"মা! মা!—আর কত কাল এ ভাবে কাটাবে? একবার উঠ দেখি? আমি যে আর পারি না?"

মাতা কিছু বলিলেন না। নীরবে উঠিয়া বসিলেন। নবঘন মায়ের সেই শোকক্লিষ্ট মুখখানি দেখিয়া কি বলিতে আসিয়াছিলেন, তাহা ভুলিয়া গেলেন। তিনি কিয়ৎক্ষণ মায়ের পার্শ্বে নীরবে বসিয়া রহিলেন।

আজ ছয় দিন হইল রাজার মৃত্যু হইয়াছে। নবঘন বাড়ী আসার পরই তাঁহাকে বাধ্য হইয়া অনেকটা বিষয়কর্ম্মের আবর্ত্তে পড়িতে হইয়াছে, তাই পিতৃবিয়োগজনিত শোক তাঁহাকে অধিক কাতর করিতে পারে নাই। কিন্তু রাণী চন্দ্রকলা পতিবিয়োগে নিরতিশয় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছেন। নবঘন সহস্র চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে ও ছোট রাণীকে প্রবোধ দিতে পারিতেছেন না।

রাণী চন্দ্রকলা মূল্যবান্ বস্ত্র ও রত্নখচিত অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার পরিধান একখানা মোটা সাদা সাড়ী। তিনি তাঁহার কক্ষের মধ্যে মেজের উপর একখানা কম্বল পাতিয়া শুইয়াছিলেন। রাণীর শয়ন-গৃহটী সুপ্রশস্ত, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তাহার পশ্চিম কোণে একখানা পালঙ্ক, বিবিধ কারুকার্য্যখচিত। পূর্ব্বদিকে সারি সারি সাজান কয়েকটী কাঠের

বাক্স ও একটা বড় আলমারী। ঘরের আর একদিকে সিশু কাঠের একটী বড় গোল টেবিল, তাহার চারিদিকে সাজান কয়েক খানা সিশু কাঠের চৌকী ও একখান বড় আরাম চৌকী; তাহার কিঞ্চিৎ দূরে দুইটা আলনার উপর নানাবিধ কাপড় সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন রাণীর স্বহস্তনির্ম্মিত একটা কড়ির আলনার উপর অনেকগুলি কাপড় ঝুলিতেছে। ঘরের চারিদিকের দেওয়ালে কলিকাতার আর্টষ্টুডিওচিত্রিত দেব-দেবীর অনেকগুলি ছবি টাঙ্গান রহিয়াছে ও দুইখানি বিলাতী তৈল-চিত্রও আছে। এ গুলি নবঘন কলিকাতা হইতে আনিয়াছিলেন। ঘরের আসবাবও অনেকগুলি তাঁহার ফরমাস্ মতে প্রস্তুত হইয়াছিল।

এখন বেলা এক প্রহর। একজন দাসী ঘরের দরজা জানালা খুলিয়া দিয়া ঘর ঝাঁট দিয়া চলিয়া গিয়াছে। আর এক জন দাসী আসিয়া এক খানা ঝাড়ন দিয়া ঘরের মধ্যে সাজান আসবাবগুলি ঝাড়িতেছে। উন্মুক্ত বাতায়ন পথে সূর্য্যের আলোক গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া রাণীর গায়ে পড়িয়াছে। তাঁহার শরীরে মধ্যাহ্নপ্রখর গৌরোজ্জ্বলকান্তি যেন উছলিয়া পড়িতেছে। তাঁহার নিবিড় কৃষ্ণ আলুলায়িত কেশরাশি শরীরের অর্দ্ধাংশ ঢাকিয়া রহিয়াছে। অনেকক্ষণ হইল তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। এখন চক্ষু মেলিয়া শুইয়া কত কি চিন্তা করিতেছেন। এই সময়ে নবঘন আসিয়া তাঁহাকে ডাকিলেন।

কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া নবঘন আবার বলিলেন, "মা! তুমি এ ভাবে থাকিলে চলিবে না। আমি যে মহা শঙ্কটে পড়িয়াছি, কোন কূল কিনারা দেখি না।"

রাণী ধীরভাবে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "কেন বাবা? কি হইয়াছে?"

"আর কি হবে? তুমি ত সকলই জান! এ দিকে যে সব গোল-যোগ উপস্থিত আমি তাহা কি করিয়া থামাই? কাল সিন্ধুক খুলিয়া

দেখিলাম, নগদ তহবিল মাত্র ১৫॥৵০, শ্রাদ্ধের মাত্র ৪।৫ দিন বাকী। তাহার কি করা যায় ?

"কেন বাবা! বড় আশ্চর্য্য দেখিতেছি। যে দিন রাত্রে রাজার মৃত্যু হয়, সে দিন সন্ধ্যাকালে কলসপুর কাছারি হইতে ৫০০৲ টাকা আসে আমি খবর পাইয়াছি। সে টাকা কি হইল ?"

"চুরি—একদম সব চুরি গিয়াছে। যত আমলা দেখিতেছ, ইহারা সব চোর। এই একটা গোলযোগের সময় হিসাব নিকাশ নেয় কে, তাই যে যাহা পাইয়াছে সব চুরি করিয়াছে।"

রাণী একটু সোজা হইয়া বসিলেন ও মুখের উপর হইতে চুল পশ্চাতের দিকে সরাইয়া দিয়া বলিলেন :—

"সে কথা কেন বল ? হিসাব নিকাশ এখানে কবেই বা ছিল ? কেবল আজ বলিয়া নয়, এখানে উহারা বরাবরই এরূপ চুরি করিয়া থাকে। আমি কতবার রাজাকে সাবধান করিয়াছি, কিন্তু তিনি মনোযোগ করেন নাই। গরিব প্রজার রক্ত শোষণ করিয়া টাকা আনিয়া এই চোরদিগকে বাঁটিয়া দেওয়া এখানে বরাবর চলিয়া আসিতেছে।"

"শ্রাদ্ধের ত মাত্র ৪।৫ দিন বাকী, আর কাহারও নিকট যে টাকা ধার কর্জ্জ পাওয়া যাবে এরূপ সম্ভব নাই। বরং আমি বাটী আসা অবধি দলে দলে পাওনাদারগণ আসিতেছে, কেহ বলে দুশ পাব, কেহ বলে পাঁচশ, কেহ বলে হাজার, কেহ বলে পাঁচ হাজার এই রকম। আমি এ পর্য্যন্ত যাহা হিসাব পাইয়াছি, তাহাতে এই সকল খুচরা দেনাই বিশ হাজার টাকা হবে। আজ আবার পুরীর মোহান্ত চতুর্ভুজ রামানুজ দাসের লোক আসিয়াছে। সেখানে আসল ত্রিশ হাজার টাকা দেনা ছিল, মোহান্ত বাবাজী আজ দুই বৎসর হইল নালিশ করিয়া ৩৫ হাজার টাকার এক ডিক্রি করিয়াছেন। এখন টাকা না দিলে তিনি সেই ডিক্রি জারি করিয়া এই রাজগী ক্রোক দিবেন সংবাদ পাঠাইয়াছেন। ইহা ছাড়া

এই বৈশাখের কীস্তির সদর খাজানাও পাঁচ হাজার টাকা এখন দিতে হইবে, নচেৎ মহাল নিলাম হইয়া যাবে। তবে মফস্বলে কি আদায় হইবে বলিতে পারি না।"

রাণী বলিলেন "বাবা! ঐ জানালাটা বন্ধ করিয়া দেও, তোমার মুখে রৌদ্র লাগিতেছে।"

নবঘন উঠিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া বসিলেন। রাণী বলিলেন "মফস্বলে বেশী বাকী আছে আমার এরূপ বোধ হয় না। আমি যতদূর জানি, রাজা ঐ সকল দুষ্ট লোকগুলার পরামর্শে ক্রমাগত আগাম খাজানা আদায় করিতেন, তা' না হইলে খরচ কুলাইবে কেন? তাহাতে কত প্রজা কত সময়ে আসিয়া কাঁদা কাটা করিয়াছে, কিন্তু তাহা কিছুই শুনেন নাই।"

"তবে আমাদের এই বিপদের সময় প্রজাদিগের নিকট হইতে যে কিছু আদায় করিতে পারিব সে আশাও নাই?"

"না।"

"তবে এখন উপায় কি? দেনা শোধ পড়িয়া থাকুক এখন এই উপস্থিত ব্যয়, শ্রাদ্ধের কি উপায় হইবে?"

"কিরূপ ভাবে শ্রাদ্ধ করিতে চাও?"

"মা! সে কথা তুমিই ভাল জান, আমি কি জানি? আমি ত এসব বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ! তবে আমি এই পর্য্যন্ত বুঝি আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা অনুসারে যাহা না হইলে নয় তাহাই করিতে হইবে। কিন্তু এ কথাও আবার দেখিতে হইবে যে এদেশে বাবার নাম যেরূপ প্রসিদ্ধ, তাঁহার নামের সম্মান যাহাতে রক্ষা হয় তাহাও করিতে হইবে।"

"তা'ত বটেই। আমার বোধ হয় অন্ততঃ পক্ষে পাঁচ হাজার টাকার কমে শ্রাদ্ধ হইবে না।"

"কি? পাঁচ হাজার? এত টাকা কোথায় পাইব?"

"বাছা, তুমি ভাবিও না। আমার বাবা আমাকে যে মাসহারা দিতেন, তাহার কিছু কিছু জমাইয়া আমি দুই হাজার টাকা করিয়াছি। আর আমার গহনাগুলি ত আছে? তাহার দামও অন্ততঃ পক্ষে তিন হাজার টাকা এখন হবে। তুমি ইহা দ্বারা এখন কার্য্য উদ্ধার কর, তুমি বাঁচিয়া থাকিলে সব হবে।"

মাতার কথা শুনিয়া নবঘনের চক্ষে জল আসিল। তিনি চক্ষু মুছিয়া বলিলেন,—

"মা! আমি কোন্ প্রাণে তোমার গায়ের গহনাগুলি লইয়া বেচিয়া ফেলিব? আর কি রকমেই বা তোমার বহু কষ্টে সঞ্চিত এই টাকাগুলি কাড়িয়া লইব? আমি প্রাণ থাকিতে তাহা পারিব না।"

পুত্রের কথা শুনিয়া মাতার চক্ষেও জল আসিল। বহু আয়াসে প্রশমিত অশ্রুধারা আবার প্রবাহিত হওয়াতে তাঁহার গণ্ডদেশ ভাসিয়া গেল। তিনি অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিয়া বলিলেন—

"আরে নব! তুই একথা বলিয়া আমার প্রাণে ব্যথা দিস্ কেন রে? আরে তুই আমার অঞ্চলের ধন, আমার আঁধারের মাণিক। আমি অনেক চেষ্টা করিয়া তোকে লেখা পড়া শিখাইয়া মানুষ করিয়াছি—তুই আমার উজ্জ্বল রত্ন! তুই বাঁচিয়া থাকিলে আমার আর ভাবনা কি? তুই ইচ্ছা করিলে এরূপ হাজার হাজার টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিবি। তোর কাছে একয়টা টাকা কি?"

নবঘন অশ্রুজল মুছিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, মা! আমি তোমার কথা শুনিব। বাবার শ্রাদ্ধের জন্য টাকার নিতান্ত দরকার, তাই তোমার সেই দুই হাজার টাকা হাওলাৎ লইব। কিন্তু তোমার গায়ের গহনা আমি কিছুতেই বেচিতে পারিব না।"

"আরে বেচিবি কেন? এগুলি লইয়া বন্ধক দিলে অন্ততঃ পক্ষে দুই হাজার টাকা পাওয়া যাইবে। এই চারি হাজার টাকা নগদ হাতে আসিলে

একরকম কাজ চালাইতে পারিবি। তারপর তুই রোজগার করিয়া সেগুলি খালাস করিস্। এ গহনাগুলি ত এখন ঘরেই পড়িয়া থাকিবে? আমাদের ঘরে না থাকিয়া বরং মহাজনের ঘরে থাকুক।"

"আচ্ছা মা! আমি তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যদি দাসত্ব করিতে হয়, তাহাও স্বীকার, কিন্তু এক বৎসরের মধ্যেই আমি তোমার গহনা খালাস করিব।"

"প্রতিজ্ঞার দরকার কি বাছা? তোর নিজের জিনিস তুই যাহা ইচ্ছা তাই করিতে পারিস্।"

"আচ্ছা মা, শ্রাদ্ধের ত যেন এক রকম বন্দোবস্ত হইল। আর ৮।১০ দিন পরে যে বৈশাখের কীস্তির সদর খাজানা দিতে হইবে, তার কি?"

"তার ত কোন উপায় দেখি না।"

"কিন্তু রাজগী যে বিক্রয় হইয়া যাইবে?"

"এত সহজে নিলাম হইবে না। আমাদের সদর খাজানা ত কখনও বাকী পড়ে নাই, এই প্রথম। তুমি কালেক্টর সাহেবের সঙ্গে গিয়া সাক্ষাৎ করিয়া আসিবে। তাঁহাকে বলিবে যে রাজার মৃত্যু হইয়াছে, আমরা ঋণগ্রস্ত। এক কীস্তির খাজানাটা একটু সবুর করিয়া লইতে হইবে। আমার বোধ হয়, কালেক্টর সাহেব তাহা শুনিবেন। পরে কার্ত্তিক মাসের মধ্যে এক রকম টাকার যোগাড় করা যাইবে।"

রাণীর কথা শুনিয়া নবঘনের মুখে উৎসাহের ছটা ফিরিয়া আসিল; তিনি বলিলেন—

"তা—মা, আমি খুব পারিব। আর কমিশনার সাহেবও আমাকে জানেন, আমাদের বিপদের কথা শুনিলে, তিনিও আমাকে সময় দিবেন।"

"কিন্তু, বাবা! বড় বেশী ভরসা নাই, তাঁহারাও পরের চাকর, আইন কানুনের বাধ্য। যাহা হউক তুমি ইহার মধ্যে গোমস্তাদিগের ও দেও-

য়ানজীর হিসাব নিকাশ করিয়া দেখ মফস্বলে কত বাকী বকেয়া আছে। যে রকমে হউক, কার্ত্তিকের কীস্তিতে ষোল আনা সদর খাজানা দশ হাজার টাকা না দিতে পারিলে রাজগী রক্ষা করা অসম্ভব হইবে।"

"তার পরে—এই মোহান্ত বাবাজীর পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার কি হইবে ?"

"যে লোক আসিয়াছে তাহাকে বলিয়া দাও, আমাদের এই বিপদ উপস্থিত, এখন টাকা দেওয়ার সাধ্য নাই। মোহান্ত বাবাজী ছয় মাসের সময় দিন, পরে কতক টাকা নগদ দিয়া একটা কীস্তিবন্দী করা যাইবে।"

"যদি মোহান্ত বাবাজী না শুনেন ?"

"না শুনিলে আর উপায় নাই—এ রাজগী নিলাম করিয়া লইবেন তাহা ঠেকাইবার সাধ্য নাই।"

"আর মা, অন্যান্য খুচরা পাওনাদারগণকেও কিছু কিছু না দিলে তারাও ত নালিশ করিয়া ডিক্রি করিবে ও মহল ক্রোক দিবে ?"

"তা'ত দেবেই।"

"তবে এরূপ স্থলে মোহান্ত বাবাজীই ত আগে ক্রোক দিবেন, কারণ তাঁহার ডিক্রি আগে করা আছে। আর যে আগে ক্রোক দিতে পারিবে, তাহার টাকাই আগে আদায় হইবে। এজন্য বোধ হয় মোহান্ত বাবাজী আমাদিগকে আর সময় দিবেন না।"

"বাবা! এ সংসারে সকলেই নিজ নিজ স্বার্থ খোঁজে। আর তাঁহা-কেই বা কি বলা যায় ? আজ দুই বৎসর হইল তিনি ডিক্রি করিয়া বসিয়া আছেন ইহার মধ্যে একটী পয়সা তাঁহাকে দেওয়া হয় নাই। তিনি যদি ছয় মাস সময় দেন তবে তাঁহার মহত্ত্ব, না দিলে তাঁহার দোষ দিতে পারি না।"

"কিন্তু ছয় মাসের পরেই বা সে টাকা কোথা হইতে আসিবে ?"

"সে ভাবনা পরে ভাবিও।"

"তবে আমি গিয়া তাঁহার লোককে বলি, দেখি সে কি বলে। আচ্ছা মা! ছোট মা এসব কথা কিছু জানেন কি?"

"না বাছা! তাহাকে এসব কথা বলিয়া লাভ কি? তার হাতে নগদ টাকা কিছু নাই। আর দেখ, বাবা, তুমি আমার সাত রাজার ধন এক মাণিক আছ; কিন্তু তার তো সান্ত্বনা পাওয়ার আর কিছুই নাই? তার বড় দুর্ভাগ্য!"

"কেন মা! আমি যেমন তোমার ছেলে, তেমন তাঁরও ছেলে— আমি যতদূর সম্ভব তাঁর কষ্ট দূর করিব। ছোট মাকে তবে এসব কথা কিছু বলিবার দরকার নাই। তবে আমি এখন যাই, সে লোকটা অনেকক্ষণ বসিয়া আছে।"

নবঘন বাহিরে আসিলেন।

এই ঘটনার পরদিন রাণী একজন বিশ্বাসী লোকের হস্তে গোপনে তাঁহার গহনার বাক্স পুরীতে পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে অলঙ্কার বন্ধক রাখিয়া দুই হাজার টাকা কর্জ্জ করা হইল। রাণীর দুই হাজার ও এই দুই হাজার এই চারি হাজার টাকায় রাজার শ্রাদ্ধ এক রকম নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহ করা হইল। কিন্তু দেনার জন্য নবঘন অস্থির হইয়া পড়িলেন। সম্পত্তি রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিল।

পঞ্চম অধ্যায়।

অভিরামের মন্ত্রণা।

ফাল্গুন মাস, বেলা অপরাহ্ণ। সূর্য্য চন্দ্রমৌলি পাহাড়ের পশ্চিম দিকে হেলিয়া পড়িয়াছে। রাজার বাড়ী এখন ছায়ায় ঢাকা পড়িয়াছে। কিন্তু পাহাড়ের শৃঙ্গগুলি অস্তগামী সূর্য্যের কনকশোভায় ভূষিত হইয়াছে। একটী শৃঙ্গের শিরোভাগে দুইটী যুবক আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার একটী অভিরামসুন্দর রা, অপরটী রাজা নবঘন হরিচন্দন।

বলা বাহুল্য পিতার মৃত্যুর পর নবঘনই রাজা হইয়াছেন। কিন্তু তিনি রাজোচিত উপাধি বাহুল্যের বিরোধী। সে জন্য তাঁহার পিতৃদত্ত সাদাসিধে নামটী এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাঁহার বেশ ভূষারও বিশেষ কোন পারিপাট্য নাই। তাঁহার পরিধানে সামান্য একখান সাদা ধুতি, গায়ে একটী সার্ট। তিনি পিতার ন্যায় বহুসংখ্যক ভৃত্যপরিবৃত হইয়াও যাতায়াত করেন না এবং পদব্রজে গমনও অপমানের কার্য্য মনে করেন না। তিনি একগাছি মোটা ছড়ি হাতে করিয়া অভিরামের সহিত পর্ব্বতারোহণ করিয়াছেন। তাঁহারা পর্ব্বত শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া একটা আম গাছের ছায়ায় প্রস্তরের উপর বসিলেন। তখনও সেখানে সূর্য্যের তাপ প্রখর ছিল। উভয়েই ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছিলেন।

অভিরাম রুমাল দিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "কেমন? আমি ত বলিয়াছিলাম আপনার খুব কষ্ট হইবে?"

নবঘন হাতের ছড়িটা পার্শ্বে রাখিয়া বলিলেন, "কষ্টটা আমার বেশী, না তোমার বেশী হইয়াছে? তুমি জান আমার শারীরিক পরিশ্রম করিবার অভ্যাস আছে। আমি রোজ রোজ ঘোড়ায় চড়িয়া থাকি।"

"কিন্তু আপনার যে কিছু কষ্ট না হইয়াছে, তাহা ত নয়?"

"হাঁ, কিছু কষ্ট কোন্ না হইয়াছে—কিন্তু মনে রাখিও, আমার পিতার এক ঘর হইতে অন্য ঘরে যাইতে হইলে পাল্কীর দরকার হইত। আমি তাঁহার উপরে কত অধিক উন্নতি লাভ করিয়াছি!"

"সে কথা সত্য। আমরা আশা করি, আপনি সকল বিষয়েই তাঁহার চেয়ে এইরূপ উন্নতি লাভ করিবেন।"

"তাহা কি কখন সম্ভব? তাঁহার শত দোষ ছিল স্বীকার করি, কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ বড়ই উদার ছিল। তিনি পরের দুঃখ দেখিতে পারিতেন না, লোককে অকাতরে দান করিতেন। আর তাঁহার চক্ষুলজ্জাটা এত বেশী ছিল যে, তিনি কাহাকেও কোন কটু কথা বলিতে পারিতেন না।"

ইহা বলিতে বলিতে নবঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল; তিনি রুমাল দিয়া চক্ষু মুছিলেন। পরে বলিতে লাগিলেন—

"তুমি সর্ব্ব বিষয়ে উন্নতির কথা বলিতেছ, আমি কিন্তু এই সম্পত্তি রক্ষার কোনই উপায় দেখি না। মনে আছে, আমি তোমাকে আর এক দিন বলিয়াছিলাম এই রাজগী আমার হাতে আসার পূর্ব্বে মহাজনগণ ভাগ-বণ্টন করিয়া লইবে। প্রকৃতও তাই ঘটিতেছে। আমি এখন ঋণদায়ে জড়িত। পুরীর মোহান্ত চতুর্ভুজ রামানুজ দাস ৩৫ হাজার টাকার ডিক্রি করিয়া সংপ্রতি এই মহাল ক্রোক দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন যে

সকল খুচরা দেনা আছে, তাহাও প্রায় ২০ হাজার টাকা হইবে। মায়ের গহনা বন্ধক রাখিয়া কোন ক্রমে বাবার শ্রাদ্ধ করিয়াছি। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, এক বৎসরের মধ্যে সে গহনা খালাস করিব, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার কিছুই করিতে পারিতেছি না। গবর্ণমেণ্টের রাজস্বও দুই কিস্তীতে ১০ হাজার টাকা বাকী পড়িয়াছে। কালেক্টর সাহেব অনুগ্রহ করিয়া এই বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত সময় দিয়াছেন। কিন্তু সে টাকা আদায়েরও কোন পথ দেখি না।”

“কেন, মফস্বলে যে সকল প্রজার খাজানা বাকী আছে তাহা আদায়ের বন্দোবস্ত করুন না? আমলাগণ কি করিতেছে?”

“আমলাগণের কথা বলিও না—সব বেটা চোর। যে যাহা আদায় করিত, সে তাহা ভাঙ্গিয়া খাইত, প্রজাগণ আগাম খাজানা দিয়া মরিত।”

“কিন্তু আপনি এ বিষয়ে ভাল বন্দোবস্ত করুন না?”

“তাহাও করিতেছি। আমি রাজ্যভার গ্রহণ করার পর তাহাদের সকলের নিকাশ গ্রহণ করিয়াছি। প্রায় ৮।১০ জন লোক নিকাশ দিতে না পারায় বরখাস্ত হইয়াছে। শুদ্ধ রাজমর্য্যাদার খাতিরে আমি এতগুলি লোক রাখাও অনাবশ্যক মনে করি। ভাল বিশ্বাসী লোক ৪।৫ জন থাকিলেই যথেষ্ট। আর মফস্বলে যে দুইটী কাছারী আছে, সেখানেও বেশী বেতন দিয়া দুই জন তহশীলদার নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছি। কম বেতনের কর্ম্মচারিগণ প্রায়ই চোর হয়। বাড়ীতে অনেকগুলি অতিরিক্ত দাস দাসী ছিল, তাহাদের অধিকাংশ বিদায় করিয়া দিয়াছি। এইরূপ সকল বিষয়েই সুবন্দোবস্তের চেষ্টা করিতেছি। আমি নিজেও মফস্বলের গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া প্রজাদিগের নিকট খাজানা আদায়ের চেষ্টা করিতেছি। অধিকাংশ প্রজাই আমার এই দুরবস্থা দেখিয়া এক বৎসরের খাজানা আগাম দিতে সম্মত হইয়াছে। কিন্তু বৎসরের অবস্থাও বড় ভাল নয়, তাহাদেরই বা কি বলা যায়। দেখা যাক্ কত দূর কি হয়।”

"এখন দেনা শোধের কি উপায় করিয়াছেন ?"

"এখন পর্য্যন্ত কিছুই ঠিক করিতে পারি নাই। তবে তোমার সহিত এ বিষয়ে একটা পরামর্শ আছে ; সেজন্য তোমাকে আসিতে লিখিয়াছিলাম।"

"বলুন। আমার দ্বারা আপনার যদি কোন উপকার হয়, তবে আমি প্রাণপণে তাহা করিব।"

"ঐ পশ্চিমের দিকে তাকাইয়া দেখ—একটী বিস্তীর্ণ শালবন—প্রায় ৫ মাইল ব্যাপিয়া আছে। ইহার মধ্যে মধ্যে কয়েকটী ছোট পাহাড়ও দেখিতেছ। আমার মনে হয়, যদি এই শাল গাছ কাটিয়া অন্যত্র চালান দেওয়া যায় তবে এই ব্যবসায়ে অনেক টাকা লাভ হইতে পারে। তুমি ইহার কোন বন্দোবস্ত করিতে পার কি ? তোমাকে আমি অবশ্যই লাভের অংশ দিব, কিম্বা যদি মাসিক বেতনে কাজ করিতে স্বীকৃত হও, আমি তাহাতেও রাজি আছি। দেখ, আমি তোমাকে বিশেষরূপে বিশ্বাস করি বলিয়া তোমাকে এ কাজের ভার দিতে চাহি। আমার আমলাগণের কাহাকেও আমি এ ভার দিতে চাহি না। তুমি আইন-পরীক্ষায় ফেল হইয়া এখন ত একরকম বসিয়াই আছ ! আর ওকালতী করিয়াই বা বেশী কি করিবে ? আমার বিশ্বাস, তুমি এই ব্যবসায়ে যোগদান করিলে, তোমার ভবিষ্যতে অনেক উন্নতির আশা আছে।"

অভিরাম কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল—"আপনি ঠিক বলিয়াছেন। আমি যে আর প্লিডার-সিপ্ পাশ করিয়া ওকালতী করিতে পারিব, আমার সে ভরসা নাই। তবে আপনি বড় লোক, রাজা, আপনি আমার হিতৈষী, আপনার দ্বারা অনেক উপকার প্রত্যাশা করি ; আপনি ইচ্ছা করিলে, আমার মত এক জন লোকের অনেক উন্নতিবিধান করিতে পারেন। আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন ও ভালবাসেন, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। আমি আপনার উপদেশ অনুসারেই চলিব—এ সুযোগ কখনও ছাড়িব না। আপনি এই শালকাঠ অন্যত্র লইয়া বিক্রয় করিবার

কথা বলিতেছেন, কিন্তু অন্যত্র লইয়া যাওয়ার প্রয়োজন কি? এখানেই ইহা বিক্রয় হইতে পারে।”

নবঘন সাগ্রহে বলিলেন—“সে কি রকম?”

অভিরাম বলিল—“আপনি অবশ্যই শুনিয়াছেন, মান্দ্রাজ হইতে ইষ্ট কোষ্ট্ রেলওয়ে লাইন এ দিকে আসিতেছে। খোড়দা পর্য্যন্ত তাহারা লাইন কাটিয়া আসিয়াছে—শীঘ্রই আপনার এলাকার নিকট আসিবে, এমন কি, আপনার এলাকার মধ্য দিয়া সে লাইন যাইতে পারে। সেই রেলওয়ের জন্য অনেক স্লিপার কাঠের প্রয়োজন হইবে, অনেক পাথরও লাগিবে।”

নবঘন উৎসাহের সহিত উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—“বেশত! তুমি খুব ভাল পরামর্শ করিয়াছ! আমার মাথায় কিন্তু এ পর্য্যন্ত ইহা আসে নাই। আচ্ছা, তুমি কালই যাও, সেই রেলওয়ের এজেন্টের নিকট গিয়া এই শাল কাঠ ও পাথর বিক্রয় করিবার একটা বন্দোবস্ত করিয়া এস।”

“আপনি অত ব্যস্ত হইবেন না। আমি বলি শুনুন,—এখন কেবল লাইন ঠিক হইতেছে, এখনও অনেক দেরী। প্রথমে লাইন ঠিক হইবে, পরে জমি সংগ্রহ করা হইবে, পরে আপনার কাঠ ও পাথরের দরকার হইবে। তাহারা এত আগে কাঠ ও পাথর কিনিবে কেন? আর কোন্ জায়গা দিয়া লাইন যাইবে, তাহাও ত ঠিক হয় নাই। তাহারা লাইনের সন্নিকটবর্ত্তী স্থান হইতেই কাঠ ও পাথর কিনিবে। দূর হইতে লইতে তাহাদের যে অনেক খরচ পড়িবে।”

“তবে এখন তুমি গিয়া তাহাদের এজেন্টের সঙ্গে কথাবার্ত্তা করিতে পার, যাহাতে তাহারা আগাম টাকা দিয়া নেয়।”

অভিরাম (একটু হাসিয়া) তাহাদের ত এখনও আপনার মত এত বেশী গরজ নাই! যাহা হউক, আমি কালই যাইব। দেখি কি করিতে পারি। কিন্তু ইহাতে আপনার উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার হওয়ার

সম্ভাবনা কম। তবে আমি কটকের ও কলিকাতার কাঠ-ব্যবসায়িগণের নিকট এই শাল কাঠ বিক্রয়ের প্রস্তাব করিতে পারি।"

"আচ্ছা—তোমার উপর এই সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভার রহিল। চল, সন্ধ্যা হইয়া আসিল—আমরা এখন আস্তে আস্তে নামিয়া পড়ি।"

ইহা বলিয়া দুই জনে উঠিলেন ও পাহাড় হইতে নিম্নে অবতরণ করিতে লাগিলেন। এখন সূর্য্য অস্ত যায় যায় হইয়াছে। পাহাড়ের উপরের বৃক্ষশ্রেণীতে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। পক্ষিগণ ডাকিতে ডাকিতে কুলায়ে ফিরিয়া আসিতেছে। পাহাড়ের নিম্নদেশ হইতে গাভীর হাম্বারব শুনা যইতেছে। নবঘন ও অভিরাম নিঃশব্দে নামিয়া যাইতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহারা দেব-মন্দিরের পশ্চাৎভাগ দিয়া অবতরণ করিয়া, সেই মন্দিরের প্রশস্ত সোপান-শ্রেণীর উপর উপবেশন করিলেন। তখন চাঁদ উঠিয়াছে। তাঁহাদের পার্শ্বস্থ বকুল বৃক্ষের ছায়া মন্দিরের প্রাঙ্গনে পড়িয়াছে। মৃদুমন্দ সমীরণে গাছের পাতা কাঁপিতেছে, তাহার ছায়াও কাঁপিতেছে। আর সম্মুখস্থ সরোবরের নীল জলও মৃদু পবনসঞ্চালনে কাঁপিতে কাঁপিতে ক্ষুদ্র বীচিমালায় পরিশোভিত হইতেছে। নানা দিক্ হইতে পক্ষীর কলরব শুনা যাহতেছে। গাছের উপর বসিয়া একটী কোকিল ভয়ানক গলাবাজি করিতেছে। তাহার স্বর-তরঙ্গের প্রতিঘাতে যেন গাছের বকুল ফুল ঝর্ ঝর্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে।

নবঘন বলিলেন, "দেখ, কেমন পরিষ্কার জ্যোৎস্না উঠিয়াছে!—এইরূপ জ্যোৎস্নালোকে সেই কাটজুড়ী তীরে বেড়ানর কথা মনে পড়ে কি?"

"হাঁ—পড়ে বই কি? আর আপনার সেই সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে বক্তৃতাও মনে পড়ে।"

নবঘন (একটু হাসিয়া) ভাল কথা, তোমার বিবাহের কথাত কিছুই আমাকে বল নাই? পাত্রীটী কেমন? পছন্দ হইয়াছে ত?"

"আপনার সে খবরে কাজ কি? আপনি ত বিবাহ করিবেনই

না প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন ? এখনও সেই দাসীর ভয় আছে কি ? কেন, আপনি ত এখন স্বাধীন ?"

"হাঁ, আমার আবার বিবাহ ! আমি এখন যেরূপ ঋণদায়ে বিপদ্-গ্রস্ত, এখন আমার সে চিন্তার কোনই অবসর নাই।"

"চিরদিন ত আর আপনার এই ঋণদায় থাকিবে না ? বিবাহ করিতেই হইবে, তবে এখনই করুন, আর পাঁচ দিন পরেই করুন ! আর আপনি যদি আমার কথা শোনেন, তবে আমি এরূপ একটা সম্বন্ধ করিয়া দিতে পারি যে, তাহাতে আপনি এখনি ঋণদায় হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন !—আর দাসীর ভয়ও থাকিবে না—আর কন্যাটীও রূপে গুণে আপনারই যোগ্যা হইবে।"

"সে কেমন ? তুমি নিশ্চয়ই ঠাট্টা করিতেছ। আর তুমি আমাকে বোধ হয় কাহারও নিকট বিক্রয় করিতে চাহিতেছ !"

"না, ঠাট্টা নয়, আমি প্রকৃত কথাই বলিতেছি। সে কন্যাটীর কথা আমি বিশেষরূপে জানি। আপনি অবশ্যই জানেন, চাণক্য মুনি বলিয়া-ছেন "স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি।" কিন্তু আমি যে কন্যাটীর কথা বলিতেছি সেটী বাস্তবিকই একটী রত্ন ! অথচ সেটী দুষ্কুলেও জন্মগ্রহণ করে নাই। তবে অবশ্যই কোন রাজকন্যা নহে। কিন্তু আপনার ত রাজকন্যা বিবা-হের অমত পূর্ব্ব হইতেই আছে।"

"তবে কোন নীচবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই বোধ হয় তার বাপ খুব বেশী টাকা দিতে চায় ?"

"আজ্ঞে না। আপনি সেরূপ মনে করিবেন না—তাহা হইলে কি আর আমি সে সম্বন্ধ উপস্থিত করি ?"

"তবে আসল কথাটা ভাঙ্গিয়া বল না কেন ? সে কন্যাটী কে ?"

"সপ্তকোটের রাজার দৌহিত্রী—বীরভদ্র মর্দ্দরাজের কন্যা।"

"বটে ! হাঁ, আমি বীরভদ্র মর্দ্দরাজের কথা শুনিয়াছিলাম—লোকটী ভয়ানক দুর্দ্দান্ত ছিল। তাহার আবার কন্যা কিরূপ ?"

"কেন? লোকটী দুর্দ্দান্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহার বুঝি আর কন্যা থাকিতে পারে না?"

"আমি বলিতেছি—বীরভদ্র না মরিয়া গিয়াছে?"

"হাঁ, মরিয়াছেন বই কি। কিন্তু তাঁহার কন্যা ত আর মরে নাই? তাঁহার কন্যা শোভাবতী এখনও রূপ-শোভা বিস্তার করিয়া বাঁচিয়া আছে।"

"তুমি দেখিতেছি, তাহার একজন ভারি ভক্ত! তুমি তাহাকে দেখিয়াছ কি?"

"আমি নিজের দুই চক্ষুতে দেখি নাই বটে, কিন্তু বিবাহ করিবার পর আমার যে আর এক জোড়া চক্ষু হইয়াছে, সেই চক্ষুতে দেখিয়াছি!"

"বটে! সে কন্যাটী তোমার স্ত্রীর কেহ হয় না কি?"

"তাহার সম্পর্কে ভগিনী ও ঘনিষ্ঠতায় সখী।"

"তবে ত তাঁহার সার্টিফিকেটের কোন মূল্য নাই?"

"মূল্য আছে কি না, আপনি নিজেই দেখিতে পারেন। আমি যত দুর শুনিয়াছি, এরূপ রূপবতী ও গুণবতী কন্যা নিতান্তই দুর্লভ।"

"আচ্ছা, তাহা হইলে এত টাকা দিতে চাহে কেন?"

"দিতে চাহিবে কে? মর্দ্দরাজ সান্ত ত মরিয়া গিয়াছেন। তিনি উইল করিয়া তাঁহার নগদ সম্পত্তি ৫০ হাজার টাকা এই কন্যাটীকে বিবাহের যৌতুকস্বরূপ দিয়া গিয়াছেন! তাঁহার ইচ্ছা, কন্যাটী একটী সুপাত্রে পড়ে। আমার শ্বশুর, আর গোপালপুর মঠের মোহান্ত বাবাজী নরোত্তম দাস, সেই উইলের অছি নিযুক্ত হইয়াছেন। আপনার সঙ্গে কন্যাটীর বিবাহ হইলে, বিপদের সময় আপনার সে টাকায় অনেক উপকার হইবে, সন্দেহ নাই।"

"তবে—আমি বুঝি টাকার লোভে সেই মেয়েটীকে বিবাহ করিব? আমার দ্বারা তাহা হইবে না।"

অভিরাম মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন—কি বিপদ! আমি

কি তাই বলিতেছি? আমি বলি এই, কেবলমাত্র সেই কন্যাটীই বিশেষ লোভের বস্তু সন্দেহ নাই, টাকাটা কেবল তাহার একটী আনুষঙ্গিক প্রাপ্তিমাত্র। সে টাকার কথা চুলোয় যাক্, আপনি মনে করুন যেন, তাহার কিছুমাত্র টাকা নাই। আমি কেবল সেই মেয়েটীর জন্যই সেই মেয়েটীকে বিবাহ করিতে বলি?”

“তুমিও যেমন—আমার ত কালাশৌচও এখন পর্য্যন্ত যায় নাই! আমি বুঝি ইহার মধ্যেই বিবাহের জন্য পাগল হইব?”

“আজ্ঞে, আমি কি তাই বলিতেছি যে আপনি বিবাহের জন্য পাগল হইয়াছেন? কথাটা উঠিল, তাই আপনাকে বলিয়া রাখিলাম। সময়ে যদি আপনার বিবাহে মত হয়, তবে গরিবের কথাটা একটু স্মরণ করিবেন।”

“তুমি বুঝি তাহাদের কাছে ওকালতী নিয়াছ? পরীক্ষা পাশ না করিয়াই তোমার ওকালতীতে এই বিদ্যা, পরীক্ষা পাশ করিলে দেখিতেছি তুমি একজন ভারী উকিল হইবে!”

“কিন্তু মহাশয়ই ত আমাকে সে বিষয়ে ইতিপূর্ব্বেই অক্ষম মনে করিয়াছেন!”

নবঘন (একটু হাসিয়া)—“তোমার সঙ্গে আর কথায় পারিবার যো নাই। যাহা হউক, আপাততঃ এ সব প্রস্তাব না করিলেই আমি তোমার নিকট বাধিত থাকিব। আমাকে একবার শীঘ্রই পুরীতে যাইতে হইবে, একবার মোহান্ত চতুর্ভুজ রামানুজ দাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া দেখি, তাঁহার টাকাটা ক্রমে পরিশোধ করিবার কোন বন্দোবস্ত করিতে পারি কি না! তুমি এ দিকে শালকাঠ বিক্রয়ের বন্দোবস্ত কর!”

এই সময়ে দেব-মন্দিরে সান্ধ্য আরতির জন্য ঢাক, ঢোল, শঙ্খ, ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। তাঁহারা উভয়ে দেবদর্শনে গমন করিলেন।
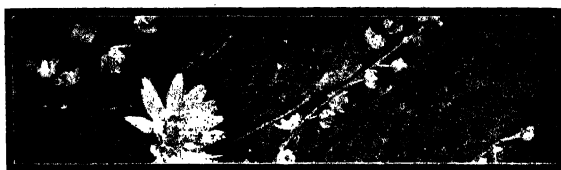
ষষ্ঠ অধ্যায়

পুরী—সমুদ্রতটে

আজ ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথি। পুরীনগরী আজ আনন্দ উৎসবে উন্মত্ত। আজ শ্রীশ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভুর দোলযাত্রা এবং শ্রীশ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জন্মোৎসব। সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। পূর্ণচন্দ্রের রজতকিরণে সেই সৌধ অট্টালিকাময়ী নগরীর শোভা শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ণসুধাকর-সমুজ্জ্বল সমুদ্রতীরের শোভা অনির্ব্বচনীয়!

পাঠক কখনও চন্দ্রালোকে পুরীর সমুদ্রতীরে বেড়াইয়াছেন কি? যদি বেড়াইয়া থাকেন ভালই; নচেৎ সেই মহৎ অপেক্ষাও মহান্, বিশাল মনোহর দৃশ্য লেখনী দ্বারা আঁকিয়া দেখাইতে পারি সে ক্ষমতা আমার নাই। সেই রজত-ধবল সৈকতভূমি—কোথাও উচ্চ, কোথাও নীচ—স্থানে স্থানে সৌধ-অট্টালিকাখচিত—শুভ্র চন্দ্রকিরণ অঙ্গে মাখিয়া হাসিতেছে। সেই অনন্তপ্রসারিত দিগন্তপ্রধাবিত, সুনীল সমুজ্জ্বল নীলাম্বুধি তরল স্নিগ্ধ শশিকরসম্পাতে এক অনুপম মাধুর্য্যময় দিব্যকান্তি ধারণ করিতেছে—যেন অনন্ত সৎসাগরে চিদানন্দ-সুধা উছলিয়া উঠিতেছে। সম্মুখে, সুদূরে অনন্ত নক্ষত্রখচিত, ঈষৎ নীলাভ আকাশ সেই গাঢ় নীলোজ্জ্বল বারিরাশির মধ্যে হেলিয়া পড়িয়াছে—যেন অনন্ত আকাশ অনন্তসাগরকে আলিঙ্গন করিতেছে। সুদূরে ঈষৎ কম্পমান সাগরবক্ষ

চন্দ্রালোকে টলমল করিতেছে, কিন্তু তটপ্রান্তে উচ্চ ঊর্ম্মিমালা রজতমুকুট শিরে ধারণ করিয়া হেলিয়া ঢুলিয়া নাচিতে নাচিতে ছুটিয়া আসিতেছে— আসিয়াই বেলাভূমি ডুবাইয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ সবেগে ছুটিয়া পলাইতেছে। বীচিমালার এই অবিশ্রান্ত লাস্যলীলা সৈকতভূমিকে একবার ভাঙ্গিতেছে, আবার গড়িতেছে,—আবার ভাঙ্গিতেছে, আবার গড়িতেছে; তাহাকে শুভ্র ফেণপুঞ্জে সুশোভিত করিতেছে। সৃষ্টির কোন্ সুদূর অতীত কাল হইতে এই লীলাখেলা চলিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আর বারিধির সেই গভীর বজ্রনির্ঘোষ, কর্ণকুহর ভেদ করিয়া অতি প্রচণ্ড আঘাতে হৃদয়ের কপাট খুলিয়া দেয়, - খুলিয়া দিয়া হৃদয়ের অন্তস্তলে লুক্কায়িত গভীর ভাব সকল টানিয়া বাহির করে। তোমার পশ্চাতে চাহিয়া দেখ— ঐ অভ্রভেদী শ্রীমন্দির যেন পুরীনগরীর চূড়ারূপে বিরাজ করিতেছে; কিন্তু সুদূর সাগরবক্ষে দাঁড়াইলে দেখিবে নীল বারিরাশির মধ্যে যেন একটী কুবলয়কোরক ভাসিতেছে। অনন্ত-সাগর যথার্থই অনন্তদেবের সুবিশাল প্রতিকৃতি। এই অকূল সাগরতটে দাঁড়াইলে সেই অনন্ত-পুরুষের আভাষ হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। তাঁহার অনাদি সৃষ্টির অসীম বিশালতা উপলব্ধি করা যায়। তাই ঐ একটী যুবক সমুদ্রতীরে রাস্তার ধারে একখানা কাষ্ঠাসনে বসিয়া ভাবে বিভোর হইয়া নির্নিমেষ নেত্রে সমুদ্রের দিকে তাকাইয়া আছে।

কতকক্ষণ পরে যুবকটীর চৈতন্যোদয় হইল—তিনি অদূরে একটী সুমধুর সঙ্গীতধ্বনি শুনিতে পাইলেন। সে সঙ্গীত, সমুদ্রের গভীর গর্জ্জনকে এক এক বার ভেদ করিয়া উঠিতেছে, আবার নামিতেছে—তাহার সুমধুর তান যেন অমৃত নিস্যন্দন করিতেছে। নবঘন সেই সঙ্গীত লক্ষ্য করিয়া ধীরেধীরে অগ্রসর হইলেন—নিকটে গিয়া দেখিলেন, একজন বৃদ্ধ বালুকার উপরে বসিয়া ভক্তিগদগদ-কণ্ঠে একটী সংস্কৃত স্তোত্র পাঠ করিতেছেন—

* * * * *

শৃণোষ্যকর্ণঃ পরিপশ্যসি ত্বম্
অচক্ষুরেকো বহুরূপ-রূপঃ।
অপাদহস্তো জবনোগ্রহীতা
ত্বং বেৎসি সর্ব্বং নচ সর্ব্ববেদ্যঃ॥

অণোরণীয়াংসং অসৎস্বরূপং
ত্বাং পশ্যতো জ্ঞান নিবৃত্তিরগ্র্যা।
ধীরস্য ধীর্য্যস্য বিভর্ত্তি নান্যৎ
বরেণ্যরূপাৎ পরতঃ পরাত্মন্॥

ত্বং বিশ্বনাভির্ভুবনস্য গোপ্তা
সর্ব্বাণি ভূতানি তবান্তরাণি।
যদ্ভূতভব্যং তদণোরণীয়ঃ
পুমাংস্ত্বমেকঃ প্রকৃতেঃ পরস্তাৎ॥

একশ্চতুর্দ্ধা ভগবান্ হুতাশো
বর্চ্চো বিভূতিং জগতো দদাসি।
ত্বং বিশ্বতশ্চক্ষুরনন্তমূর্ত্তে
ত্রেধা পদং সংনিদধে বিধাতঃ॥

যথাগ্নিরেকো বহুধা সমিধ্যতে
বিকারভেদৈ রবিকার-রূপঃ।
তথা ভবান্ সর্ব্বগতৈকরূপো
রূপাণ্যশেষাণ্যনুপুষ্যতীশ॥

একস্ত্বমগ্র্যাং পরমং পদং যৎ
পশ্যন্তি ত্বাং সূরয়ো জ্ঞানদৃশ্যং।
ত্বত্তো নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ত্বয়ীহ
যদ্বাভূতং যচ্চ ভাব্যং পরাত্মন্॥

বৃদ্ধ এই স্তোত্র পাঠান্তে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। পরে মুদিত-নেত্রে কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত ভাবনিমগ্ন হইয়া রহিলেন। নবঘনও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পরে বৃদ্ধ চক্ষু মেলিয়াই তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া বলিতে লাগিলেন—

"সেই জ্ঞানময় অনন্ত মহাবিরাটমূর্ত্তি—এই মহাসাগরের ন্যায় বিশাল, তাহা আমি ধরিব কিরূপে? ক্ষুদ্র মানবের তাঁহাকে উপলব্ধি করা অসম্ভব, সুতরাং তাঁহাকে প্রেম করিবে কিরূপে? তাই আমার প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ এই মহাসাগরের তীরে বসিয়া কি প্রেমের গীত গাহিয়াছিলেন শুন:—

কদাচিৎ কালিন্দীতট-বিপিন সঙ্গীতক বরো
মুদাভিরীনারীবদনকমলাস্বাদন-মধুপঃ।
রমাশম্ভু ব্রহ্মা সুরপতি গণেশার্চ্চিতপদো
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥

ভুজে সব্যে বেণুং শিরসি শিখিপুচ্ছং কটিতটে
দুকূলং নেত্রান্তে সহচরী কটাক্ষেণ বিদধৎ।
সদাশ্রীমদ্‌বৃন্দাবনবসতিলীলাপরিচয়ো
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥

মহাম্ভোধেস্তীরে কনকরুচিরে নীলশিখরে
বসন্ প্রাসাদান্তে সহজ বলভদ্রেণ বলিনা।
সুভদ্রা মধ্যস্থঃ সকল সুরসেবাবসরদো
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥

কৃপাপারাবারঃ সজলজলদশ্রেণীরুচিরো
রমা বাণী রামঃ স্ফুরদমলপদ্মেক্ষণমুখঃ।
সুরেন্দ্রৈরারাধ্যঃ শ্রুতিমুখগণোদ্গীতচরিতো
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥

পরংব্রহ্মাপীশঃ কুবলয়দলোৎফুল্লনয়নো
নিবাসীনীলাদ্রৌ নিহিতচরণোঽনন্তশিরসি।
রসানন্দো রাধাসরসবপুরানন্দনসুখী
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥

রথারূঢ়ো গচ্ছন্ পথিমিলিত ভূদেব পটলৈঃ
স্তুতং প্রাদুর্ভাবং প্রতিপদমুপাকর্ণ্য সদয়ঃ।
দয়াসিন্ধুর্বন্ধুঃ সকলজগতাং সিন্ধুসদনো
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥

নচেদ্রাজৎরাজ্যং নচ কনকমাণিক্যবিভবো
ন যাচেঽহং রম্যাং সকলজনকাম্যাং বরবিধে
সদাকালেকামঃ প্রথম পঠিতোদ্গীতচরিতো
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥

হরত্বং সংসারং দ্রুততরমসারং সুরপতে
বরত্বং ভোগীশং সততমপরং নীরজপতে।
অহো দীনানাথনিহিতমচলং নিশ্চিতমিদং
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥

এই "জগন্নাথাষ্টক" গাইতে গাইতে বৃদ্ধের ভাবাবেশ হইল। তিনি নবঘনের দিকে চাহিয়া আবার বলিতে লাগিলেন—

"বলিতে পার, আমার সেই গৌর-সুন্দর কোথায়? এক দিন পুরী-বাসী যাঁহার এই মধুর গানে মোহিত হইয়াছিল, আজ তিনি কোথায়? ঐ শুন, পুরীবাসী আজ তাঁহার জন্মোৎসবে মাতিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতেছে, কিন্তু আমার গৌর-হরি আজ চারি শত বৎসর হইল, এই সমুদ্রতীরে কোথায় হারাইয়া গিয়াছে! ঐ সমুদ্র, তীরে ছুটিয়া আসিয়া আমার গৌরকে ভাসাইয়া লইয়াছে!—সমুদ্র! সেই অমূল্য-রত্ন উদরস্থ করিয়া তোমার বুঝি লোভ জন্মিয়াছে, তাই বার বার ছুটিয়া আসিতেছ? তাঁহাকে পাইলে না বলিয়া বুঝি হুস্ হুস্ রবে ঐ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছ, আর ক্রোধভরে ঐ গভীর গর্জ্জন করিয়া আকাশ কম্পিত করিতেছ? না—তুমি তাহাকে আর পাইবে না! সে যে আমার হৃদয়ের ধন—আমি তাহাকে হৃদয়-কন্দরে লুকাইয়া রাখিয়াছি!"

ইহা বলিতে বলিতে সেই মহাভাবপ্রাপ্ত বৃদ্ধের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। তাঁহার শরীর কাঁপিতে লাগিল। তিনি নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। নবঘন তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া বসিলেন। পাঠক অবশ্যই চিনিয়াছেন, এই বৃদ্ধ সেই নরোত্তমদাস বাবাজী।

কিছুক্ষণ পরে বাবাজীর চৈতন্য হইল। তিনি চক্ষু মেলিয়া নবঘনকে দেখিতে পাইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন—

"বাবা! তুমি কে? তুমি এখানে কেন?" নবঘন তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন—

"আপনি একটু সুস্থ হউন, পরে বলিতেছি।"

"আমার জন্য ভাবিও না বাবা, আমার মধ্যে মধ্যে এরূপ হয়।"

নবঘন বলিলেন, "আপনি সাধু—মহাপুরুষ!"

বৃদ্ধ চাদর দিয়া গা ঝাড়িয়া বলিলেন, "বাবা! আমি অতি দীন—আমি ক্ষুদ্র কীটাণুকীট। ঐ অনন্ত আকাশে অনন্ত কোটী তারকারাজি—এই অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় আমাদের এই পৃথিবী কত ক্ষুদ্র—এই সমুদ্রতীরের বালুকাকণা অপেক্ষাও ক্ষুদ্র! সেই পৃথিবীর তুলনায় মানুষ কত ক্ষুদ্র, একবার ভাবিয়া দেখ—এই মহাসমুদ্রের বক্ষে যেন একটী ক্ষুদ্র তরঙ্গ! বাবা, এই অনন্ত বিশ্ব-রাজ্যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মানুষের স্থান কতটুকু?"

নবঘন বিনীতভাবে বলিলেন—

"আজ্ঞে, তবে মানুষ কি কখনও বড় হইতে পারে না?"

"পারে বৈ কি? মানুষ যেমন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, তেমন আবার তাহার মধ্যে এক বৃহৎ হইতেও বৃহত্তর বস্তুর বীজ লুক্কায়িত রহিয়াছে। সে কি? না, চিচ্ছায়া—সচ্চিদানন্দ অনন্ত পুরুষের প্রতিবিম্ব। কিন্তু সেই অমূল্য বস্তুর অস্তিত্ব কয় জনে বুঝিতে পারে? কয় জনে তাহার মূল্য বুঝে, বাবা! এই সংসারে অধিকাংশ লোকের মধ্যেই সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গটুকু ভস্মাচ্ছাদিত হইয়া প্রায় নিবিয়া রহিয়াছে। জন্মান্তরীণ সুকৃতিবলে যিনি অনুশীলন দ্বারা সেই আগুন জ্বালাইতে পারেন, তিনিই মহাপুরুষ। যে যুগে এইরূপ একজন মহাপুরুষের অভ্যুদয় হয়, সে যুগ ধন্য হয়! তখন সেই প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার সংস্পর্শে আসিয়া অন্যান্য জীবের মধ্যেও লুক্কায়িত অগ্নিকণা বিনা আয়াসে জ্বলিয়া উঠে!"

"আজ্ঞে, মুক্তির কি তবে অন্য উপায় নাই? এই যে সহস্র সহস্র লোক তীর্থস্নান করিতেছে, জগন্নাথ দর্শন করিতেছে, ইহাদের কি মুক্তি হবে না? শুনিয়াছি, শাস্ত্রে বলে—"রথে তু বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।" ইহার অর্থ কি?"

"বাবা! তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। এই শাস্ত্রীয় বাক্য যথার্থ, কিন্তু ইহার অর্থ অন্য রকম। "রথ" অর্থ শরীর, আর "বামন" অর্থ এই শরীরস্থ আত্মা। কঠোপনিষদে এই রথের উল্লেখ আছে, যথা,—

"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু।" আর কঠোপনিষদে এই "বামনং" শব্দেরও উল্লেখ আছে, যথা,—

"মধ্যে বামনং আসীনং বিশ্বেদেবা উপাসতে।" অতএব জানা গেল, রথে কি না শরীরে, বামন কি না আত্মাকে দেখিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না—অর্থাৎ যিনি নিজ শরীরমধ্যস্থ আত্মাকে দর্শন করিতে পারেন, কি না শরীর মন বুদ্ধি অহঙ্কারাদি ইন্দ্রিয়বৃত্তির অতীত সেই পরমাত্ম বস্তুকে উপলব্ধি করিতে পারেন, তিনিই মুক্তিলাভ করেন। কারণ, শ্রুতি বলেন—"স যো হ বৈ তৎপরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।" যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মস্বরূপে পরিণত হন। বাবা! এখন ঘোর কলিকাল উপস্থিত। এখন মানুষের বড়ই শোচনীয় অবস্থা। এখন লোকে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট জ্ঞানমার্গ কি ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিতে চেষ্টা না করিয়া, মুক্তির সহজ উপায় সকল কল্পনা করিয়া লইতেছে। তাই অনেক স্থলে লোকে স্বকপোলকল্পিত মত ও শাস্ত্রার্থ বাহির করিয়া প্রবঞ্চিত হইতেছে ও অন্যকে প্রবঞ্চনা করিতেছে। "একবার তীর্থদর্শন করিলে বা তীর্থস্নান করিলেই মুক্তি লাভ হয়," "হরিনাম একবার মুখে আনিলে যত পাপ ক্ষয় হয়, মানুষের সাধ্য কি তত পাপ করে"—ইত্যাদি মত সকল এইরূপে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু বাবা, মনে রাখিও, মনুষের সহিত ঈশ্বরের যে ব্যবধান, তাহা পূর্ব্বে যতটুকু ছিল, এখনও ততটুকু আছে। পূর্ব্বে ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য মানুষকে যতটা কৃচ্ছ্রসাধন করিতে হইত, এখনও তাহাই করিতে হইবে। তাহার এক চুলও এদিক্ ওদিক্ হইবার সম্ভব নাই। বরং মানুষ এখন অধিকতর মায়ার বশীভূত হওয়াতে ঈশ্বর হইতে আরও অধিক দূরে সরিয়া পড়িতেছে।

"তবে তীর্থ দর্শনের কি কোন উপকারিতা নাই?"

"অবশ্যই আছে তাহা না হইলে কত কত মহান্ সাধুপুরুষ এই সকল স্থানে আগমন করেন কেন? কিন্তু তীর্থ-মাহাত্ম্য কয় জনে বুঝে বাবা?"

"আজ্ঞে সে কি রকম?"

"এই দেখ না কেন, বৎসর বৎসর কত সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ নরনারী গয়াধামে শ্রীবিষ্ণুপাদচিহ্ন দর্শন করিতেছে, কিন্তু কয় জনে তাহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিয়া কৃতার্থ হইতেছে? কিন্তু আমার শ্রীচৈতন্য সেই পাদ-চিহ্নের মধ্যে কি পরমবস্তু দেখিয়াছিলেন, যাহা দেখিবা মাত্র তাঁহার নেত্রযুগল হইতে যে প্রেমাশ্রুধারা প্রবাহিত হইয়াছিল তাহা আর কখনও থামিল না। এই জগন্নাথ মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি পাণ্ডাদিগের নিকট পয়সা রোজগারের একটী যন্ত্র বিশেষ; তোমার আমার নিকট, এমন কি অধি-কাংশ যাত্রীর নিকট উহা অন্যান্য পদার্থের ন্যায় একটী জড় পদার্থ বিশেষ, তবে অবশ্যই ভক্তির বস্তু সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার শ্রীগৌরাঙ্গ উহার মধ্যে কি পরম পদার্থ দেখিয়াছিলেন যে তিনি অতি সঙ্কোচে, সম্ভ্রমে, সন্তর্পণে, ভক্তিবিনম্রভাবে, উহা দর্শন করিতেন; এমন কি সেই মূর্ত্তির নিকটে অগ্রসর হইতে সাহস করিতেন না—অতি দূরে, সেই গরুড়স্তম্ভের নিকট দাঁড়াইয়া দর্শন করিতেন।"

ইহা বলিতে বলিতে বাবাজীর চক্ষে জল আসিল, তিনি চাদর দিয়া চক্ষু মুছিলেন।

"তাই বলিতেছি, তীর্থমাহাত্ম্য অতি অল্প লোকেই বুঝিতে পারে। অধিকাংশ লোকের নিকট তীর্থদর্শন গজস্নানের মত হয়। যখন তখন একটু ভক্তি শান্তি পবিত্রতার ভাব মনে আসিতে পারে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার সংসার আবর্ত্তে পড়িলে তাহা কোথায় ধুইয়া যায়। তবুও লোকে যদি অর্থ ও মর্ম্ম বুঝিয়া তীর্থের অনুষ্ঠানাদি করিত তবে কতকটা স্থায়ী ফল হইত।"

"একটা দৃষ্টান্ত দিয়া বলুন।"

"যেমন এই তীর্থে একটা নিয়ম আছে, তীর্থযাত্রী যে কোন একটা ফল মহাপ্রভুকে সমর্পণ করিবে, এজন্মে তাহা আর খাইবে না। এই ফলসমর্পণের মধ্যে অতি গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। ভগবান্‌কে ফল সমর্পণ করার অর্থ তাঁহাকে কর্ম্মফল অর্পণ করা। পূর্ব্বে গৃহিলোকে তীর্থে আসিয়া কোন একটা ফলসমর্পণের ছলে স্বীয় কর্ম্মফল ভগবান্‌কে সমর্পণ করিয়া যাইত, গৃহে ফিরিয়া গিয়া নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিত, আর কর্ম্মে লিপ্ত হইত না। লোকে এই অনুষ্ঠানের প্রকৃত মর্ম্ম ভুলিয়া গিয়াছে—এখন ইহা অর্থহীন প্রাণশূন্য বাহ্য আড়ম্বরে পরিণত হইয়াছে।"

নবঘন বলিলেন, "আপনার নিকট অনেক মূল্যবান্ উপদেশ শুনিয়া কৃতার্থ হইলাম। আমার আর একটি জিজ্ঞাস্য আছে। আচ্ছা, পুরুষোত্তম ক্ষেত্র হিন্দুদিগের একটি প্রধান তীর্থস্থান। এখানে জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা ও ভক্তির কথা ত কিছুই শুনি না, কেবল ভোগরাগের কথাই শুনিতে পাই; লোকে ভোগ নিয়াই ব্যস্ত। জগন্নাথ মহাপ্রভু যেন এখানে কেবল ভোগ খাওয়ার জন্যই বিরাজমান আছেন?"

"বাবা! আজকালকার লোকেরা নিজেরা ভোগাসক্ত বলিয়া, তাহারা মনে করে, ঠাকুরও বুঝি কেবল ভোগ খাইতেই ভালবাসেন। তাই তাহারা ভোগ লইয়াই ব্যস্ত। আর সেই ভোগই বা প্রকৃত ভক্তিপূর্ব্বক কয়জন লোকে দিয়া থাকে? তুমি দেখিবে, এখানকার অধিকাংশ পাণ্ডা মোহান্ত মহাপ্রভুকে উপলক্ষ করিয়া নিজেদের ভোগলালসা চরিতার্থ করে। ঈশ্বরের প্রতি ভোগ্য বস্তু নিবেদন দ্বারা ভোগস্পৃহা ও বিষয়-বাসনার নিবৃত্তিই ভোগের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু এখন ভোগস্পৃহা চরিতার্থ করাই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

নবঘন। আপনার নিকট অনেক তত্ত্বকথা শিখিলাম। এরূপ জ্ঞানগর্ভ উপদেশ আর কখনও শুনি নাই। আপনার আকার প্রকার

দর্শনে আপনাকে একজন সাধু মহাপুরুষ বলিয়া বোধ হইতেছে। আপনার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?

বাবাজী। বাবা! আমি একজন নিতান্ত দীনহীন ক্ষুদ্র ব্যক্তি, এই ভবজলধির কূলে দাঁড়াইয়া ভয়ে কাঁপিতেছি—এই মহাসাগরের কাণ্ডারী গৌরহরিই আমার একমাত্র ভরসাস্থল। ঐ দেখ, মহাপ্রভু এই বিশাল জলধির কূলে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন "রে মোহাচ্ছন্ন জীব! তোমার ভয় নাই—ভয় নাই! মামেকং শরণং ব্রজ! একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও।" তাই তাঁহার শ্রীচরণে শরণ লইয়াছি। আমি তাঁহারই দাসানুদাস—আমার নাম শ্রীনরোত্তম দাস, আমি গোপালপুর মঠে শ্রীগোপালজীর সেবক।

নবঘন। বটে? আপনি গোপালপুরের মোহান্ত? আপনার নাম পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম। আজ আমার শুভদিন, মহাপুরুষের দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলাম।

বাবাজী। বাবা! তুমি কে? তোমার কথাবার্ত্তা ও সুন্দর আকৃতি দ্বারা তোমাকে সুশিক্ষিত উচ্চবংশীয় ভদ্র সন্তান বলিয়া বোধ হইতেছে।

নবঘন। আমার নাম নবঘন হরিচন্দন—আমার পিতা কনকপুরের রাজা অল্পদিন হইল পরলোক গমন করিয়াছেন।

বাবাজী। কি, তুমি রাজা ব্রজসুন্দরের পুত্র? ভাল, বাবা! আমি শুনিয়াছি তুমি বি. এ. পাশ করিয়াছ, যাহা আমাদের দেশের কোন রাজা জমিদারের ছেলে এ পর্য্যন্ত করিতে পারে নাই। তোমার পিতার দেশ-বিখ্যাত নাম, তাঁহার নিকট গিয়া কেহ কখনও রিক্তহস্তে ফিরিয়া আসে নাই।

নবঘন। কিন্তু আমি এখন বড়ই বিপন্ন—ঋণের দায়ে এখন রাজশ্রী যায় যায় হইয়াছে।

বাবাজী। কেন, তোমার কত টাকার ঋণ?

নবঘন। মোহান্ত চতুর্ভুজ রামানুজ দাস দুইবছর আগে ৩৫ হাজার টাকার এক ডিক্রি করিয়াছিলেন, এখন সেই ডিক্রি জারি করিয়া মহাল ক্রোক দিবেন বলিলেন। আমি তাঁহাকে আরও কিছুদিন সময় দিতে বলিলাম, তাহা শুনিলেন না। এতদ্ভিন্ন খুচরা দেনাও প্রায় ২০ হাজার টাকা হইবে।

বাবাজী। (একটু বিষণ্ণ হইয়া) তাইত! এ টাকা পরিশোধের কি কোন উপায় নাই?

নবঘন। কোন উপায় নাই। মহালে যে বাকি বকায়া আছে তাহা দ্বারা সদর খাজানাই শোধ হওয়া কঠিন। আমি এখন সম্পূর্ণ নিরুপায়, আমার প্রধান দুঃখ এই আমি এত লেখা পড়া শিখিলাম কিন্তু আমা দ্বারা পূর্ব্বপুরুষের অর্জ্জিত রাজগী রক্ষা হইল না! আমার মনে হয়, এই সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলে বুঝি আমার দুঃখের অবসান হয়।

ইহা বলিয়া নবঘন চাদর দিয়া চক্ষু মুছিলেন।

বাবাজী বলিলেন—"বাবা! বিপদে এরূপ অধীর হইও না। এই সকল বিপদ কিছুই না, আকাশের মেঘের ন্যায় এই আছে এই নাই, তুমি যুবা-পুরুষ, তুমি সুশিক্ষিত, বুদ্ধিমান, রাজার ছেলে, রাজা। তুমি চেষ্টা করিলে ভগবানের কৃপায় নিশ্চয়ই অবস্থার উন্নতি করিতে পারিবে।"

বাবাজী ইহা বলিয়া কিছুক্ষণ কি ভাবিলেন, পরে আবার বলিলেন—

"বাবা তুমি বিবাহ করিয়াছ?"

"না"

বাবাজী আরো কিছুক্ষণ ভাবিলেন, পরে বলিলেন—

"বাবা! তোমার অবস্থা দেখিয়া আমার মনে বড় কষ্ট হইতেছে, কিন্তু কি উপায়ে তোমার উপকার হয়, তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না। যদি দুই এক হাজার টাকার কাজ হইত, তবে আমি আমার গোপালের ভাণ্ডার হইতে তোমাকে বরং আপাততঃ হাওলাত দিতে পারিতাম, কিন্তু

তোমার যে অগাধ টাকার দরকার! যাহা হউক, আমি ভাবিয়া দেখিলাম —তাহারও এক পথ আছে, তুমি কি মনে করিবে জানি না—”

বাবাজীর কথা শুনিয়া নবঘনের মনে একটু আশার সঞ্চার হইল, তিনি বলিলেন—

“মহাশয়! আপনি অতি দয়ালু, আপনি কৃপা করিয়া আমার উপকারের কথা বলিতেছেন, তাহাতে আমি আবার কি মনে করিব?”

বাবাজী। বাবা! কথা এই, আমার নিজের কোন টাকা নাই, কিন্তু আমার একজন অনুগত ব্যক্তি আমাকে তাঁহার সম্পত্তির অছি নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন। বোধ হয় কোদণ্ডপুরের বীরভদ্রমর্দ্দরাজের নাম শুনিয়াছ, আমি তাঁহারই কথা বলিতেছি। বীরভদ্রের নগদ ৫০ হাজার টাকা ছিল, তিনি তাহা তাঁহার কন্যাকে বিবাহের যৌতুকস্বরূপ উইলের দ্বারা দিয়া গিয়াছেন। সে কন্যাটীর এখনও বিবাহ হয় নাই। সে বয়ঃস্থা, পরম রূপবতী ও অশেষ গুণবতী। তবে তুমি রাজপুত্র, নিজেই রাজা— আমার শোভাবতী তোমার উপযুক্ত হইবে কি না জানি না। যদি সকল বিষয়ে তোমার উপযুক্ত হয়, তবে আমি তাহার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিতে পারি। তাহা হইলে তুমি আপাততঃ সেই টাকাটা দ্বারা সমস্ত দেনা শোধ করিতে পারিবে ও এই উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারিবে, আর আমিও তোমার ন্যায় রূপগুণসম্পন্ন উপযুক্ত বরের হস্তে সেই কন্যারত্নটীকে দান করিয়া তাহার পিতার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছিলাম, তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারি। কিন্তু বাবা! সে টাকাটা আমার শোভাবতীর স্ত্রীধন, তোমাকে আবার তাহার সেই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে।

বাবাজীর কথা শুনিয়া নবঘন অভিরামের কথা স্মরণ করিলেন। অভিরাম শোভাবতীর সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিল, তাহাতে তাহার প্রতি নবঘনের মন কতকটা আকৃষ্ট হইয়াছিল। এখন আবার বাবাজীর মুখে

তাহার রূপ গুণের প্রশংসা শুনিয়া তিনি বুঝিলেন শোভাবতী রূপে গুণে, কুলে শীলে তাঁহার সম্পূর্ণ উপযুক্ত, সে বিষয়ে কিছু মাত্র সংশয় নাই। তৎপরে নবঘনর ঘাড়ের উপর এই এক মহাবিপদ উপস্থিত। যদি শোভাবতীকে বিবাহ করিয়া তিনি মনের মত স্ত্রী লাভ, সঙ্গে সঙ্গে ঋণ পরিশোধ, সম্পত্তি রক্ষা ও সর্ব্বপ্রকার সুখলাভ করিতে পারেন, তবে তাহাতে তিনি অসম্মত হইবেন কেন? তিনি নানারূপ চিন্তা করিয়া শেষে বাবাজীকে বলিলেন—

"মহাশয়! আমার আপাততঃ বিবাহ করিবার ইচ্ছা ছিল না। তবে আমার যে বিপদ উপস্থিত তাহাতে বিবাহ করিয়া যদি আমি এই বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারি ও পূর্ব্বপুরুষগণের রাজগীটা রক্ষা করিতে পারি, তবে আমার তাহাতে অমত নাই। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে আমার মাতার সম্মতি লওয়া আবশ্যক। দ্বিতীয় কথা, আমার এখন কালাশৌচ, বৈশাখ মাসের শেষে ভিন্ন বিবাহ হইতে পারিবে না।

বাবাজী। বাবা! তুমি যে কালাশৌচের কথা বলিতেছ, কন্যার পক্ষেও তাহাই। সেজন্য ভাবিও না, বৈশাখ মাসের শেষেই বিবাহের দিন স্থির করা যাইবে। আমি নিজে গিয়া তোমার মাতার মত জানিয়া আসিব। তাঁহার মত হইলে মোহান্ত চতুর্ভুজ রামানুজ দাসের নিকট আমি চিঠি দিলেই তিনি মহাল ক্রোক করা স্থগিত করিবেন। আমি যে টাকার কথা বলিলাম, তাহাও তাঁহারই নিকট আমানত আছে। সুতরাং তোমার ঋণ পরিশোধ ত এক মুহূর্ত্তেই হইবে। এদিকে বীরভদ্রের এক ভাই বাসুদেব মান্ধাতাও উইলের অছি আছেন, তাঁহারও মত জানা আবশ্যক হইবে। তবে আমি একথা নিশ্চয় বলিতে পারি যে তোমার ন্যায় বরের হস্তে শোভাবতীকে সম্প্রদান করা তিনি নিতান্ত সৌভাগ্যের বিষয় মনে করিবেন। আর একটা কথা আগেই বলিয়া রাখি। শোভাবতীর এক বিমাতা আছেন, তিনি হয়ত এ বিবাহে মত দিবেন না, এবং আমি

শুনিয়াছি, তাঁহার ভ্রাতার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া যাহাতে এ বিবাহ না হয়, সে পক্ষে তিনি চেষ্টা করিবেন। কারণ এই টাকাগুলির উপর তাঁহাদের ভারি লোভ জন্মিয়াছে। যাহা হউক, আমরা চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই তোমার সহিত শোভাবতীর বিবাহ দিতে পারিব। রাত্রি অধিক হইয়াছে, চল আমরা এখন যাই। একবার মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে যা'বে কি? এখন দর্শনের বড় উৎকৃষ্ট সময়।

নবঘন উঠিয়া বলিলেন "চলুন।"

তাঁহারা উভয়ে শ্রীমন্দিরে চলিলেন। তখন রাত্রি প্রায় ৮টা। মন্দিরের সম্মুখে সুপ্রশস্ত "বড়দাণ্ড" জ্যোৎস্নালোকে আলোকিত হইয়াছে। সিংহদ্বারের সম্মুখে সুচিক্কণ কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত অরুণস্তম্ভটি চন্দ্রকিরণে ঝক্ ঝক্ করিতেছে। তাঁহারা সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশ করিলেন ও প্রশস্ত সোপানশ্রেণী আরোহণ করিয়া মন্দিরের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। তখন মহাপ্রভুর সন্ধ্যা-আরতি শেষ হইয়াছে, কিন্তু প্রাঙ্গণে সংকীর্ত্তন হইতেছে। মন্দিরের মধ্যে জনতা কম। তাঁহারা শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। আজ দোল পূর্ণিমা, তাই শ্রীমূর্ত্তিকে রাজবেশে সজ্জিত করা হইয়াছে। সুবর্ণনির্ম্মিত হস্তপদ, মস্তকে কনক কিরীট, পরিধানে বহুমূল্য পট্টবস্ত্র, গলায় মনোহর পুষ্পহার ও মণিরত্নময় আভরণ স্তরে স্তরে সাজান, সর্ব্বাঙ্গ চন্দনচর্চ্চিত ও আবির কুঙ্কুম রঞ্জিত। উচ্চ "রত্ন-বেদি"র উপরে এইরূপ বেশভূষায় সজ্জিত তিনটী মূর্ত্তি বিরাজমান রহিয়াছেন। পবিত্র ধূপ ধূনা ও চন্দন চুয়ার গন্ধে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত। ভক্তগণ কেহ রত্ন-বেদি প্রদক্ষিণ করিতেছেন, কেহ "জয় জগন্নাথ" রবে মহাপ্রভুর পাদমূলে পতিত হইতেছেন, কেহ দূরে দাঁড়াইয়া স্তোত্রপাঠ করিতেছেন, কেহ কাতরকণ্ঠে অশ্রুপূর্ণ নয়নে মহাপ্রভুর নিকট মনোগত প্রার্থনা জানাইতেছেন।

মহাপ্রভুর সম্মুখে কিঞ্চিৎদূরে গরুড়স্তম্ভ। নবঘন ও নরোত্তম দাস বাবাজী সেস্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়া দর্শন করিতে লাগিলেন। একজন

শ্বেতবর্ণের ঘাঘরা পরা, বর্ষীয়সী নর্ত্তকী শ্বেত চামর ঢুলাইতে ঢুলাইতে নিম্নলিখিত জয়দেব পদাবলী গান করিল।

"শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল, ধৃতকুণ্ডল, কলিতললিতবনমাল।
জয় জয় দেব হরে॥
দিনমণিখণ্ডনমণ্ডন ভবখণ্ডন মুনিজনমানসহংস॥
কালিয়বিষধরগঞ্জন জনরঞ্জন যদুকুলনলিনদিনেশ॥
মধুমুরনরকবিনাশন গরুড়াসন সুরকুলকেলিনিদান॥

অমলকমলদললোচন ভবমোচন ত্রিভুবন ভবননিধান॥
জনকসুতাকৃতভূষণ জিতদূষণ সমরশায়িত দশকণ্ঠ॥
অভিনবজলধরসুন্দর, ধৃতমন্দর শ্রীমুখচন্দ্রচকোর॥
তব চরণে প্রণতা বয়মিতি ভাবয়, কুরু কুশলং প্রণতেষু
শ্রীজয়দেবকবেরিদং কুরুতে মুদং মঙ্গলমুজ্জ্বল-নীতি॥

গায়িকার স্বর সুমধুর, উচ্চারণ পরিশুদ্ধ, গান সুরতানলয়-সংযুক্ত। সেই সঙ্গীত শ্রবণে সকলে মোহিত হইল। বাবাজির নয়নদ্বয় প্রেমাশ্রু-প্লাবিত হইল। তিনি "জয় জগন্নাথ" বলিতে বলিতে লুটাইয়া পড়িলেন।

কিছুক্ষণ পরে নবঘন বাবাজীর সহিত মন্দির হইতে বাহিরে আসিলেন। তাঁহারা শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ করিতেছেন, এমত সময়ে দেখিলেন একজন মলিন-বসন, শীর্ণ-কলেবর লোক মহাপ্রভুর নাম বারম্বার উচ্চারণ করিতে করিতে পাষাণ-সোপানে মাথা ঠুকিতেছে আর রোদন করিতেছে। বাবাজী ও নবঘন তাহার অবস্থা দেখিয়া দাঁড়াইলেন। তখন সে তাঁহাদিগকে দেখিয়া বলিতে লাগিল—

"আমি আর এ জীবন রাখিব না—আজ মহাপ্রভুর মন্দিরে, তাঁহার সম্মুখে মাথা ঠুকিয়া মরি[illegible] আমার উপরে তাঁহার একটুও দয়া হইল

না? আমি আর ঘরে যাইব না—ঘরে যাইয়া কি করিব? আমার "পেলা কুটুম" দানা বিনা মারা যাইতেছে—আমার মরাই ভাল।"

পাঠক ইহাকে চিনিলেন কি? এ সেই মণিনায়ক। বাবাজী তাহাকে অভয় দিয়া সঙ্গে লইয়া চলিলেন।

সপ্তম অধ্যায়

পুরীর আদালত।

পুরী একটা জেলা না মহকুমা? এপ্রশ্ন আমাকে কোন কোন বন্ধু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আমি বলি উহা অর্দ্ধ-জেলা। অর্থাৎ ফৌজদারী বিচার বিভাগানুসারে উহা একটী জেলা, কিন্তু দেওয়ানী বিচার বিভাগানুসারে উহা একটী মহকুমা। আমি যদি বলি উহা একটী পুরা জেলা, অভিজ্ঞ পাঠক অমনি ধরিয়া বসিবেন, "এ কেমন কথা? জজ নাই, সব জজ নাই—সেটা আবার একটা জেলা?" কাজে কাজেই আমি পুরীকে জেলা বলিতে সাহস করি না। কটক, পুরী ও বালেশ্বর তিন জেলায় একজন জজ, একজন সবজজ। তাঁহারা কটকেই থাকেন। পুরীতে সবে-ধন-নীলমণি একটীমাত্র মুন্সেফ দেওয়ানী বিভাগ অলঙ্কৃত করিয়া বিরাজমান আছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উড়িষ্যায় অনেক সামাজিক ও বৈষয়িক বিবাদ পল্লীগ্রামে পঞ্চাইতগণ নিষ্পত্তি করিয়া থাকে। নিতান্ত দায়ে না ঠেকিলে, অথবা মাম্‌লাবাজ না হইলে, কেহ আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করে না। আবার এ দেশে ভূমিকর-সংক্রান্ত মোকদ্দমা এখন পর্য্যন্ত দশ আইন অনুসারে কালেক্টরিতে বিচার করা হয়। এ কারণে দেওয়ানী আদালতের হাকিমের সংখ্যা উড়িষ্যায় নিতান্ত কম।

পুরীর গবর্ণমেণ্ট আফিসসমূহ সমুদ্রতীরে বালির উপরে অবস্থিত।

আদালত গৃহটী ছোট একতালা কোঠা, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চলুন আমরা একবার এই কাছারিঘরে প্রবেশ করি।

পাঠক হয় ত মনে ভাবিতেছেন, এ উড়িয়া দেশের কাছারি, এখানে হাকিম আমলা উকীল সকলেই মস্তকে লম্বা টিকধারী, গলায় "কণ্ঠী"-পরা, কাণে "মুলী" পরা, সর্ব্বাঙ্গে তিলককাটা, খালি-গা, খালি-পা এবং প্রত্যেকেরই কোমরে একটী পানের "বোটুয়া" ঝুলিতেছে, তাহার মধ্য হইতে মধ্যে মধ্যে "পান-গুয়া-গুণ্ডী" বাহির করিয়া চর্ব্বণ করিতেছেন। কলিকাতার সহরে সর্ব্বত্রবিচরণকারী, পরস্পরকলহকারী, বহুবিধ-কার্য্য-কারী উৎকলবাসিবৃন্দকে দেখিয়া আপনার এরূপ ধারণা হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু বিচার-গৃহে একবার প্রবেশ করিলে আপনার সে ধারণা দূর হইবে। এই আদালতের হাকিম উড়িয়া নহেন, বাঙ্গালী। তাঁহার নাম যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। আমলা উকীল প্রায়ই উড়িয়া, কিন্তু তাঁহাদের বেশভূষা সভ্যভব্যরকমের। তবে মাথায় লম্বা টিকি, গলায় সূক্ষ্ম মালা, কপালে তিলকফোঁটা প্রায় সকলেরই আছে। হাকিম উচ্চ এজলাসে বসিয়াছেন। তাঁহার চেহারা খুব সুন্দর, বয়স প্রায় ৩৫ বৎসর, মুখে দাঁড়ি নাই—গোঁফ আছে; সাদা চাপকান চোগা পরিয়াছেন। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে পেস্কার অভিমন্যুমাহান্তি একটা বড় সাদা চাদর পাকাইয়া মাথায় মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায় এক প্রকাণ্ড ফেটা বাঁধিয়াছেন ও বেঞ্চের উপর বসিয়া অতিব্যস্ততাসহকারে লেখাপড়া করিতেছেন। এজলাসের সম্মুখে বেঞ্চের উপর উকীলগণ গুলজার হইয়া বসিয়াছেন। তাঁহাদের মোহরেরগণ পশ্চাদ্ভাগে কাণে কলম গুঁজিয়া সঞ্চরণ করিতে-ছেন। কেহ আসিয়া তাঁহার উকীলবাবুর দ্বারা একখানা ওকালতনামা দস্তখত করাইতেছেন, উকীল বাবু নাম দস্তখত করিবার আগে বায়নার টাকার জন্য মুয়কেল-সমীপে হাত বাড়াইতেছেন। কেহ আজ তিন দিন হইল ডিক্রিজারির দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত হুকুম বাহির

হয় নাই; সে জন্য আমলার নিকট কিরূপ "তদ্বির" করা আবশ্যক, উকীল বাবুর সহিত চুপে চুপে তাহার পরামর্শ করিতেছেন। কেহ আজ দুই দিন হইল নকলের দরখাস্ত দিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত নকল পান নাই; সে নকলটী লওয়া বড়ই জরুর, অথচ অতিরিক্ত ফিও দিবেন না; এখন আমলাকে কিঞ্চিৎ দক্ষিণান্ত করিলে আজই নকল পাওয়া যায়; উকীল বাবু মুয়ক্কেলের উপকারার্থে সে টাকাটা আপাততঃ নিজে দিবেন কি না, তাহাই জানিতে আসিয়াছেন। উকীল বাবু তখন একজন সাক্ষীর জেরা করিতেছিলেন, সাক্ষী তাঁহার মনোমত জবাব না দিয়া সত্য কথা বলিতেছিল, তিনি তাহাকে কোন প্রকার প্যাঁচে ফেলিতে পারিলেন না, এই জন্য তাঁহার মেজাজটা বড় ভাল ছিল না। তিনি বিরক্ত হইয়া "মু যাউছি পেরা—টিকে সবুর করি পার নাঁহি!" বলিয়া তাঁহার মুহরীকে ধমক দিলেন। আর একজন মোহরের, একটা সমন জারি করিবার জন্য মফঃস্বলে পেয়াদা পাঠাইতে হইবে, কিন্তু তাহাকে কিঞ্চিৎ দক্ষিণা না দিলে সে সমন গরজারি দিবে, উকীলবাবুকে একথা জানাইয়া তাঁহার নিকট হইতে একটী টাকা লইয়া গেলেন। একজন উকীল সবেমাত্র কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, অনেক দিন পরে মফঃস্বলের একজন তদ্বির-কারক (tout) অর্দ্ধা-অর্দ্ধি বন্দোবস্তে তাঁহার জন্য একটা মোকদ্দমা জুটাইয়া আনিয়াছিল। এখন সে মোকদ্দমা ডিস্মিস্ হইয়া গেল; সেই তদ্বিরকারক মুয়ক্কেলের নিকট হইতে যে ২৲ টাকা আদায় করিয়াছিল, তাহার ১৷৷০ টাকা স্বয়ং আত্মসাৎ করিয়া বাকী ৷৷০ আনা উকীল বাবুকে দিতে গেল। তিনি ক্রোধভরে বাহিরে উঠিয়া গিয়া তাহা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন; কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে, রাগ করিলে কোন ফল নাই দেখিয়া আবার তাহা বুদ্ধিমানের ন্যায় কুড়াইয়া লইলেন ও সেই তদ্বিরকারককে আবার আর একটী মোকদ্দমা জুটাইয়া আনিতে অনুরোধ করিলেন।

এইরূপে কাছারির কার্য্য পুরাদমে চলিতেছে। এখন একটী

দোতরফা মোকদ্দমার বিচার আরম্ভ হইল। আদালতের পেয়াদা "হাজির হ্যায়—হাজির হ্যায়" বলিয়া চীৎকার করিলে বাদী পঙ্কজ সাহু ও প্রতিবাদী চিন্তামণি নায়ক হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। মাতৃ-অঞ্চল-ধারী শিশুর ন্যায় পঙ্কজ সাহু তাহার উকীল লম্বোদর বাবুর সঙ্গে আসিল।

উকীলবাবুর নামটী লম্বোদর বটে, কিন্তু বস্তুতঃ তিনি ভয়ানক কৃশোদর—চেহারা খুব লম্বা, কৃষ্ণবর্ণ, দাড়ী গোঁফ কামান, মস্তকের চুল ছোট করিয়া ছাঁটা, কিন্তু একটা বড় লম্বা টিকি বানরের লেজের মত ঝুলিতেছে; গলার ও মুখের চোয়ালের হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার পরিধানে কাল আলপাকার চাপকান, তাহার উপরে চাদর। উকীলবাবু খুব ব্যস্ততার সহিত ঘরে ঢুকিয়া বিচারপতিকে দণ্ডবৎ করিয়া দাঁড়াইলেন। পঙ্কজ সাহু তাঁহার পশ্চাৎ কতকগুলি তালপত্রের দলিল ও কাগজ বগলে করিয়া দাঁড়াইল। মণিনায়কও সেই এজলাসের সম্মুখে গলার উপরে একখানা ময়লা গামছা রাখিয়া যোড়হস্তে দাঁড়াইল। তাহার শরীর মলিন, কৃশ; মুখে উদ্বেগ ও হতাশের চিহ্ন।

উকীলবাবু এইরূপে মোকর্দ্দমা আরম্ভ করিলেন—

"হুজুর! এ একটী বন্ধকী তমঃস্নুকের মোকদ্দমা। আমার মুয়ক্কেল পঙ্কজ সাহু নীলকণ্ঠপুরের একজন বড় মহাজন। ইনি একজন ধর্ম্মপরায়ণ সাধু ব্যক্তি"—

হাকিম পঙ্কজ সাহুর দিকে তাকাইলেন। বৃদ্ধ মহাজন অমনি পশ্চাৎ হইতে তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিয়া, একটু বড় গলায় "কৃষ্ণ—কৃষ্ণ" বলিয়া উঠিল।

উকীলবাবু বলিলেন—"কদাচ ইনি মিথ্যা মোকদ্দমা করেন না। ইনি সে দেশে আছেন বলিয়া, সেখানকার গরিব দুঃখী লোক এ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া আছে। কিন্তু লোকগুলা নিতান্ত "দুষ্ট," তাহারা "টঙ্কা" কর্জ্জ করিয়া তাহা আর শুধিতে জানে না, জমি বন্ধক রাখিয়া পরে তাহা একে-

বারে অস্বীকার করিয়া বসে, এমন কি "টঙ্কা" নেওয়ার কথাও অস্বীকার করে। হুজুরের ধর্ম্মবিচার আছে বলিয়াই এ সকল নিরীহ মহাজন টঙ্কা কর্জ্জ দিতে সাহস করেন। এই ব্যক্তি মণিনায়ক আজ তিন বৎসর হইল আমার মুয়ক্কেলের নিকট হইতে তমঃসুক দিয়া ৫০৲ টঙ্কা কর্জ্জ করিয়াছিল, আর তাঁহাকে দুই মান জমি "দখল বন্ধক" দিয়াছিল। কিন্তু এখন সে টঙ্কাও দেয় না, আর জমিও জোর দখল করিতে চাহে।"

মণিনায়ক কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"হুজুর ধর্ম্মাবতার! ধর্ম্মবিচার হউক! আমি নিতান্ত "রঙ্ক"—এই উকীল যাহা বলিলেন তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। পঙ্কজ সাহু এক জন "কৌড়ীবন্ত" মহাজন, "দুই ক্রোশ পৃথ্বী"র জমিদার। তিনি মিছা কথা কহিবার জন্য অনেক উকীল দিতে পারেন! কিন্তু আমি নিতান্ত গরিব, আমার উকীল হুজুর।"

এ কথা শুনিয়া উকীল বাবু চটিয়া উঠিলেন, তিনি সবেগে মাথা নাড়িয়া ভ্রূভঙ্গী করিয়া মণিনায়ককে বলিলেন—

"কি বলিলি! আমি মিথ্যা কথা বলিতেছি? তুই সাবধান হইয়া কথা বলিস্! হুজুর, আমার প্রমাণ গ্রহণ করুন।"

উকীল বাবুর মাথা নাড়ার চোটে তাঁহার মাথার সুদীর্ঘ চুটকী ঘুরিতে ঘুরিতে একবার তাঁহার বামকর্ণ আবার তাঁহার দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিল। তাঁহার গলার শিরা স্ফীত হইয়া উঠিল ও মুখের হাড় বেশী রকম জাগিয়া উঠিল। এই সকল গোলযোগে তাঁহার চাপকানের গলার বোতাম ছিঁড়িয়া যাওয়াতে, তাহার কতক অংশ ডানদিকে বুকের উপর ঝুলিয়া পড়িল। হাকিম একটু মুচকি হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা আপনার সাক্ষী ডাকান।"

প্রথম সাক্ষী বিচিত্রানন্দ মাহান্তি পঙ্কজ সাহুর গোমস্তা। ইনি যথারীতি হলপ পড়িয়া তমঃসুক প্রমাণ করিলেন ও মণিনায়ককে তিনি স্বহস্তে ৫০৲ টাকা গণিয়া দিয়াছেন বলিলেন।

তখন হাকিম মণিনায়ককে বলিলেন "তুমি এই সাক্ষীকে জেরা কর।"

মণি। (যোড়হস্তে) হুজুর আমি গরীব মানুষ, আমি কি "জরা" করিব?

হাকিম। তুমি এই সাক্ষীকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবে?

মণি। সে মিছা কথা বলিল আমি আর তাহাকে কি জিজ্ঞাসা করিব? (একটু ভাবিয়া) আচ্ছা "ছাম করণে"!(১) তুমি সত্য কহিলা?

সাক্ষী। তবে কি অমি মিথ্যা কহিলাম?

মণি। তুমি তোমার পোর মুণ্ডে হাত দিয়া একথা বলিতে পার?

সাক্ষী। (হাকিমের প্রতি এক চক্ষু স্থাপন করিয়া) আমি তাহা কেন করিতে যাব?

মণি। হুজুর এ ব্যক্তি মহাজনের "কার্যী" (২) ইহার কথা বিশ্বাস করিবেন না।

তখন এ সাক্ষী বিদায় হইল, অন্য সাক্ষী আসিল। ইনি বামদেব মহান্তি—সেই পাঠশালের গুরুমহাশয়। বামদেব সাক্ষীর কাঠরার মধ্যে ঢুকিবার সময় "থু থু" করিয়া মুখের মধ্য হইতে কতকগুলি অর্দ্ধচর্ব্বিত তাম্বূল বাহিরে ফেলিয়া দিলেন এবং গলায় ঝুলান চাদরটার ভাঁজ খুলিয়া গা ঢাকিয়া সভ্য হইয়া যোড়হস্তে দাঁড়াইলেন। অর্দ্দালী হলপ পড়াইল, কিন্তু হলপ পড়িবার সময় তাঁহার মুখের চেহারাটা কুইনাইন-খাওয়া-মুখের মত যেন কেমন একটু বিকৃত ভাব ধারণ করিল।

তিনি উকীলের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, তিনিই তমঃসুক লিখিয়াছিলেন। মণিনায়ক কলম ছুঁইয়া দিয়াছিল, তিনি তাহার নামের "সস্তক" (৩) কাটিয়া তাহার নাম দস্তখত করিয়াছিলেন। গোমস্তা টাকা গণিয়া দিল, মণিনায়ক তাহা হাত পাতিয়া গ্রহণ করিল।

(১), (২)—গোমস্তা, কার্য্যকারক। (৩) জাতিবাচক চিহ্ন।

হাকিম জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ টাকা দেওয়া নেওয়া কোথায় হইয়াছিল ?"

সাক্ষী একটু ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া উকীল বাবু ভীত হইলেন। মণিনায়ক উকীল দিতে পারিবে না, সুতরাং সাক্ষীর জেরা মাত্রেই হইবে না, এই আশ্বাসে তিনি এ সকল বিষয়ে কোন "উপদেশ গ্রহণ" করেন নাই। তখন প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখাইয়া তিনি বলিলেন,—

"হুজুর আজ তিন বৎসরের কথা, ইহা কি কখন মনে থাকে ?"

সেয়ানা সাক্ষী অমনি ইঙ্গিত পাইয়া বলিল—"হুজুর! আমার তাহা "স্মরণ" নাই।

বাস্তবিক এইরূপ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব না থাকিলে উকীল হওয়া বৃথা।

তখন হাকিম মণিনায়ককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ইহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবে ?"

মণি। অবধানী! আমি তোমার কি অনিষ্ট করিয়াছি যে তুমি আমার নামে এই মিথ্যা কথাগুলা কহিলে ? হউক, ধর্ম্ম আছেন! জগন্নাথ মহাপ্রভু আছেন! আমি ত আমার "পেলা" (১) কে তোমার "চাট্শালিতে" (২) পাঠাইব স্বীকার করিয়াছিলাম তবে তুমি কেন আমার প্রতি এরূপ "অনুরাগ" করিতেছ ?

সাক্ষী। সে কি কথা ? আমি কি মিথ্যা কহিলাম ?

মণি। "কঞ্চা মিচ্ছ গুড়া" (৩) কহিলে।

তখন হাকিম এই সাক্ষীকে বিদায় দিয়া অন্য সাক্ষীকে ডাকিলেন। এবার আসিলেন মার্কণ্ডপধান। তিনি হলপ পড়িবার সময় কেমন থতমত খাইলেন। পরে উকীলের সওয়ালে বলিলেন তিনি স্বচক্ষে মণিনায়ককে এই তমঃসুক দিয়া ৫০৲ টাকা কর্জ্জ নিতে দেখিয়াছেন, তিনি তমঃসুকের একজন সাক্ষী।

---

(১) ছেলে। (২) পাঠশালা। (৩) কাঁচা মিছা গুলি।

মণিনায়ক বলিল, "হুজুর! ইনি আদৌতি করিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে-ছেন। দোহাই ধর্ম্মাবতার!"

হাকিম বলিলেন—"তোমার সঙ্গে ইহার কি আদৌতি? তুমি জেরা কর।"

মণি। হুজুর! আমার ঝিয়ের নামে এক মিথ্যা অপবাদ রটনা করিয়া এই ব্যক্তি ও গ্রামের অন্যান্য লোক একটা "মেলি" হইয়া আমার জাতি-নাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, আমি বীরভদ্রমর্দ্দরাজ সাস্তের নিকট ইহাদের নামে নালিস করিয়াছিলাম।

হাকিম। আচ্ছা তুমি সেইসব কথা ইহাকে জিজ্ঞাসা কর।

মণি। (সাক্ষীর প্রতি) মার্কণ্ডপধানে! তুমি "ক্রুদ্ধ" হইয়াছ, তোমার পাঁচটী পো, তেরটী নাতি—তুমি সত্য করিয়া বল আমার সঙ্গে তোমার আদৌতি আছে কি না?

সাক্ষী। তুমি আমার স্বজাতি—তোমার সঙ্গে আমার শত্রুতা কিসের?

মণিনায়ক আর কিছু বলিল না। হাকিম তখন সাক্ষীকে বিদায় দিলেন। আরও দুইজন সাক্ষীর জবানবন্দী হইল। তাহারাও বাদীর দাবী সপ্রমাণ করিল। তখন হাকিম মণিনায়ককে তাহার সাক্ষী ডাকিতে বলিলেন। মণিনায়ক যোড়-হস্তে গলায় গামছা রাখিয়া কাতর-স্বরে বলিল—হুজুর! আমি নিতান্ত গরীব, "অক্ষিত"; আমি সাক্ষী কোথায় পাব? হুজুর আমার সাক্ষী।

হাকিম। তবে তুমি কিছু বলিতে চাও?

মণি। হুজুর! আমার দুঃখ শুনিবা হন্তু। মহাজনের এই নালিশ সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি কখনও তাহার নিকট হইতে এই তমঃসুক দিয়া ও জমিবন্ধক রাখিয়া ৫০৲ টাকা কর্জ্জ করি নাই। প্রায় দুই বৎসর হইল আমার মায়ের শ্রাদ্ধের সময় ১৫৲ টাকা কর্জ্জ করিয়াছিলাম, কিন্তু কোন

জমি বন্ধক রাখি নাই; মহাজন শত্রুতা করিয়া এই "কৃত্রিম" নালিশ করিয়াছে। ঐ তমঃসুক জাল।

হাকিম। কেন, বাদীর সঙ্গে তোমার কি শত্রুতা?

মণি! হুজুর! সে অনেক কথা। গত বছর বৈশাখ মাসে আমার মেয়ের বিবাহ দেওয়ার জন্য আমি তাঁহার নিকট আর ২০৲ টাকা কর্জ্জ করিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু মহাজন আমাকে টাকা কর্জ্জ দিলেন না। সে দিন রাত্রে মহাজনের পো বিম্বাধরসাহু কুমতলবে আমার খঞ্জার ভিতরে পশিয়াছিল। আমি তাহাকে ধরিয়া লোকজন ডাকিলাম। তখন মার্কণ্ডপধান প্রভৃতি অনেক লোক আসিল। তাহারা মিছামিছি আমার ঝিয়ের নামে একটা অপবাদ রটনা করিল ও পরদিন একটা বৈঠক করিয়া আমার কাছে "ক্ষীরিপিঠা" চাহিল। আমি গরিব মানুষ টাকা কোথায় পাব? আমি নিরুপায় হইয়া আমার "ভার্য্যাকে" সঙ্গে লইয়া মর্দ্দরাজসান্তের নিকট গিয়া নালিশ করিলাম। তিনি ধর্ম্মবিচার করিয়া, পঙ্কজসাহু মহাজনের একশ টাকা জরিমানা করিলেন, আর মার্কণ্ডপধানদিগকে শাসন করিয়া দিলেন যে আমার উপর কোন অত্যাচার না করে। কিন্তু আমার কপাল মন্দ! তাহার ৪।৫ দিন পরেই মর্দ্দরাজসান্তের "সময়" হইল। তখন মহাজন, মার্কণ্ডপধান ও গ্রাম-বাসী সমস্ত লোক সুযোগ পাইয়া আমার উপর নানাপ্রকার অত্যাচার আরম্ভ করিল। আমার সেই ঝিয়ের "বাহা" এ পর্য্যন্ত দিতে পারি নাই। অবশেষে মহাজন আমাকে বলিল—"আমার যে একশ টাকা জরিমানা হইয়াছে, তুই সে টাকা দে, নচেৎ তোর "সত্ত্বনাশ" করিব।" হুজুর, আমি এত টাকা কোথায় পাব? মর্দ্দরাজসান্ত আমাকে যে ১৫৲ টাকা দিয়াছিলেন, তাহা খরচ হইয়া গিয়াছে। এ সন "বিয়ালী" ধান ফলিল না, বর্ষাকালে কিনিয়া খাইতে হইয়াছে। "দুর্ব্বল" (১) "নই-বঢ়ীতে" (২)

(১) প্রবল। (২) নদীর জল বৃদ্ধি।

ঘরদুয়ার সব ভাসিয়া গেল। পরে আমি সেই ১০০৲ টাকা না দেওয়াতেই, এই "কৃত্রিম" তমঃস্থক প্রস্তুত করিয়া আমার নামে এই মিথ্যা নালিশ করিয়াছে। গ্রামের সব লোক এক জোট। পঙ্কজসাহু দুই লক্ষ টাকার মহাজন, দুই ক্রোশ পৃথ্বীর জমিদার—আমি এক জন ক্ষুদ্র "তসা"—(১) সে কোথায়, আর আমি কোথায়? হুজুর মা বাপ—ধর্ম্মযুধিষ্ঠির! আমি গরু চরাই, হুজুর মানুষ চরাইতেছেন। হুজুর রাখিলে রাখিবেন, মারিলে মারিবেন। আমার "পাঁচ প্রাণীকুটুম্ব", আপনার চরণ ভরসা।

ইহা বলিয়া মণিনায়ক তাহার গলার গামছা দিয়া চক্ষু মুছিল। হাকিম বলিলেন, "তুমি যে সকল কথা বলিলে, তাহার প্রমাণ দাও—প্রমাণ না দিলে চলিবে কেন?"

মণি। হুজুর! গ্রামের সব লোক এক জোট, আমি সাক্ষী প্রমাণ কোথায় পাব? আচ্ছা, মহাজন এখানে আছেন আমি তাঁহাকে নির্ভর মানিতেছি। তিনি এই জগন্নাথ মহাপ্রভুর মহাপ্রসাদ ও লোকনাথ মহাপ্রভুর "ধণ্ডা" (২) হাতে করিয়া বলুন যে আমি তাঁহার নিকট হইতে এই তমঃস্থক দিয়া ৫০৲ টাকা কর্জ্জ করিয়াছি। আমার তাহাই মঞ্জুর—আমি ঘরে চলিয়া যাইব।

ইহা বলিয়া মণিনায়ক সতেজে একটা হাঁড়িতে করিয়া কিছু অন্নপ্রসাদ ও কতকগুলি শুষ্ক ফুল লইয়া গিয়া পঙ্কজসাহুর সম্মুখে ধরিল।

তখন হাকিম পঙ্কজসাহুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। কাছারির সমস্ত লোকের দৃষ্টি তাহার উপর পড়িল। সেই উকীলবাবুও নিতান্ত দীনদৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইলেন। তাঁহার মনে ভয় হইল, পাছে বুড়া মহাজন তাঁহার পাকা গুটী কাঁচা করিয়া ফেলে।

বৃদ্ধ পঙ্কজসাহু করেন কি—অগত্যা সেই মহাপ্রসাদের হাঁড়ি দুই হাতে

---

(১) তসা=চাষা। (২) ধণ্ডা=নির্ম্মাল্য।

তুলিয়া লইলেন, কিন্তু তাঁহার হাত কাঁপিতে লাগিল, গায়ে ঘাম ছুটিল, মুখ বিবর্ণ হইল। তিনি অনেক কষ্টে বলিলেন, "হাঁ, মণিনায়ক যথার্থই এই তমঃস্মুক দিয়া আমার নিকট হইতে ৫০৲ টাকা কর্জ্জ নিয়াছে।"

"ওহো!—ধর্ম্মবুড়িগলা!—ধর্ম্মবুড়িগলা!" (১)

মণিনায়ক ইহা বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। হাকিম তৎক্ষণাৎ রায় লিখিয়া মোকর্দ্দমা ডিক্রি দিলেন। উকীলবাবুর জয় হইল। তিনি হাকিমকে সেলাম করিয়া সগর্ব্বে বুক টান করিয়া বাহিরে আসিলেন ও পঙ্কজসাহুর নিকট হাত পাতিলেন— "কই, আমার বাকী টাকা? তোমার মোকর্দ্দমা ত আমিই জিতিয়া দিলাম, তাহার পুরস্কারও চাই।"

পঙ্কজসাহু গলায় কাপড় দিয়া যোড় হাতে বলিল—"হুজুর আমি নিতান্ত গরিব—আমি ৫৲ টাকা দিয়াছি। আর ৫৲ টাকা মাপ দিন। আমার কাছে এক পয়সাও নাই। আর আপনি একবার বিচার করিয়া দেখুন, মোকর্দ্দমা ত আমি মহাপ্রসাদ ছুঁইয়া হলপ করাতেই ডিক্রি হইয়াছে, আপনার বেশী কিছু করিতে হয় নাই।"

উকীলবাবু তখন গরম হইয়া বলিলেন "কি? আমি কিছুই করি নাই? এতগুলি সাক্ষীর জবানবন্দী কে করাইল? তুই বেটা নিতান্ত তেলী—ফেল্ আমার টাকা! রেখেদে তোর কৃষ্ণ—কৃষ্ণ—বেটা ভণ্ড, জুয়াচোর!"

এইরূপে উভয়ের মধ্যে অনেকক্ষণ বাগ্‌বিতণ্ডা হইল। পরিশেষে মহাজন তাঁহার কোঁচার খোঁট হইতে আর একটী টাকা বাহির করিয়া নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত উকীলবাবুর হাতে দিয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিল, এবং আর চারি টাকা বাড়ী গিয়া পাঠাইয়া দিবে বলিল। কিন্তু উকীলবাবুর আর সে টাকার ভরসা রহিল না।

(১) ধর্ম্ম ডুবিয়া গেল।

এদিকে সন্ধ্যা আসিল। সূর্য্য পশ্চিম গগনে হেলিয়া পড়িয়া একটী সুবর্ণ কলসের ন্যায় নীল সাগরবক্ষে ভাসিতে ভাসিতে একটু একটু করিয়া ডুবিয়া গেল। কাছারির সমস্ত লোক চলিয়া গেল। তখন মণি-নায়কও আস্তে আস্তে উঠিয়া চলিল। কিন্তু তাহার বাড়ী যাওয়ার আর প্রবৃত্তি হইল না। সে আর কোন্ মুখে গ্রামে ফিরিবে? সে মনের দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া হত্যা দিয়া পড়িয়া রহিল। জগন্নাথ মহাপ্রভু তাহাকে কূল না দিলে সে আর বাড়ী যাইবে না। এইরূপে তিন দিন সে মন্দিরে পড়িয়া রহিল। এই অবস্থায় নরোত্তম দাস বাবাজী ও নবঘনর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল।

বাবাজী তাহার দুঃখকাহিনী শুনিলেন, নবঘনও শুনিলেন। বাবাজী তাহাকে কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য করিলেন আর তাহাকে কিছু জমি দেওয়ার জন্য নবঘনকে অনুরোধ করিলেন। তাঁহাদের উভয়ের দয়াতে মণি-নায়কের হৃদয় গলিয়া গেল। তাঁহাদের অনুরোধে সে নীলকণ্ঠপুর ত্যাগ করিয়া নবঘনর এলাকায় বাড়ী ঘর তুলিয়া লইতে স্বীকৃত হইল। বাবাজী নবঘনকে বলিলেন—"বাবা! কেবল এই একব্যক্তি নহে—এই রকম কত শত মণিনায়ক মহাজনের উৎপীড়নে সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে। আমার একান্ত অনুরোধ তোমার হাতে কিছু টাকা সঞ্চিত হইলে তুমি ইহাদের উদ্ধারের কোন একটা উপায় করিবে। আমার গোপালের ভাণ্ডার অতিক্ষুদ্র, তাহা দ্বারা আর কয়জন লোকের উপকার হইতে পারে?"

নবঘন বলিলেন—"আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য। আপনি আজ আমাকে যে বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন, তাহার প্রতিদান স্বরূপ আপনার এই অনুরোধ আমি অবশ্যই পালন করিব।"

এই ঘটনার সাত দিন পরে বাবাজী গড়কোদণ্ডপুরে গিয়া বাসুদেব মান্ধাতার সঙ্গে পরামর্শ স্থির করিয়া আসিয়া নবঘনর মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাণী বিবাহে মত দিলেন। বিবাহের দিন স্থির হইল।

অষ্টম অধ্যায়।

শোভাবতীর বিবাহ।

কুচক্রী চক্রধর পট্টনায়ক তাঁহার পালকপুত্র উদয়নাথের সঙ্গে শোভাবতীর বিবাহ দিবেন মনস্থ করিয়া বিবাহের দিন ঠিক করিয়াছেন। ২৭শে বৈশাখ দিন ঠিক হইয়াছে। এই দিন ভিন্ন শীঘ্র আর ভাল দিন নাই।

আজ বিবাহের পূর্ব্ব দিন। আজ বর-কন্যার গায়ে হলুদ দিতে হয়। সূর্য্যমণি তাঁহার দাসীদিগকে সঙ্গে করিয়া শোভাবতীর গায়ে হলুদ দিতে চলিলেন। বেলা তখন এক প্রহর। শোভাবতী তাহার নিজের ঘরে বসিয়া স্নানের জন্য তেল মাখিতেছিল। সূর্য্যমণি আজ হাসিভরা মুখে শোভাবতীর কাছে গিয়া বসিলেন ও নিজহস্তে একটু হলুদ লইয়া তাহার গায়ে মাখাইয়া দিলেন। দাসীদিগকে উলু দিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তাই কেহ উলু দিল না। শোভাবতী ভীত ও চকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ও বলিল—

"ও কি মা! আমার গায়ে এখন হলুদ দিচ্চ কেন?"

সূর্য্যমণি হাসিয়া বলিলেন—

"মা শোভা! কা'ল যে তোমার বাহা!"

"বাহা? কার? আমার?"

"তবে কার? মা, দেখ তোমার বিবাহের বয়স হইয়াছে। মর্দ্দরাজ সান্ত বাঁচিয়া থাকিলে, এতদিন তোমার বিবাহ দিয়া ফেলিতেন। এই

এক বৎসর অকাল ও কালাশৌচ ছিল, তাই এতদিন আমি চুপ করিয়াছিলাম। সে জন্য আমি যে কি মনঃকষ্টে ছিলাম, তাহা বলিতে পারি না। এখন কালাশৌচ অতীত হইয়াছে, তাই যত শীঘ্র পারিয়াছি তোমার বিবাহের দিন ঠিক করিয়াছি।”

বিবাহের কথা শুনিয়া শোভাবতীর মুখ লজ্জায় আরক্তিম হইল। সে মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলিতে পারিল না। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে উদয়নাথের সম্বন্ধে উজ্জ্বলাদাসী তাহাকে যাহা বলিয়াছিল তাহা স্মরণ করিল। তাহার মুখ ম্লান হইল ও চক্ষু ছল্‌ছল্‌ করিতে লাগিল। সে আঁচল দিয়া চক্ষু মুছিয়া অনেক কষ্টে বলিল—

“মা! আমার “বাহার” জন্য এত তাড়াতাড়ি কেন? এই সেদিন বাবা মরিয়াছেন, আমি এখন পর্য্যন্ত তাঁহার শোক ভুলিতে পারি নাই। আমার এখন বিবাহের ইচ্ছা নাই।”

ইহা বলিয়া সে ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। সেই ক্রন্দন শুনিয়া উজ্জ্বলা দাসী সেখানে আসিল। সে আসিয়াই ব্যাপার কি বুঝিতে পারিল। সে সূর্য্যমণিকে বলিল—

“একি সান্তানী! উহাকে তোমরা কাঁদাইতেছ কেন?”

সূর্য্যমণি ক্রোধে মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন “তা’তে তোর কি লো?”

“কি, আমার কিছু না? আমি জানিতে চাই কার “বাহা,” কে দেয়? তুমি শোভার “বাহা” দিবার কে?”

“কি বল্‌লি, বাঁদী হারামজাদি? আমি তার ‘বাহা’ দিব না ত দেবে কে? তুই পারিস্ যদি তবে ঠেকা।” এইরূপ চীৎকারে সূর্য্যমণি শরীরের গুরুভারে শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার পানের পিপাসায় গলা শুকাইয়া গেল। একজন দাসী পানের বাটা হইতে একটী পান তাঁহার হাতে দিল। তিনি তাহা মুখে ফেলিয়া দিলেন। তারপর তিনি শোভাবতীকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন—

"মা! আমি তোমার ভালর জন্যই এই বিবাহ ঠিক করিয়াছি। মৰ্দ্দরাজসান্ত বাঁচিয়া থাকিতে তোমার মামা এই বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহারও মত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে হঠাৎ তাঁহার "সময়" হইল। তিনি বাঁচিয়া থাকিলে এই বিবাহই দিতেন। উদয়নাথ ত মন্দ ছেলে নয়?—"

উজ্জ্বলা আর সহ্য করিতে পারিল না। সে সূর্য্যমণির কথায় বাধা দিয়া বলিল—

"মিথ্যা কথা! মৰ্দ্দরাজসান্ত এ বিবাহে কখনও মত দেন নাই। তাঁহার নিকট কখনও এ বিবাহের প্রস্তাব করা হয় নাই। প্রস্তাব করিলেও, কখনও তিনি এ বর পছন্দ করিতেন না। তোমার উদয়নাথের যে কত গুণ!"

"কি বল্‌লি বাঁদী। তোর ছোট মুখে বড় কথা? তোকে ঝাঁটা পেটা করিব, জানিস্? তুই কি রকমে জান্‌লি যে মৰ্দ্দরাজসান্ত মত দেন নাই?"

"কি! আমাকে ঝাঁটা পেটা করিবে? তুমি? এস দেখি ঝাঁটা নিয়ে! আমার আর এ অপমান সহ্য হয় না!"

ইহা বলিয়া উজ্জ্বলা চক্ষু মুছিতে মুছিতে কাঁদিতে লাগিল। পরে বলিল—"মৰ্দ্দরাজসান্ত যে, মত দেন নাই, তাহা বুঝি আমি জানি না? যদি উদয়নাথের সহিত বিবাহে সম্মতি দেওয়াই তাঁহার মত হইবে, তবে তিনি মৃত্যুকালে বাবাজী ও মান্ধাতাসান্তকে একটী ভাল বরের সহিত শোভাবতীর বিবাহ দিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া গেলেন কেন? আমি বুঝি কিছু জানি না? শোভাবতীকে একটা "হুণ্ডার" সহিত বিবাহ দিয়া জলে ডুবাইয়া দিতে তোমার কিছুমাত্র অধিকার নাই। তাঁহারাই তাহার বিবাহ দিবার প্রকৃত মালিক!"

"আমি তাহা মানি না। আমি সে উইলও মানি না। আমি

কালই উদয়নাথের সহিত শোভাবতীর বিবাহ দিব। দেখিস্ আমি পারি কি না!"

ইহা বলিয়া রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে স্বর্য্যমণি সদলবলে প্রস্থান করিলেন।

স্বর্য্যমণি চলিয়া গেলে উজ্জ্বলা শোভাবতীর চুল লইয়া বসিল। সেই সুচিক্কণ কেশরাশিতে অযত্নে জটা ধরিয়া গিয়াছে। এই এক বৎসর শোভাবতী ভাল করিয়া কেশবিন্যাস করিতে দেয় নাই। মাথায় তেলও মাখে নাই। তাহার সেই তপ্তকাঞ্চন গৌরকান্তি মলিন হইয়া গিয়াছে। সে উজ্জ্বলার গলা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। উজ্জ্বলাও কাঁদিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে উজ্জ্বলা বলিল—

"এখন এই বিপদ হইতে উদ্ধারের উপায় কি? এখন বাবাজীকেই বা কি করিয়া সংবাদ দিই? মান্ধাতাসান্তই বা কোথায়? আমি কোনক্রমে পলাইয়া মান্ধাতাসান্তের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করিয়া আসি! তুমি ভাবিও না।"

উজ্জ্বলা গোপনে মান্ধাতার বাড়ীতে গেল। কিন্তু সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া শোভাবতীকে কোন আশাপ্রদ সংবাদ দিতে পারিল না।

আমাদের বঙ্গদেশে দিবাবিবাহ নিষেধ। কিন্তু উড়িষ্যায় সাধারণতঃ বিবাহ দিবাভাগেই হইয়া থাকে। অথচ কন্যা পুত্রবর্জ্জিতা হয় না, এবং স্বামীকেও হত্যা করে না। বিবাহের যে লগ্ন ঠিক হয়, সে সময়ে বর নিজের বাড়ী হইতে কন্যার বাড়ীতে যাইবার জন্য যাত্রা করেন। পরে বিবাহ সুবিধামত অন্য সময়ে হয়।

উদয়নাথ ২৭শে বৈশাখ সন্ধ্যাকালে গোধূলি লগ্নে যাত্রা করিয়া চক্রধর পট্টনায়কের সহিত কোদণ্ডপুর অভিমুখে রওনা হইল। উড়িষ্যার করণজাতির বিবাহে বরপক্ষ সাধারণতঃ পাল্কীতে চড়িয়া কন্যার বাড়ীতে

আগমন করেন। বর তান্‌জানে (খোলা পাল্কী) কিম্বা দোলায় চড়িয়া আসেন। যিনি যত অধিক পাল্কী আনিতে পারেন, তাঁহার তত সুখ্যাতি হয়। সেই উপলক্ষে যে সকল লোক কখনও পাল্কীতে চড়ে নাই, তাহারাও এক একবার পরের খরচে অন্য লোকের স্কন্ধে আরোহণ করিবার সুখ উপভোগ করে।

এ দিকে সূর্য্যমণি বিবাহের আয়োজন করিয়া বসিয়া আছেন। এই বর আসে বর আসে করিয়া একবার ঘরের বাহিরে যাইতেছেন, একবার ভিতরে আসিতেছেন। খঞ্জার ভিতরে বিস্তৃত উঠানে বিবাহের আয়োজন হইয়াছে; প্রাঙ্গণের পশ্চিম ভাগে বিবাহের বেদি বাঁধা হইয়াছে, তাহার উপরে বর ও কন্যা পূর্ব্বাস্য হইয়া বসিবেন। পুরোহিত ঠাকুর পূজার উপকরণাদি লইয়া সেই বেদির পার্শ্বে কুশাসনে বসিয়া আছেন; আর থাকিয়া থাকিয়া মশার কামড়ে অস্থির হইয়া মশা তাড়াইতেছেন এবং হাঁই তুলিতেছেন ও হাতে তুড়ি দিতেছেন। এই বিবাহ-বাড়ীতে একটুও বাদ্যধ্বনি শুনা যাইতেছে না। কয়েকজন বাদ্যকর আনিয়া বাহিরের ঘরে লুকাইয়া রাখা হইয়াছে, বিবাহ হইয়া গেলে তাহারা বাজাইবে। শোভাবতী তাহার ঘরে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কাঁদিয়া কাঁদিয়া এখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। উজ্জ্বলার চক্ষে ঘুম নাই, সে পার্শ্বে শুইয়া আছে।

এই সময়ে হঠাৎ দূরে বাদ্যধ্বনি শুনা গেল। ক্রমে ক্রমে তাহা নিকটে আসিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে বোমের গুড়ূম্ গুড়ূম্ নিনাদ ও হাউইবাজির হুস্ হুস্ শব্দও শুনা গেল। মধ্যে মধ্যে দুই একটী বন্দুকের আওয়াজও হইতে লাগিল। পরে অনেকগুলি পাল্কীবাহকের "হাইরে-ভাইরে" শব্দ ও লোকের কোলাহল শুনা গেল। এই সকল শুনিয়া সূর্য্যমণি "হায়! হায়!" করিতে লাগিলেন ও তাঁহার ভ্রাতা এত ধুমধাম করিয়া আসাতে বিবাহের বিঘ্ন ঘটিতে পারে, ইহা ভাবিয়া চক্রধরকে গালি দিতে লাগিলেন।

উজ্জ্বলা এই গোলমাল শুনিয়া শোভাবতীকে জাগাইল ও নিজে উঠিয়া বাহিরে আসিল।

সেই গভীর রজনীর নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া যখন সেই বরযাত্রিদল কোদণ্ডপুর গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা শয্যাত্যাগ করিয়া দৌড়িয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহারা যাহা দেখিল, তাহাতে তাহাদের চক্ষুস্থির হইল। এরূপ জাঁকজমক তাহারা কখনও চক্ষে দেখে নাই! সেই বরপক্ষীয় লোকের অগ্রভাগে মশাল হাতে করিয়া এক জন লোক চলিয়াছে। তাহাদের পশ্চাতে একটা ঘোড়া, একটা বাঘ, একটা ষাঁড়, দুইটা দৈত্য এবং দুইটা নর্ত্তকীর প্রকাণ্ড মুখসপরা, কয়েকজন লোক তালে তালে নাচিতে নাচিতে চলিয়াছে। সেই বিবিধবর্ণে চিত্রিত ভীষণ মূর্ত্তি সকল ও তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখিয়া মাতৃক্রোড়ে শিশুগণ কাঁদিয়া উঠিল, বালকগণ ভয়ে চক্ষু মুদিল, অন্য সকলে হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল। ইহাদের পশ্চাতে দুইটা বড় বড় হাতী বিচিত্র ঝালরে ও রজত আভরণে ভূষিত হইয়া মন্থর-গতিতে চলিয়াছে। তাহাদের পশ্চাতে চারিটী প্রকাণ্ড ঘোড়া লালবর্ণের গদি ও ঝালরে সজ্জিত হইয়া তালে তালে পা ফেলিয়া চলিয়াছে। পরে একখানা রৌপ্যমণ্ডিত চতুর্দ্দোলে বহুমূল্য বেশভূষা ও স্বর্ণাভরণে সজ্জিত বর বসিয়া আছেন। আটজন সুসজ্জিত বাহক সেই চতুর্দ্দোল বহন করিয়া চলিয়াছে। তাহার অগ্রে ও পশ্চাতে দুইজন করিয়া চোপদার রূপার "আসাছোটা" লইয়া চলিয়াছে। তাহার পশ্চাতে ষোলখানা পাল্কী। তাহার পশ্চাতে আর একদল মশালচি। তাহার পশ্চাতে ৫০ জন বাদ্যকর ঢোল, কাড়া, সানাই ইত্যাদি বিবিধ বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে বাজাইতে চলিয়াছে। থাকিয়া থাকিয়া বোম ও হাউই বাজি জ্বালান হইতেছে।

গ্রামের লোকেরা যখন শুনিল, কনকপুরের রাজা বিবাহ করিতে যাইতেছেন, তখন তাহারা হাঁ করিয়া সেই চতুর্দ্দোলারোহী রাজাকে

দেখিতে লাগিল। কিন্তু তিনি কোথায় যাইতেছেন, তাহা বুঝিতে পারিল না। অনেক লোক তামাসা দেখিবার জন্য বরযাত্রিদলের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল। সেই বরযাত্রিদল মর্দ্দরাজসান্তের বাটীর সম্মুখে গিয়া থামিল। তখন বাসুদেব মান্ধাতা যোড়হস্তে সকলকে অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইলেন। তিনি একটী নারিকেল ফল, নববস্ত্র ইত্যাদি লইয়া বরকে বরণ করিলেন। নরোত্তম দাস বাবাজি একখানা পাল্কী হইতে তাড়াতাড়ি নামিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। অভিরামসুন্দররা আর একখানা পাল্কী হইতে নামিয়া বরের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিতে দেখিতে অনেকগুলি লোকজন বাহিরের বৈঠকখানা পরিষ্কার করিয়া সকলের বসিবার জন্য বিছানা পাতিয়া দিল। ভীমজয়সিং তাহার দলবল লইয়া আসিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে সকলকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া বাবাজি সূর্য্যমণির সহিত সাক্ষাৎ করিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

সূর্য্যমণি প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, যে চক্রধর পট্টনায়কই তাঁহার বর লইয়া এইরূপ জাঁকজমক করিয়া আসিতেছেন। পরে তিনি দাণ্ডঘরে গিয়া জানালা দিয়া যখন দেখিলেন যে তাহারা কেহ আসে নাই, তাঁহার অপরিচিত অনেকগুলি লোক বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন তিনি ভয়ে ও বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ইহারা কে, কোথায় যাইতেছে তাহা জানিবার জন্য তিনি একজন দাসীকে বাহিরে পাঠাইলেন। সে আসিয়া কহিল, কোন্ রাজার ছেলে বিবাহ করিতে আসিয়াছেন। সূর্য্যমণি মনে করিলেন, তাহারা বুঝি ভুল করিয়া এখানে আসিয়াছে। কিন্তু যখন বাসুদেব মান্ধাতা ও নরোত্তমদাস বাবাজী তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে দিলেন, তখন সূর্য্যমণির আর প্রকৃত ঘটনা বুঝিতে বাকী রহিল না। তিনি অন্তঃপুরে গিয়া শিরে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

নরোত্তম বাবাজী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দাসী দ্বারা সূর্য্যমণিকে সংবাদ দিলেন এবং নিজে তাঁহার ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সূর্য্যমণি বাহিরে আসিলেন না, কি কোন সংবাদ পাঠাই-লেন না। বাবাজী তখন দরজার নিকটে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "মা! তোমার জামাই আসিয়াছেন, একবার বাহিরে আসিয়া দেখ। মা! আমাদের বড়ই সৌভাগ্য, তাই কনকপুরের রাজাকে জামাতাস্বরূপে পাইয়াছি। রূপে, গুণে, কুলে, শীলে, বিদ্যা, বুদ্ধিতে এরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট জামাতা পাওয়া কঠিন। মা! শোভাবতী আজ রাজরাণী হইতে চলিল, ইহা অপেক্ষা আহ্লাদের বিষয় আর কি হইতে পারে? মা! তুমি এখন উঠিয়া আসিয়া তোমার জামাতাকে বরণ কর।"

বাবাজীর কথা শুনিয়াও সূর্য্যমণি নড়িলেন না। তিনি সংবাদ পাঠাইলেন তাঁহার শরীর অসুস্থ, তিনি উঠিতে পারিবেন না।

তখন বাবাজী নিতান্ত দুঃখিতান্তঃকরণে শোভাবতীর ঘরে চলিলেন। উজ্জ্বলা এতক্ষণ নিকটে দাঁড়াইয়া তাঁহার কথা শুনিতেছিল; সেও তাঁহার সঙ্গে গিয়া শোভাবতীকে ডাকিয়া তুলিল।

শোভাবতী বাবাজীকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল। বাবাজী বলিলেন—

"মা! এতদিনে তোমার সকল দুঃখের অবসান হইল। আশীর্ব্বাদ করি তুমি সাবিত্রীসমা হও—তুমি রাজরাণী হইয়া পরমসুখে থাক।"

শোভাবতী কি স্বপ্ন দেখিতেছে? সে জাগ্রত না নিদ্রিত? প্রথমে তাহার মনে এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইল। পরক্ষণেই প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। যুগপৎ হর্ষবিষাদের উচ্ছ্বাসে তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছে। সেই উচ্ছ্বাসের বেগ ধারণ করিতে সে অসমর্থ। তাহার কথা কহিবার শক্তি নাই। তাই সে কাঁদিতে লাগিল। আজ এক বৎসর শোক, দুঃখ, নির্য্যাতন ভোগ করিতে করিতে

তাহার হৃদয় হতাশার নিম্নতম গহ্বরে নিমগ্ন হইয়াছিল। তাহার নিবিড় অন্ধকারময় জীবনে কখনও ঊষার কনক-কিরণময়ী আশাচ্ছটা ফুটিবে এরূপ স্বপ্নেও ভাবে নাই। কিন্তু আজ অকস্মাৎ কোন স্বর্গের দেবতা আসিয়া তাহার গাঢ়তিমিরময় কক্ষে মধ্যাহ্নের প্রদীপ্ত-সুখোচ্ছ্বাসময় আলোকচ্ছটা বিকীরণ করিলেন, আজ হতাশার গভীরতম গহ্বর হইতে হঠাৎ সে সুখোল্লাসের প্রবাহে ভাসিয়া উঠিল। এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন সে সহ্য করিতে পারিবে কেন? তাই শোভাবতী কাঁদিতে লাগিল। তাহার এই মহাসুখের সময়ে তাহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন, তাহার আজীবন স্নেহমমতার একমাত্র আধার, সেই পিতা কোথায়? তিনি বাঁচিয়া থাকিলে, আজ তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না। সেই স্নেহময় পিতার কথা স্মরণ করিয়া, শোভাবতী কাঁদিতে লাগিল।

বাবাজী তাহার সেই নীহারসিক্ত-ফুল্ল-কমলবৎ অশ্রুসিক্ত মুখখানি ও সরল সকরুণ দৃষ্টি দেখিয়া সহজেই তাহার হৃদয়ের অব্যক্ত ভাবগুলি বুঝিতে পারিলেন। তিনি তাহাকে বস্ত্রাভরণে সজ্জিত করিবার জন্য উজ্জ্বলাকে উপদেশ দিয়া বাহিরে আসিলেন। উজ্জ্বলা তাঁহার পশ্চাতে কিছুদূর আসিয়া চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করিল "এই রাজার আর কয়টী রাণী আছেন?"

বাবাজী তাহার কথায় একটু হাসিয়া বলিলেন "না মা! সেজন্য তোমার কোন ভাবনা নাই। রাজার এই প্রথম বিবাহ হইবে। আমি সে সব না দেখিয়াই কি এ বর ঠিক করিয়াছি?"

বাবাজীর তিরস্কারে উজ্জ্বলা লজ্জিত হইল ও মনে মনে বিশেষ আনন্দিত হইল। এতক্ষণ তাহার মুখটা কিছু ভার ভার ছিল। সে বাক্স খুলিয়া গহনা বাহির করিয়া শোভাবতীকে সাজাইতে লাগিল। বাবাজী একখানা বহুমূল্য পট্টসাটী পাঠাইয়া দিলেন, তাহা তাহাকে পরাইল।

বাবাজী এদিকে "দাণ্ডে" আসিয়া অতিথিগণের অভ্যর্থনা ও বিবাহের

আয়োজনে মন দিলেন। তাঁহার বন্দোবস্ত অনুসারে নিমন্ত্রিত ব্যক্তি-গণের ভোজনের জন্য পুরী হইতে ভারে ভারে মহাপ্রসাদ আসিতে লাগিল। পুরীজেলার ঐ এক সুবিধা। সেখানে ইচ্ছা করিলে বাড়ীতে রন্ধন না করিয়াও জগন্নাথ মহাপ্রভুর মহাপ্রসাদ দ্বারা যত ইচ্ছা তত লোককে ভোজন করান যায়। খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে মৎস্যমাংসের কারবার নাই, কিন্তু ঘৃতান্ন, "কণিকা", খিচড়ী, বিবিধ নিরামিশ ব্যঞ্জন, পিষ্টক পরমান্নাদি নানা প্রকার রসনাতৃপ্তিকর বস্তুর আয়োজন অতি অল্প সময়ের মধ্যে হইতে পারে। আর মহাপ্রসাদ বলিয়া সকলেই তাহা ভক্তির সহিত পরম পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করে, তাহার একটী কণাও নষ্ট হয় না।

বাবাজী এই সকল বন্দোবস্ত করিতেছেন, এমত সময়ে ভীমজয়সিং আসিয়া বলিল "বাবাজী! চক্রধর পট্টনায়ক ও তাহার বরকে আমি আটক করিয়া রাখিয়াছি। তাহাদের প্রতি কি হুকুম হয়?"

বাবাজী বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "কি? তুমি তাহাদিগকে বাঁধিয়া রাখিয়াছ? কি সর্ব্বনাশ! তাহা এতক্ষণ বল নাই কেন? তুমি এখনই তাহাদিগকে খুলিয়া দিয়া এখানে নিয়া এস। কি সর্ব্বনাশ!"

বাবাজীর কথা শুনিয়া জয়সিং কি বকিতে বকিতে চলিয়া গেল। "বাবাজীর যেমন সকলের প্রতিই দয়া! আমরা যদি তাহাকে ধরিয়া না রাখিতাম, তবে এই রাজার বিবাহ কিরূপে হইত? পূরা বদমাইস! তার জন্য আবার বাবাজীর দুঃখ?"

চক্রধর পট্টনায়ক তাঁহার বর লইয়া রাত্রি দুই প্রহরের সময় কোদণ্ড-পুর গ্রামে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি এই বিবাহ নিতান্ত গোপনে দেওয়ার উদ্যোগ করিয়াছেন বলিয়া কোন ধুমধাম করেন নাই ও সঙ্গে বেশী লোকজন আনেন নাই। মর্দ্দরাজের বাড়ীতে যাইতে হইলে একটা জঙ্গলের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। তাঁহাদের পাল্কী যখন জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন হঠাৎ কে একজন লোক আসিয়া, তাঁহাদের

মশাল কাড়িয়া নিয়া নিবাইয়া ফেলিল। তৎক্ষণাৎ আর ২০।২৫ জন লোক মার মার শব্দে আসিয়া উপস্থিত হইল, ও সেই পাল্‌কী ঘিরিয়া দাঁড়াইল। পাল্কী-বাহকগণ প্রাণভয়ে যে যে দিকে পারিল, সেই জঙ্গলের মধ্যে অন্ধকারে লুকাইল। দস্যুগণ তখন চক্রধর ও উদয়নাথকে পাল্কী হইতে জোরে টানিয়া বাহির করিল। চক্রধর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আমাদের মারিও না। আমাদের নিকট কোন টাকাকড়ি নাই। এই কাপড়চোপড় যাহা আছে তাহা তোমাদিগকে খুলিয়া দিতেছি। আমাদের ছাড়িয়া দাও।"

দস্যুদলপতি ওরফে ভীমজয়সিং বলিল, "তুমি কোন কথা বলিও না, চেঁচাইও না, চুপ করিয়া থাক। নচেৎ মারা পড়িবে। আমরা তোমার টাকাকড়ি কাপড়চোপড় কিছুই চাই না।"

ইহা বলিতে বলিতে ২।৩ জন লোক চক্রধর ও উদয়নাথের গায়ের চাদর দিয়া তাহাদের মুখ বাঁধিল ও হাত পিঠমোড়া করিয়া বাঁধিল। পরে তাহাদিগকে নিজ নিজ পাল্কীর মধ্যে বসাইয়া সেই দস্যুগণ তাহাদিগকে কাঁধে করিয়া নিয়া গেল। এতক্ষণ তাহাদিগকে হেফাজাতে রাখিয়াছিল। এখন ভীমজয়সিং তাহাদের বন্ধন খুলিয়া দিয়া বাবাজীর নিকটে তাহাদিগকে লইয়া গেল।

বাবাজীকে দেখিয়া চক্রধর কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার পদতলে পতিত হইলেন। বাবাজী তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন। কনকপুরের রাজা শোভাবতীকে বিবাহ করিতে আসিয়াছেন, ইহা চক্রধর আগেই শুনিয়াছিলেন। তাঁহার মতলব যে উড়িয়া গেল, তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না। তাঁহার চক্রান্তে পড়িয়া বেচারা উদয়নাথ যে সুখের স্বপ্ন দেখিয়াছিল, তাহা দরিদ্রের মনোরথের ন্যায় এখন তাহার হৃদয়েই লীন হইল। তাহার বরের পোষাক পরিয়া পাল্‌কী চড়াটাই কেবল লাভ হইল।

কিন্তু চক্রধর হটিবার লোক নহেন। তিনি বাবাজীর অভয়বচনে

আশ্বস্ত হইয়া, যেন কিছুই হয় নাই, যেন পূর্ব্ব হইতেই তিনি বাবাজীর সঙ্গে বরযাত্র হইয়া আসিয়াছেন, যেন তাঁহারই উদ্যোগে এই বিবাহ হইতেছে, এরূপ ভাব দেখাইতে লাগিলেন। যাহা নিবারণ করিবার সাধ্য নাই, তাহা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য! বাবাজীর অনুরোধে তিনি সূর্য্যমণিকে নানারকম প্রবোধবাক্যে বুঝাইতে লাগিলেন।

এই সকল গোলযোগে রাত্রি প্রায় ভোর হইয়া আসিল। তখন বিবাহের আয়োজন হইল। বাড়ীর ভিতর প্রাঙ্গণে বিবাহের সভা হইল। বর ও কন্যা পট্টবস্ত্র ও বিবিধ আভরণে ভূষিত হইয়া সেই বেদির উপর বসিলেন। দেশীয় প্রথার অনুরোধে নবঘনকেও বালা, হার প্রভৃতি নানাপ্রকার অলঙ্কার পরিতে হইল। যাহার এ সকল গহনা নাই, সে যখন শুদ্ধ বিবাহের সময়ের জন্য অন্যের নিকট হইতে ধার করিয়া আনিয়া তাহা পরে, তখন নবঘন তাহা পরিবেন না কেন? বাসুদেব মান্ধাতা বরের হস্তে শোভাবতীকে সম্প্রদান করিলেন। বর-কন্যার মালা বদল হইল। সেই বেদির উপরে পুরোহিত হোম করিলেন। বিবাহান্তে সেই বেদির উপরে বসিয়া বর-কন্যার মধ্যে একবার কড়ি খেলা হইল। তখন সেই নবোঢ়া কন্যার সলজ্জ-রক্তিম মুখশ্রীর ন্যায় পূর্ব্বগগণে অরুণরাগ ফুটিয়া উঠিয়াছে। সানাইয়ের তালের সহিত কোকিলের ঝঙ্কার, পাপিয়ার স্বরলহরী ও কাকের কোলাহল মিশ্রিত হইয়া এক অভিনব ঐকতানের সৃজন করিল।

পরে বরকন্যাকে অন্তঃপুরে লইয়া যাওয়া হইল। শোভাবতীর গৃহে বসিয়া বর ও কন্যার মধ্যে আর একবার কড়ি খেলা হইল। উড়িষ্যায় "বাসরঘর" নাই। বর বাহিরে চলিয়া আসিলেন।

সেই দিন অপরাহ্ণে শোভাবতীকে লইয়া নবঘন কনকপুরে চলিয়া আসিলেন। শোভাবতীর সঙ্গে একটী মাত্র দাসী গেল—সে উজ্জ্বলা।

নবম অধ্যায়।

ঋণ-পরিশোধ।

শোভাবতীর বিবাহের পর দেখিতে দেখিতে ছয় বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে নবঘনর সংসারে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

ইষ্টকোষ্ট্ রেলওয়ে লাইন কনকপুর কেল্লার মধ্য দিয়া যাওয়াতে রেলওয়ে কোম্পানির পক্ষ হইতে অনেক জমি খরিদ করা হইয়াছে। তাহাতে নবঘন একথোকে দশ হাজার টাকা পাইয়াছেন। আর রাস্তা প্রস্তুতের জন্য শালকাঠ ও পাথর বিক্রয় করিয়াও তিনি অনেক টাকা লাভ করিয়াছেন। তিনি প্রথমতঃ অভিরামের পরামর্শমতে এই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; অভিরামকেই এই সকল কার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিয়াছেন। কেবল এই কার্য্য নহে, এখন তাঁহার জমিদারী-সংক্রান্ত সকল বিষয়েরই তত্ত্বাবধানের ভার অভিরামের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। অভিরাম প্রথমতঃ কাঠের কারবারে লাভের অংশ গ্রহণ করিতেন, এখন তাঁহার মাসিক ১০০৲ টাকা মাহিয়ানা ধার্য্য হইয়াছে। অভিরামের তত্ত্বাবধানে আমলাগণের চুরি ও প্রজাপীড়ন একেবারে থামিয়াছে। নবঘন জানেন অল্প বেতনে আমলা রাখিলে, তাহাদিগকে

প্রকারান্তরে চুরি করিবার ইঙ্গিত করা হয়। তাহার ফলে, সেই সকল আমলা হয় মনিবের মাথায় হাত বুলায়, নতুবা প্রজার মাথায় বাড়ি দেয়; সুতরাং পরিণামে তাহাতে লোকসানই ঘটে। সেইজন্য নবঘন তাঁহার আমলাদিগকে বেশী বেশী বেতন দিয়া থাকেন। নবঘনর শাসনাধীনে প্রজাগণ সকলেই সুখে স্বচ্ছন্দে আছে। তিনি বেশী বেতন দিয়া ম্যানেজার নিযুক্ত করিয়া থাকিলেও আমলাদিগের কার্য্য নিজে খুঁটিনাটি করিয়া পরীক্ষা করেন। মধ্যে মধ্যে গ্রামে গ্রামে বেড়াইয়া প্রজাদিগের অবস্থা স্বচক্ষে দেখেন ও তাহাদের ওজর আপত্তি শুনিয়া তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন। খোড়দহ অঞ্চলে অনেক গ্রামে ভুমিতে জলসেচনের জন্য কূপখনন করা আবশ্যক। সে জন্য তিনি নিয়ম করিয়াছেন, রাজসরকারের ব্যয়ে প্রতি বৎসর ২০টী করিয়া কূপ খনন করা হইবে। এইরূপে ৫ বৎসরে তাঁহার এলাকার প্রতি গ্রামে এক একটী কূপ হইবে ও ক্রমে আরও কূপ সংখ্যা বাড়িবে। এই ছয় বৎসরে সদর খাজানা ও প্রয়োজনীয় খরচ পত্র বাদে জমিদারীর আয় হইতেও তাঁহার অনেক টাকা মজুদ হইয়াছে। তাহা না হইবেই বা কেন? তাঁহার জমিদারীর বার্ষিক আয় চল্লিশ হাজার টাকা, তাহার মধ্যে সদর খাজানা মাত্র ১০ হাজার টাকা বাদ যায়। উপযুক্তরূপে শাসন-সংরক্ষণ করিলে অনেক টাকা মুনাফা থাকিবার কথা। শুদ্ধ এই সম্পত্তির আয় হইতেই তিনি সমস্ত খুচরা দেনা শোধ করিয়াছেন। মোট কথা নবঘনর এখন খুব স্বচ্ছল অবস্থা। তাঁহার এই সুখসমৃদ্ধির মধ্যে একটু দুঃখের কালিমা লাগিয়া রহিয়াছে। তাঁহার মাতা চন্দ্রকলা দেয়ী স্বামীর মৃত্যুর এক বৎসর পরেই পরলোক গমন করিয়াছেন।

নবঘন আজ এক বৎসর হইল একটা নূতন বাড়ী প্রস্তুত করিয়াছেন। সেটী বৈঠকখানা ও অন্দর মহালের মধ্যস্থলে হইয়াছে। কোঠাটী দোতলা। উপর তলার মধ্যে একটী প্রকাণ্ড হল ও তাহার চারিদিকে চারিটী ঘর। সকল ঘরই নানাবিধ মূল্যবান্ আসবাবে সজ্জিত।

শোভাবতীর দুইটী পুত্র সন্তান জন্মিয়াছে, তাহাদের কলহাস্য ও ক্রীড়া-কোলাহলে এই অট্টালিকা সর্ব্বদা মুখরিত।

এখন বেলা ২টা বাজিয়াছে। শীতকাল, রৌদ্রের তেজ মন্দ হইয়া পড়িয়াছে। পশ্চিম দিকের জানালা দিয়া হলের মধ্যে রৌদ্র আসিয়াছে। সেই রৌদ্র পূর্ব্বদিকের দেওয়ালে টাঙ্গান বড় বড় ছবিগুলির উপরে পড়িয়া মেঝের উপর প্রতিফলিত হইয়াছে। হলের উত্তরভাগে দুখানা বড় তক্তপোষ, তাহার উপর গালিচা পাড়া। তাহার দক্ষিণে একখানা সিগুকাঠের বার্ণিশ করা বড় গোল টেবিল ঝক্ ঝক্ করিতেছে। তাহার চারিদিকে পাঁচখানা কৌচ ও একখানা আরাম চৌকী। টেবিলে শ্বেত-প্রস্তর ও মাটির নানাপ্রকার খেলনা ও অন্যান্য জিনিস সাজান রহিয়াছে। শোভাবতী তক্তপোষের উপরে বসিয়া একখানা চিঠি লিখিতেছেন। তাঁহার পরিধানে একখানা ঈষৎ পীতবর্ণের রেসমী সাড়ী ও নীল ফ্লানেলের একটী বডিস্। হাতে সোণার বালা, কঙ্কণ, চুড়ী ও অনন্ত; গলায় এক ছড়া মুক্তার মালা ও চিক; কানে ইয়ারিং। তাঁহার পায়ে সোণার নূপুর; তিনি এখন রাণী হইয়াছেন বলিয়া পায়ে সোণার গহনা পরিয়াছেন।

হলের দক্ষিণ ধারে একটী প্রশস্ত বারান্দা আছে। সেখানে বসিয়া দুইটী শিশু খেলা করিতেছে। বড়টীর বয়স পাঁচ বৎসর, তাহার নাম রণজিৎ ওরফে রণু। ছোটটীর নাম বেণু; সে কেবল আড়াই বছরে পড়িয়াছে। দুইটী বালকই খুব উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, উত্তম অঙ্গসৌষ্ঠব-সম্পন্ন। দুইটীরই ভ্রূ আকর্ণবিস্তৃত। বড়টীর চুল খুব ঘন, কপাল ঢাকিয়া পড়িয়াছে। ছোটটীর চুল কিছু পাতলা ও সরু, কোঁকড়া, খুব লম্বা, তাহা পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত থোপা থোপা হইয়া পড়িয়াছে। এই চুলের জন্য তাহাকে খুব সুন্দর দেখায়। এই দুইটী দিব্যকান্তি শিশু দেখিয়া বোধ হয় যেন ইহারা কোন দেবলোক হইতে নামিয়া আসিয়াছে। ঐ যে হলের দেওয়ালে টাঙ্গান একখানি বিলাতি ছবিতে দুইটী দেবশিশু

যীশুখ্রীষ্টের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদেরই ন্যায় এই শিশুদ্বয়ের মুখশ্রী হইতে নির্ম্মল পবিত্রতার আভা ফুটিয়া বাহির হইতেছে।

রণুর একখানা ধুতিপরা, গায়ে একটা কাল চেক ফ্লানেলের কোট। বেণু একটা ফ্লানেলের পেনিফ্রক্ পরিয়াছে। উভয়েরই গলায় সোণার হার ও হাতে সোণার বালা।

এখন রণু খুব গম্ভীরভাবে বসিয়া একটী গুরুতর কার্য্যে নিযুক্ত আছে। সে একখানা বেতের অগ্রভাগে এক গাছা লম্বা দড়ী বাঁধিয়া চাবুক প্রস্তুত করিয়া তাহা দিয়া ঘোড়দৌড় খেলে। অর্থাৎ কখনও নিজে ঘোড়া হইয়া সেই চাবুক দিয়া নিজের গায়ে আঘাত করিতে করিতে দৌড়ায়, আবার যখন বেণুর উপর অনুগ্রহ হয় তখন তাহার মুখে এক গাছা দড়ী দিয়া লাগাম লাগাইয়া এক হাত দিয়া ধরে ও অন্য হাতে সেই চাবুক লইয়া তাহার পিছে পিছে ছোটে। ইহাতে বেণুও নিজকে কৃতার্থ মনে করে ও হাসিতে হাসিতে ঘোড়ার মত মুখভঙ্গি করিয়া দৌড় দেয়। এখন তাহাদের সেই ঘোড়ার খেলা শেষ হইয়াছে, রণু আর একটী নূতন খেলা উদ্ভাবন করিতেছে। বেণু তাহার নিকটে বসিয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত তাহা দেখিতেছে ও তাহার মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিবার চেষ্টা করিতেছে। রণুর একখানা ছোট রেলের গাড়ী আছে, এখন সে সেই গাড়ী চালাইবে। গাড়ীখানা তাহার সম্মুখে রহিয়াছে। সে সেই চাবুক হইতে দড়ী খুলিয়া লইয়া এক টুকরা লাল কাপড় সেই বেত্রখণ্ডের সঙ্গে বাঁধিতেছে। ইহা হইবে রেলগাড়ী চালাইবার নিশান। যদি সেই রেলগাড়ী চলিতে চলিতে কোন একটা নিশান দেখিয়া না থামিল তবে সে আবার কিসের রেলগাড়ী? বেণু মনোযোগের সহিত সেই নিশানপ্রস্তুত-প্রণালী দেখিতেছে বটে, কিন্তু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া বসিয়া থাকা তাহার কোষ্ঠীতে লেখে না। সে থাকিয়া থাকিয়া সেই গাড়ী ধরিতেছে, আর রণু তাহাকে ধমক দিতেছে।

"কি ? দুষ্টু !—মা—এই দেখ্ বেণু আমার গাড়ী ভাঙ্গে !"

বেণু ভয়ে হাত টানিয়া লইতেছে। মা চিঠি লিখিতে লিখিতে চেঁচাইয়া বলিতেছেন—

"এই আমি যাচ্ছি ! দুষ্টামি ক'রো না—খেলা কর।"

কিন্তু মা বুঝেন না যে তিনি যাহাকে দুষ্টামি বলেন, বেণুর অভিধানে তাহারই মানে খেলা !

রণুর নিশান প্রস্তুত হইল। সে উঠিয়া দাঁড়াইল ও একবার সেই নিশান তুলিয়া নাড়িয়া দেখিল কেমন দেখায়। এখন সে নিশান ধরিবে কে ? যে গাড়ী চালায় সে কখনও নিশান ধরে না এটা ধ্রুব কথা। অতএব বাধ্য হইয়া বেণুকেই সেই নিশান ধরিবার ভার দিতে হইল। রণু বলিল—

"দেখ্ বেণু ! তুই এই নিশান ধরিয়া আগে আগে চল্—আমি গাড়ী চালাই। দেখিস্ খুব সাবধান !"

বেণু মাথা নাড়িয়া "হুঁ" বলিল ও প্রফুল্লচিত্তে নিশান ধরিল। দাদা তাহাকে খেলার ভাগ দিতেছে, ইহাই তাহার আনন্দের কারণ।

রণু গাড়ীর চাবি ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল ও নিজে মুখ দিয়া "পুঁ-উ-উ" শব্দ করিতে করিতে গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে চলিল। যে গাড়ীতে "পুঁ-উ" শব্দ (whistle) হয় না, সে আবার কিসের রেলগাড়ী ?

গাড়ী একটু দূরে গিয়াই থামিল। বেণু তখন নিশান ধরিয়া আছে। সে মনে করিল, গাড়ী যখন দুষ্ট ঘোড়ার মত থামিল, তখন তাহাকে আবার চালাইবার জন্য কিঞ্চিৎ প্রহার করা আবশ্যক। আর প্রহারের জন্য সেই ভূতপূর্ব্ব চাবুকই ত তাহার হাতে রহিয়াছে। সে যখন ঘোড়া হয়, ও চলিতে চলিতে থামে তখন তাহার দাদাও ত তাহাকে চালাইবার জন্য এই চাবুক দিয়া প্রহার করে। সেই চাবুকই যে এক টুকরা লাল কাপড় সংযোগে সম্পূর্ণ আর একটী পদার্থে পরিণত হইয়াছে তাহা সে

কি প্রকারে বুঝিবে? তাই গাড়ী থামিতে দেখিয়াই সে নিশানরূপী চাবুক দিয়া তাহাকে খুব জোরে আঘাত করিল। আঘাতমাত্রেই সেই গাড়ীর একটা চাকা ভাঙ্গিয়া গেল। অমনি রণু চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল ও বেণুর হাত হইতে নিশান কাড়িয়া লইয়া তাহাকে এক ঘা বসাইয়া দিল।

তখন দুইজনেরই কান্না। মা উভয়েরই কান্না শুনিয়া অন্যমনস্ক ভাবে বলিয়া উঠিলেন—

"এই বার আমি যাচ্ছি! দুষ্টু ছেলেরা! খেলা কর্‌বে, তা' না মারামারি কর্‌ছে।"

কিন্তু তিনি তাঁহার কার্য্যে এতই ব্যস্ত ছিলেন যে শীঘ্র উঠিয়া আসা তাঁহার ঘটিল না।

বেণুকে মারিয়া রণুর মনে অনুতাপ হইল। বিশেষ মা আসিয়া পাছে তাহাকে মারেন সেজন্য একটু ভয়ও হইল। তাই সে বেণুর দোষ ভুলিয়া গিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল, এবং নিজে কাঁদিতে কাঁদিতে সস্নেহে বেণুর চোখের জল তাহার নিজের কাপড় দিয়া মুছিয়া দিল। পরে এক হাতে সেই ভাঙ্গা গাড়ী লইয়া ও বেণুকে কোলে করিয়া মায়ের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল।

এবার মায়ের ধ্যানভঙ্গ হইল। তিনি বলিলেন—

"কি রে রণু! দুষ্টু সয়তান! বেণুকে মার্‌লি কেন?"

বেণুর ফোঁস্ ফোঁস্ থামিয়াছে। তাহার মুখ প্রফুল্ল হইয়াছে। তাহার নিবিড়কৃষ্ণ চক্ষুর মধ্য হইতে সকৌতুক সরলতার উজ্জ্বল আভা বাহির হইতেছে। সে বলিল—

"আমি গালি বাঙ্গ্‌লো—দাদা মারিলো।"

রণুরও তখন কান্না থামিয়াছে। সে এতক্ষণ আসামীর কাঠরায় দাঁড়াইয়াছিল। বেণুর স্বীকারউক্তি (confession)তে তাহার মোকর্দ্দমা

জিত হইয়াছে ও মাতৃ-হস্তে আর প্রহারের আশঙ্কা নাই ভাবিয়া সেই নিশানঘটিত বৃত্তান্ত মাকে বুঝাইয়া দিল।

শোভাবতী টেবিলের উপর হইতে একটা কমলালেবু লইয়া উভয়কেই ভাগ করিয়া দিলেন। তাহারা মেঝের উপর দাঁড়াইয়া লেবু খাইতে লাগিল।

এই সময়ে সিঁড়িতে খট্ খট্ করিয়া জুতার শব্দ হইল এবং নবঘন উপরে উঠিয়া আসিলেন। তিনি সেই ঘরে প্রবেশ করিয়াই হাত পা ছড়াইয়া আরামচৌকীতে বসিয়া পড়িলেন; রণু ও বেণু "বাবা—বাবা" বলিতে বলিতে তাঁহার কাছে দৌড়িয়া আসিল। রণু চৌকী ধরিয়া দাঁড়াইল, বেণু খাতিরজমা হইয়া তাঁহার কোলে উঠিয়া বসিল।

রণু বলিল—"বাবা! বেণু বড় দুষ্টু হয়েছে! সে করেছে কি, আমার গাড়ী ভেঙ্গে ফেলেছে!"

নবঘন বেণুর মুখের দিকে তাকাইলে, সে হাসিমাখা সরল-দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিল—"আমি গালি বাঙ্গলো—দাদা মারিলো।"

নবঘন একটু হাসিয়া রণুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"তুই ওকে মেরেছিস্? দেখি গাড়ী?"

রণু গাড়ী আনিয়া দেখাইল পরে বলিল—"বাবা, আমাকে কিন্তু একটা ঘোড়া কিনে দিতে হবে!"

নবঘন বলিলেন—"তুই ঘোড়ায় চড়্তে পার্বি?" "খুব পার্বো"—ইহা বলিয়া রণু সেই চাবুক হস্তে ঘোড়ার ন্যায় ট্রটে দৌড়াইতে দৌড়াইতে একবার সেই হল প্রদক্ষিণ করিয়া আসিল।

বেণু বলিল—"বাবা! আমি ঘোলা চল্বো।"

নবঘন সাদরে তাহার মুখচুম্বন করিয়া তাহাকে খেলা করিবার জন্য ছাড়িয়া দিলেন।

তাহাদের মাতা চিঠি লেখার ভাণ করিয়া এতক্ষণ নীরবে ছিলেন। নবঘন বলিলেন—

"আজ যে চিঠি লেখায় ভারি মনোযোগ? কোথায় চিঠি লেখা হচ্ছে?"

শোভাবতী মুখ ভার করিয়া বলিলেন "তোমার সে খবরে কাজ কি? তুমি নিজের কাজ দেখ গিয়ে। কাজ আর ফুরায় না?" ইত্যবসরে শোভাবতীর দোয়াতের লাল কালী ঢালিয়া বেণু দুই হাতে ও মুখে মাখিতে লাগিল। মা তাহা দেখিয়া বেণুর হাত হইতে দোয়াত কাড়িয়া নিলেন। "ছেলেটা ভারি দুষ্টু হয়েছে! একটা না একটা দুষ্টামি করা চাই!" ইহা বলিয়া তাহার গালে ক্ষুদ্র একটি কিল দিয়া তাহার মুখচুম্বন করিলেন। তাহার মুখের লালরঙ্ শোভাবতীর গালে লাগিয়া গেল।

নবঘন বলিলেন "এই বেশ হয়েছে! এতক্ষণ কথা না বলার শাস্তি!"

শোভাবতী কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন "দোষ কার—কে শাস্তি পায়?"

"কেন দোষটা আমার কিসের?"

শোভাবতী আরশিতে মুখ দেখিতে দেখিতে বলিলেন—

"তোমার কাজ পড়লে আর কিছু জ্ঞান থাকে না। এত পরিশ্রম কর্‌লে অসুখ হবে। আজ একটুও বিশ্রাম কর্‌লে না কেন?"

ইহা বলিয়া তিনি আরশি টেবিলের উপর রাখিয়া, একখানা গালিচা আসন মেজের উপর পাতিলেন এবং একখানা রূপার থালায় করিয়া নানাবিধ মিষ্টান্ন ও ফল এবং রূপার গেলাসে করিয়া জল আনিয়া দিলেন। এই গালিচা আসন শোভাবতীর নিজের হাতের তৈয়ারি। মিষ্টান্নও তিনি নিজে তৈয়ার করিয়াছেন।

নবঘন রণু ও বেণুকে লইয়া আহারে বসিলেন। তিনি একটা লেবু ভাঙ্গিয়া মুখে দিয়া বলিলেন—"বাস্তবিকই আজ খুব খাটিয়াছি। আজ একটা বড় গোলযোগ পরিষ্কার করিলাম। একটা অনেক দিনের হিসাব মিটাইলাম। রেলওয়ে কোম্পানির সহিত আমাদের যে কাঠের কারবার

চলিয়া আসিতেছে তাহাতে কত টাকা মুনাফা দাঁড়াইল, আজ তাহা ঠিক করিলাম। আজ তোমাকে একটা কথা বলিব মনে করিয়াছি।"

শোভাবতী পান সাজিতে সাজিতে বলিলেন "কি ?"

"বল দেখি কি ?"

"আমি কিছু বলিব না। যদি ঠিক না হয় তবে তুমি হাসিবে।"

"আচ্ছা, আমিই বলিতেছি—তুমি শুন। বিবাহের সময় আমি তোমার পঞ্চাশ হাজার টাকা ধার করিয়াছিলাম। এখন আমার টাকা হইয়াছে, সে টাকা পরিশোধ করিব।"

শোভাবতী বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"কি ? আমার পঞ্চাশ হাজার টাকা ? কোন কালেই আমার টাকা ছিল না।"

"তোমার বাপ তোমাকে যে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়া গিয়াছিলেন সেই টাকা।"

"সে টাকা আমার কেন ? সে ত তোমার টাকা।"

"না—সে তোমার টাকা—তোমার স্ত্রীধন।"

"স্ত্রীধন আবার কি ? স্ত্রীর ত স্বামীই ধন ? আমার স্ত্রীধন ত তুমি।"

"তবে আমাকে বুঝি তোমার গহনা গাঁটরির সামিল করিতে চাও ?"

"ঠাট্টা ছাড়। সে টাকা বাস্তবিকই তোমার।"

"তোমার বাপ তোমাকে যে টাকা দিয়া গিয়াছিলেন, তাহা আমি কেবল দায় ঠেকিয়া ঋণ পরিশোধের জন্য ব্যয় করিয়াছিলাম। এখন তোমার টাকা আবার তোমাকে দিব।"

"কি ? আবার সেই কথা ? আমি যথার্থই বলিতেছি আমি সে টাকার কোন দাবি রাখি না। আমি তাহা কোন ক্রমে গ্রহণ করিব না। আর আমার টাকা তোমার টাকা এ সব কথার অর্থ কি ? তোমার টাকা কি আমার নহে ? তোমার এই রাজগী কি আমার নহে ? আচ্ছা সেই

পঞ্চাশ হাজার টাকা যদি আমারই প্রাপ্য হয়, তবে তুমি তাহা কাহার টাকা দিয়া শোধ করিবে? যে টাকা দিয়া শোধ করিতে চাও, তাহা বুঝি আমার নয়, তোমার একলার?"

ইহা বলিয়া শোভাবতী পাণ সাজা শেষ করিয়া সোণার বাটায় করিয়া বেণুর হাতে পাণ দিলেন। নবঘন আহার শেষ করিয়া ও আচমন করিয়া চৌকীতে বসিলেন। বাটা হইতে একটী পাণ লইয়া বেণু তাঁহার মুখে দিল। তিনি বলিলেন—

"দেখ, তুমি যাহা বলিলে তাহা ঠিক। কিন্তু আমি বাবাজীর নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম যে তোমার এই টাকা আমি এক সময়ে পরিশোধ করিব। আমি লোকতঃ ধর্ম্মতঃ সেই প্রতিজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য।"

শোভাবতী বলিলেন—"আমি তাহার কিছুই জানি না, বাবাজী আর তুমি জান। কিন্তু আমি সে টাকা কোন ক্রমেই লইব না।"

"আমিও সে টাকা কোন ক্রমেই রাখিব না। মর্দ্দরাজ সান্তের অর্জ্জিত টাকায় আমার কিছুমাত্র অধিকার নাই। তাঁহার সে টাকা আত্মসাৎ করিলে আমি পাপভাগী হইব।"

শোভাবতী একটু হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ—সে টাকা বাবা যে ঠিক ধর্ম্মসঙ্গত উপায়ে রোজগার করিয়াছিলেন একথা আমিও বলিতে পারি না। তাহা গ্রহণ করিলে তোমার পাপ হইবে তুমি যদি মনে কর, তবে তুমি এক কাজ কর।"

"কি?"

"সে টাকা দিয়া, বাবার যাহাতে পরকালের কল্যাণ হয়, এ রকম একটা সৎকাজ কর।"

নবঘন হৃষ্টচিত্তে বলিলেন—"আচ্ছা বেশ, এ খুব ভাল পরামর্শ। এ কথা তোমারই উপযুক্ত হইয়াছে। আচ্ছা তুমি কি রকম কাজ করিতে বল?"

"তাহা আমি কি বলিব? বাবাজীকে জিজ্ঞাসা কর। একদিন তাঁহাকে আসিতে বল, আজ কতদিন তাঁহাকে দেখি নাই।"

"আচ্ছা তাঁহাকে কাল আসিবার জন্য আজই চিঠি লিখিয়া দিতেছি। শুভস্য শীঘ্রং—ঐ দেখ—দেখ—বেণু তোমার চিঠিখানার উপর কালী মাখিতেছে।"

শোভাবতী দৌড়িয়া গিয়া বেণুকে ধরিলেন ও "লক্ষ্মীছাড়া দুষ্টু ছেলে" বলিয়া কোলে তুলিয়া লইলেন। তিনি বলিলেন—

"চম্পাকে চিঠি লিখিতেছিলাম, চিঠিখানা নষ্ট হইল। আচ্ছা অভি-রামবাবু চম্পাকে এখানে আনেন না কেন? সে কিন্তু আসিবার জন্য ভারি ব্যস্ত হইয়াছে, কতদিন তাহাকে দেখি নাই।"

নব। আমাদের দেশের কুপ্রথা! কোন সম্ভ্রান্তকুলের মহিলার বিবাহের পর ঘরের বাহির হইবার জো নাই। এমন কি স্বামীর কর্ম্ম-স্থানেও যাইতে পারে না। তবে পারে কেবল জগন্নাথ মহাপ্রভুকে দেখি-বার জন্য পুরীতে যাইতে।

শোভা। কিন্তু অভিরামবাবু ত আর সকল দেশাচার মানেন না—এটাও না হয় না মানিলেন। ফল কথা আমার বিশেষ অনুরোধ চম্পাকে তিনি খুব শীঘ্র এখানে লইয়া আসুন।

নব। আচ্ছা, তাহার রাণীর হুকুম আমি তাহাকে জানাইব।

শুনিয়া শোভাবতী হাসিলেন। নবঘন রণু ও বেণুকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন।

পরদিন অপরাহ্ণে নরোত্তমদাস বাবাজী আসিলেন। শোভাবতী ও নবঘন তাঁহাকে সেই টাকার কথা জানাইলেন। বাবাজী বলিলেন—

"মা! তোমার এইরূপ উচ্চহৃদয় দেখিয়া আমি বড়ই আনন্দিত হইলাম। তোমার পিতার আত্মার কল্যাণের জন্য দীন দুঃখী লোকের সেবাতে এ টাকা দান করাই অতি উত্তম সঙ্কল্প।"

নব। তবে কি ভাবে দান করিলে এই কীর্ত্তিটী চিরস্থায়ী হয় তাহাই বিবেচনা করুন।

বাবাজী। বাবা! তোমার বোধ হয় মনে আছে আমরা যখন পুরীর শ্রীমন্দিরে মণিনায়ককে দেখিলাম, তখন সেই গরিব কৃষকের মুখে তাহার মহাজনের অত্যাচারের কথা শুনিয়া আমি তোমাকে বলিলাম 'বাবা! তোমার হাতে টাকা হইলে যাহাতে এই সকল গরিব কৃষকের উদ্ধার-সাধন হইতে পারে তাহার একটা উপায় করিবে'। তুমি তাহাতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলে।

"আজ্ঞে, তাহা আমার খুব স্মরণ হইতেছে এবং আমিও আমার সেই প্রতিশ্রুতি পালনের উপযুক্ত সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছি।"

"বাবা! এই তাহার উৎকৃষ্ট সুযোগ উপস্থিত। মা শোভাবতীর ইচ্ছা যে এই ৫০ হাজার টাকা তাঁহার পিতার পারলৌকিক কল্যাণের জন্য দীন দুঃখীকে দান করা হয়। আবার তুমিও ঋণভারপ্রপীড়িত দরিদ্র কৃষককুলকে উদ্ধার করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছ। আমি এরূপ একটী সদনুষ্ঠানের প্রস্তাব করিতেছি যাহাতে তোমাদের উভয়ের সাধু সঙ্কল্পেরই শুভ সম্মিলন হইবে। তাহা কি? না এই পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়া একটী কৃষিভাণ্ডার স্থাপন। বাবা! আমাদের এই নিয়ত দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িড দেশে কৃষকের চেয়ে আর দীন দুঃখী কেহ নাই! এই টাকা দিয়া একটী কৃষিভাণ্ডার স্থাপন করিলে শত শত কৃষকপরিবার ঋণ-দায় হইতে মুক্ত হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে পারিবে, এবং মুক্ত-কণ্ঠে তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবে ও মর্দ্দরাজ সান্তের কল্যাণ কামনা করিবে। ইহাতে দেশের একটা স্থায়ী মহোপকার সাধিত হইবে। অবশ্য আমাদের দেশে এবং শাস্ত্রে এই টাকাগুলি এক দিনেই কোন একটা ক্ষণস্থায়ী উৎসবে কিম্বা অনুষ্ঠানে ব্যয় করিবার ব্যবস্থা যথেষ্ট রহি-য়াছে। এবং আমাদের দেশে এইরূপ উৎসবে ও অনুষ্ঠানে লক্ষ লক্ষ

টাকা উড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু বাবা! সে গুলি হইতেছে রাজসিক ও তামসিক দান। তাহার ফল ক্ষণস্থায়ী। ২।৪ বৎসর পরেই লোকে তাহার কথা ভুলিয়া যায়। যাহা দ্বারা কোন স্থায়ী উপকার সাধিত না হয়, তাহা সাত্ত্বিক দান বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। তাই আমার মতে এই টাকা দ্বারা একটী স্থায়ী কীর্ত্তি স্থাপন করিলে তোমাদের নাম চিরস্মরণীয় হইবে, তোমরা সহস্র সহস্র লোকের কল্যাণভাজন হইবে।"

নব। আপনার যুক্তি অতি উত্তম। আপনি যাহা বলিলেন, তাহাতে আমাদের উভয়েরই সম্মতি আছে। কিন্তু এই কৃষিভাণ্ডার স্থাপনের ভার আপনাকে গ্রহণ করিতে হইবে।

বাবাজী। বাবা! আমার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। আমার সময় থাকিতে এরূপ অনুষ্ঠান হইলে আমি অতি আনন্দের সহিত ইহার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিতাম; কিন্তু এখন আর পারি না। আমার কর্ম্ম শেষ হইয়া আসিয়াছে। এখন আমার হৃদয়-বল্লভ আমাকে অতি তীব্র আকর্ষণে টানিতেছেন। আহা! শ্রুতি বলিয়াছেন "রসো বৈ সঃ"—সেই রস-স্বরূপের প্রেম-রসে একবার ডুবিলে, তিনি ভিন্ন আর কোন বস্তুই মনকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। দান, সেবা, পরোপকার, ব্রত, নিয়ম এ সকলের কিছুতেই মন থাকে না। সেই প্রেমময়ের বিরহ ক্ষণকালের জন্যও অসহ্য বোধ হয়। বাবা! সেই প্রেমময় যেমন সব বিষয়ে মহৎ অপেক্ষাও মহান্, তাঁহার প্রেমাকর্ষণও আবার সমস্ত আকর্ষণ অপেক্ষা তীব্র। অমি এখন সেই আকর্ষণে মন প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছি। আমার উপযুক্ত শিষ্য মাধবানন্দের হস্তে মঠের সদাব্রতের ভার অর্পণ করিয়া আমি এখন সেই প্রেমময় গৌরহরির অবিচ্ছিন্ন সহবাসে জীবনের অবশিষ্ট কয়েকটা দিন কাটাইব। তাই বলিতেছি আমার এখন আর অবসর নাই। আরো এক কথা বলি। এত অধিক টাকার

কারবার কোন ব্যক্তিবিশেষের হস্তে ন্যস্ত করা যুক্তিসঙ্গত মনে করি না। আমাদের দেশে কর্ত্তব্যপরায়ণ লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম।

নব। তাহা হইলে এই টাকা গবর্ণমেণ্টের হাতে দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

বাবাজী তাহাতে অভিমত প্রকাশ করিলেন। শোভাবতী রেণু ও বেণুকে আনিয়া বাবাজীর কোলে দিলেন ও তাঁহার পদধূলি লইয়া তাহাদের মাথায় দিলেন। বাবাজী তাহাদিগের মাথায় হাত বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

এই কথাবার্ত্তার পরদিনই রাজা নবঘনহরিচন্দন বীরভদ্রমর্দ্দরাজের নামে একটী কৃষিভাণ্ডার স্থাপনের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে প্রস্তাব করিয়া কালেক্‌টার সাহেবের নিকট পত্র লিখিলেন। সাহেব তাঁহার প্রস্তাব ধন্যবাদের সহিত গ্রহণ করিয়া গবর্ণমেণ্টে চিঠি লিখিলেন। এইরূপে নবঘন শোভাবতী ও নরোত্তমদাস বাবাজী উভয়েরই ঋণ-পরিশোধ করিলেন।

পরিশিষ্ট

অভিরাম রাণীর হুকুম অনুসারে চম্পাবতীকে গড়-চন্দ্রমৌলিতে আনিয়াছেন। এইরূপে রাণী ও তাঁহার সখী আবার মিলিত হইলেন।

মণিনায়ক তাহার নীলকণ্ঠপুরের বাড়ী ঘর বিক্রয় করিয়া রাজার এলাকায় আসিয়া বাড়ী করিয়াছে। নীলার বিবাহ হইয়াছে। শোভাবতী তাহাকে ভুলেন নাই। মধ্যে মধ্যে তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়া আদর করেন।

পুরীর আদালত হইতে বাড়ী ফিরিয়া গিয়াই পঙ্কজসাহুর জ্বর হয়। সেই জ্বরে ৭ দিন ভুগিয়া তিনি মরিয়াছেন। সকলে বলে জগন্নাথমহাপ্রভুর প্রসাদ ছুঁইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াতেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার উপযুক্ত পুত্র বিম্বাধরই এখন তাঁহার বিত্তবিভবের একমাত্র উত্তরাধিকারী। বিম্বাধর লম্পটস্বভাব ও নেশাখোর; সে টাকাগুলি এখনই উড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টায় আছে। কৃপণের সঞ্চিত অর্থের চিরদিনই এইরূপ সদ্‌গতি হইয়া থাকে।

সূর্য্যমণি চক্রধরের পরামর্শে সেই উদয়নাথকেই পোষ্যপুত্র রাখিয়াছেন। এখন বস্তুতঃ পক্ষে চক্রধর পট্টনায়কই মর্দ্দরাজের সম্পত্তির মালিক হইয়াছেন। সূর্য্যমণির অন্তঃকরণ এখনও শোভাবতীর প্রতি অপ্রসন্ন—ঈর্ষা ও ঘৃণায় জর্জ্জরিত।

নবঘন সেই পঞ্চাশ হাজার টাকা কৃষিভাণ্ডার স্থাপনের জন্য দান করাতে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রাজা উপাধি প্রদান করিয়াছেন। বেল্‌ভেডিয়ার প্রাসাদের এক বিরাট সভাতে মহামান্য ছোটলাট বাহাদুর

তাঁহাকে এই উপাধি-ভূষণে ভূষিত করিয়া, তাঁহার বহুবিধ গুণের ভূয়সী প্রশংসা-পূর্ব্বক অবশেষে বলেন—

"I earnestly trust that the noble example of this most enlightened and public-spirited Prince of Orissa will be followed by all Maharajas, Rajas, Zeminders and other wealthy people for the amelioration of the poor agricultural class."

উড়িষ্যার চিত্র সম্বন্ধে বঙ্গদর্শন-সম্পাদক, সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক, কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের মত—

"শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ ভারতীতে উড়িষ্যার যে সকল লোকচিত্র প্রকাশ করিতেছেন তাহা বড়ই সরস হইতেছে। লেখক উড়িষ্যাকে বেশ করিয়া জানিয়াছেন। কোন দেশে বেশী দিন বাস করিলেই যে তাহাকে জানা যায় তাহা নহে, জানিবার শক্তি অতি অল্প লোকেরই আছে। স্বদেশ স্বগ্রামকেই বা কয়জন লোকে জানে? সচেতন চিত্ত এবং সর্ব্বদর্শী কল্পনা বিধাতার দুর্লভ দান। আবার, জানিলেই জানানো যায়, না। যতীন্দ্র বাবুর জানিবার শক্তি এবং জানাইবার শক্তি উভয়েরই ভালরূপ পরিচয় পাওয়া গেছে। * *"

——বঙ্গদর্শন, (নব পর্য্যায়) বৈশাখ, ১৩০৮।

——o——

হইতে পারে নিরাকরণ করার চেষ্টা করা হইয়াছে। সে বিষয়ে গ্রন্থকার অনেকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। ইহা সামান্য প্রশংসার কথা নহে। গ্রন্থকারের ধর্ম্মানুরাগ অতীব প্রশংসনীয়। আমার বিশ্বাস এই গ্রন্থ পাঠে অনেক সন্দিহান ব্যক্তি যথেষ্ট উপকার পাইবেন। সর্ব্ব বিষয়ে গ্রন্থকারের সহিত আমার মতের মিল না থাকিলেও গ্রন্থখানি উপাদেয় হইয়াছে, ইহা না বলিয়া থাকিতে পারি না। আশীর্ব্বাদ করি গ্রন্থকার দীর্ঘজীবী হউন।"

—o—

সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও ভক্তকবি শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন মহোদয় বলেন ঃ—

"আমি আপনার "সাকার ও নিরাকার তত্ত্ব-বিচার" গ্রন্থ অভিনিবেশ-পূর্ব্বক পাঠ করিয়াছি। উহাতে আপনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহার প্রকৃত প্রতিবাদ নাই। সাকার বাদের বিরুদ্ধে যিনি যাহা ইচ্ছা বলুন, আপনার কথার খণ্ডন কেহ করিতে পারেন বলিয়া আমার ধারণা নাই। আপনি যে যথার্থ ভক্ত, সুপণ্ডিত ও সুলেখক, তাহা আপনার গ্রন্থ পড়িলেই জানা যায়। তারা মা আপনাকে নিরাময় ও চিরজীবী করুন।

তদ্‌ব্রহ্ম কীদৃক্ গুণরূপহীনং
কিং বুধ্যতে মূঢ়-ধিয়া ময়া তৎ।
রূপেণ তারা মম মা জ্বলন্তী
ধত্তে গুণান্ সা কতি বা বদেৎ কঃ॥

রূপহীন গুণহীন ব্রহ্ম যে কেমন?
কি বুঝিব? আমি মূঢ় অজ্ঞানে মগন;
আমার তারা মা সে যে রূপে আলো করে!
কে বলিতে পারে সে যে কত গুণ ধরে?

উদেতি লোকে কতিভি র্ম রূপৈঃ
সা জীব-দুঃখোদ্ধরণায় দেবী।
পশ্যন্তি তাং যন্ন তথাপি লোকাঃ
হা দুঃখমেতৎ কথয়ামি কস্মৈ ॥

এ ভবে জীবের দুঃখ করিতে হরণ,
কত রূপে সে দেবতা দেয় দরশন!
তথাপি যে লোকে তারে দেখিতে না পায়,
হায়রে! এ দুঃখ আমি জানাইব কায়?
"জয় তারা ব্রহ্মময়ী মা!"

——o——

"শকুন্তলা-তত্ত্ব" প্রভৃতি প্রণেতা, বঙ্গ-ভাষার সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক, বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের অনুবাদক শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম্. এ. বি. এল্. মহাশয় বলেন ঃ—

"এমন সুন্দর গ্রন্থ বাঙ্গালায় অতি অল্পই দেখিয়াছি। আপনার পাণ্ডিত্য, তীক্ষ্ণদৃষ্টি, তর্কনৈপুণ্য, যুক্তির সুন্দর শৃঙ্খলা ও চমৎকার বান্ধনী, ভাষা ও ভাবের ভদ্রোচিত পরিশুদ্ধতা এই সমস্ত দেখিয়া আমি কি পর্য্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছি তাহা লিখিয়া জানাইতে পারি না। এই গ্রন্থখানি লিখিয়া আপনি বাঙ্গালা সাহিত্যের গুরুত্ব ও গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

সাকার ও নিরাকার উপাসনা সম্বন্ধে আপনার যে মত, আমারও তাহাই। আপনার মত আপনি অসাধারণ দক্ষতা সহকারে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং অধিকতর দক্ষতা সহকারে আপনি নগেন্দ্র বাবুর মত খণ্ডন করিয়াছেন। * * * * * * *

* * * * বাঙ্গালার ধর্ম্মমত সম্বন্ধে লেখালেখিতে প্রায়ই গালি

গালাজ, কটূক্তি, ব্যঙ্গোক্তি প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। আপনার গ্রন্থে সে দোষ নাই দেখিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইয়াছি। এখনকার বাঙ্গালা লেখায় ভদ্রতার অতিশয় অভাব দেখা যায়। যে গ্রন্থে ভদ্রতার অভাব না থাকে, তাহা সাহিত্য ও সমাজ উভয়েরই কল্যাণকর। তাহা আদর্শ গ্রন্থ বলিয়া গণ্য। * * * *"

—o—
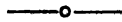
বর্দ্ধমান বিভাগের স্কুলসমূহের ইন্‌স্পেক্টর সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধানাথ রায় বাহাদুর বলেন ঃ—

আপনার "সাকার ও নিরাকার তত্ত্ববিচার" পাঠ করিয়া আমি কিরূপ প্রীতি লাভ করিয়াছি, তাহা ভাষায় ব্যক্ত হইবার নহে। পাণ্ডিত্যে এবং যুক্তিকৌশলে এ পুস্তকখানিকে বঙ্গভাষার গৌরব-স্তম্ভ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ইহা কেবল বাঙ্গালীর সম্পত্তি নহে, ভারতীয় প্রত্যেক হিন্দুর সম্পত্তি। আমি আশা করি, ইহা প্রত্যেক ভারতীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়া, প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থের গৃহ-ভূষণ হইবে।

পাশ্চাত্য সভ্যতা-প্রভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া অনেকেই একদেশদর্শী হইয়া পড়েন। ব্রাহ্মগণও এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূত। ব্রাহ্মগণের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভক্তি, এবং তাঁহাদের সহিত অনেক বিষয়ে আমার সহানুভূতি সত্ত্বেও তাঁহাদের সাকারবাদবিদ্বেষে আমি কোন কালেই সায় দিতে পারি নাই। সাকারবাদ বিরুদ্ধে তাঁহাদের যুক্তি শুনিয়া আমার মনে যে সমস্ত প্রতিযুক্তি উঠিত, তৎসমস্ত এবং তদতিরিক্ত অন্যান্য অনেক সারবান্ বিষয় আপনার পুস্তকে অতি সুন্দর এবং সুপ্রণালীক্রমে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আপনার পুস্তক হইতে আমি অনেক সদুপদেশ ও সুশিক্ষা লাভ করিয়াছি।

"গুণাঃ পূজাস্থানং গুণিষু নচ লিঙ্গং নচ বয়ঃ"—

আমা অপেক্ষা অল্পবয়স্ক হইলেও এই মহাবাক্যানুসারে আপনি সর্ব্বথা আমার পূজার্হ। আপনার পবিত্র পুস্তক এবং পবিত্র জীবন উভয়ই হিন্দুমাত্রের আদর্শ স্থানীয়।

এরূপ ক্ষুদ্র পত্রে আপনার পুস্তকের সমালোচনা সম্ভবে না। পরন্তু আমার মত লোকের পক্ষে ঈদৃশ পুস্তকের সমালোচনার প্রয়াস ধৃষ্টতা মাত্র।"

---o---

কটকের ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন্‌স্ জজ—(District and Sessions Judge) সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র, এম্. এ. বলেন :—

"I have read your book with very great pleasure, and was, therefore, a little surprised when I saw in the last issue of নব্য-ভারত some adverse criticisms against what was deemed your unduly harsh language towards the doctrine you are combating. My opinion is in general agreement with that expressed by Babu Chandra Nath Bosu. Both in matter and manner, barring what will presently be noticed, I consider your effort excellent. It has given me sincere pleasure to observe in the book a combination of earnestness, enthusiasm and close reasoning, which is really very bracing and refreshing."

* * * * *

---o---

প্রথিতযশাঃ রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ-বৃত্তিপ্রাপ্ত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্. এ. বি. এল. বলেন :—

"আপনার গ্রন্থ পাঠ করিয়া প্রচুর শিক্ষা ও আনন্দ লাভ করিয়াছি। আপনার শাস্ত্রজ্ঞান, যুক্তিকৌশল ও চিন্তাশীলতা বিশেষ ভাবে প্রশংসনীয়। আপনি বিচার করিয়া যথার্থ তত্ত্বেই উপনীত হইয়াছেন। ঈশ্বর আপনাকে দীর্ঘজীবী করিয়া স্বধর্ম্মের উন্নতি কল্পে নিয়োজিত করুন।

আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কিছু দিন পূর্ব্বে আপনার গ্রন্থ সম্বন্ধে বলিতেছিলেন যে ঐরূপ গ্রন্থ বঙ্গভাষায় তিনি অনেক দিন পাঠ করেন নাই। আমিও সেই কথার পুনরুক্তি করিতেছি।"

———o———
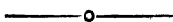
ভূতপূর্ব্ব কটক কলেজের প্রিন্‌সিপাল্ (Principal) রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ-বৃত্তিপ্রাপ্ত সুপণ্ডিত ৺ নীলকণ্ঠ মজুমদার এম্. এ. বলেন :—

"আমি আপনার "সাকার ও নিরাকার উপাসনা" পাঠ করিয়াছি। আমার বিশ্বাস যে নিরাকারের ধারণা বা উপাসনা অসম্ভব। হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে নিরাকার বা নির্গুণ জ্ঞেয় হইতে পারেন, ধ্যেয় নহেন।

*** আপনি আপনার পুস্তক রচনা করিয়া আমার ও হিন্দু সমাজের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। আপনি দীর্ঘজীবী হইয়া হিন্দু সমাজের মঙ্গল সাধন করিতে থাকুন, দেবদেবীর নিকট আমি ইহা প্রার্থনা করি।"

———o———

ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার জেনারল (Deputy Postmaster-General) "গ্রীক ও হিন্দু" প্রণেতা সুপণ্ডিত ৺ প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন :—

"আপনার পুস্তক পাঠ করিলাম। বিষয়টী যোগ্যতার সঙ্গে লেখা হইয়াছে ও ভালই হইয়াছে। কিন্তু ওরূপ বিষয়ে পুস্তক লিখিবার শ্রম স্বীকার করার প্রয়োজন অতি অল্পই। ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান আদি বিষয়ে পুস্তক লিখিলে অনেক উপকারে আসিতে পারে। উপন্যাস, পদ্য, নাটক ও ধর্ম্ম বিষয়ক পুস্তকের ছড়াছড়ি আরও কেন? যাহাতে আনুষ্ঠানিক ও কর্ম্ম [illegible] কাজে লাগে, এরূপ শ্রমই সার্থক। মৌলিক

গ্রন্থ লেখা অতি কঠিন ; সকলের ভাগ্যে তাহা না ঘটিলেও, অন্ততঃ পক্ষে ভাল অনুবাদেও অনেক কাজ হইতে পারে।"

বঙ্গভাষার প্রথিতনামা লেখক ও সমালোচক সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু এম্. এ. বি. এল্. বলেন :—

"* * * * "সাকার ও নিরাকার উপাসনা" গ্রন্থের লেখা বড় সরল। দর্শন গ্রন্থ এরূপ সরল ভাবে লেখা, এ দেশে এক বঙ্কিম বাবুর ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যতীত আর কোথাও বড় দেখি নাই। অনেক কূট দার্শনিক তত্ত্ব ইহাতে এরূপ ভাবে বুঝান আছে, যে সাধারণ পাঠক অল্প চেষ্টা করিলেই তাহা বুঝিতে পারেন। * * * *"

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের লাইব্রেরিয়ান (Librarian) রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ-বৃত্তি-প্রাপ্ত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম্. এ. বলেন :—

"* * I consider your book to be a valuable contribution to the literature of the subject and fully endorse the conclusions you have arrived at, so far as they relate to the respective merits of Brahmoism & Hiduism."

* * * *

The Hon'ble Maharajah Sir Rameswar Singh Bahadur K. C. I. E. of Darbhanga says :—

"I thank you for the book "Sakar & Nirakar Tattabichar"—that you have been good enough to present to me and which I have found extremely interesting. It must naturally be a matter of supreme gratification to every true Hindu to witness this Hindu revival which books such as yours do so much to contribute to."

বামণ্ডাপ্রদেশের মহারাজা বৈদান্তিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুচল দেব বাহাদুর K. C. I. E. এই পুস্তকের উড়িয়া ভাষাতে যে দীর্ঘ সমালোচনা করিয়াছিলেন তাহাতে বলেন "গ্রন্থখানি হিন্দুদিগের জ্ঞাতব্য বিষয়ের একমাত্র প্রয়োজনীয় স্থান।"

তাহিরপুরের রাজা শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর বলেন,—"আপনার প্রেরিত "সাকার ও নিরাকার তত্ত্ব" পুস্তকখানি যাহা গত কল্যের ডাকে পাইয়াছি তাহার কতকাংশ কল্য ও অদ্য যাহা পাঠ করিয়াছি তাহাতেই আপনাকে আমার বহু-পরিচিত বন্ধুর ন্যায় প্রিয়তম ও শ্রদ্ধেয় সুহৃদ্ জ্ঞান করিয়া আপনাকে শত শত ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

The Indian Mirror (22nd Sept. 1898) says:—

"The book before us in which the systems of Sakar and Nirakar Upasana are discussed is the outcome of much industry and thought on the part of the writer, who, by virtue of his literary attainments, is so well qualified for the task which he has undertaken, and brought to such a successful close. And it is not by sentimental utterances and academical acumen that he has accomplished his work. He has tried, by convincing proofs supplied by the Sastras, to establish the fact that the manner in which the Nirakar Upasana of the Divinity is carried on by certain religious fraternities in India, is not only not the Upasana of the Nirguna God, as enjoined in the Hindu Scriptures, but that it is Sakar Upasana for all practical purposes, and is little removed from what is called idolatry. In meeting the arguments against idolatry, and treating other cognate themes, the writer has evinced a creditable knowledge of the philosophies of the West and the East, and of the Vedas, Purans, Tantras, and other religious works

of the Hindus. What is equally to the credit of the writer is the calm and tolerant spirit which pervades the work, and the earnestness with which he has defended the Sakar system of worship, and proved the necessity of its adoption as the first step towards attainment of a knowledge of God. The book is eminently worthy of careful perusal and we would unhesitatingly recommend it to those of our countrymen who take a special interest in the subject discussed."

The AmritaBazar Patrika says :——

"A very learned refutation of Brahmoism with numerous quotations from the Hindoo Shastras."

The Indian Nation says :——

"It is learned and philosophical in its discussions, and cannot fail to bring reasoned satisfaction to the heart of Hindus. But we are afraid the author is at times too abstract and dry and has taken more elaborate notice than was necessary of the views of a certain gentleman who had declaimed against idolatry."

——o——

হিতবাদী বলেন,—"গ্রন্থকার সুপণ্ডিত, চিন্তাশীল ও ধর্ম্মানুরাগী। তাঁহার পুস্তক পাঠে বিরুদ্ধমতাবলম্বী ব্যক্তিরাও অসন্তুষ্ট হইবেন না।"

বঙ্গবাসী বলেন,—* * * "শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বড়ই উপযুক্ত সময়ে তাঁহার সাকার ও নিরাকার তত্ত্ববিচার গ্রন্থের প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার এ মধ্যস্থতা সার্ব্বজনীনরূপে অবিসংবাদিত না হইলেও, তাঁহার এ অধিকার-শালিতায় আমাদের কিছু কিছু বক্তব্য থাকিলেও তাঁহার এ প্রয়াস সর্ব্বথা সাধু। যুক্তির ক্ষুরধারে তিনি প্রতিপক্ষের সিদ্ধান্ত খণ্ডীভূত করিয়া, সাকার উপাসনার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার এ চেষ্টার কিয়দংশে সফলতা দেখিলেও, আমরা পরমপ্রীতি লাভ

করিব। তিনি বুদ্ধিমান, বিদ্বান্, বিচক্ষণ, বিচারবুদ্ধিশালী এবং শাস্ত্র-দৃষ্টি-সম্পন্ন। ডেপুটী কালেক্টরীর গুরুভার কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও তিনি এই গ্রন্থে যে স্বধর্ম্মানুরাগের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বস্তুতই বড় সন্তোষ-জনক। এই গ্রন্থের পত্রে পত্রে,—অক্ষরে অক্ষরে,—তাঁহার জীবন্ত ধর্ম্মবিশ্বাসের যে প্রাণতোষণ অন্তঃপ্রবাহ, নিঃশব্দ ফল্গু-স্রোতের ন্যায় স্থির লক্ষ্যে প্রবাহিত হইতেছে, তাহা বস্তুতই বড় আনন্দদায়ক।"

নব-বিধান পত্রিকার সম্পাদক, সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-প্রচারক ও সুলেখক শ্রীযুক্ত চিরঞ্জীব শর্ম্মা বলেন,—

"* গ্রন্থকার স্বদেশীয় এবং বিদেশীয় শাস্ত্রপ্রমাণ, চিন্তাশীল সূক্ষ্ম বিচার এবং সুযুক্তিসহকারে গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার বুদ্ধিমত্তা, বিচার-নৈপুণ্য, যত্ন, অধ্যবসায় এবং গভীর দর্শনের যথেষ্ট নিদর্শন আছে। হিন্দু-শাস্ত্রের মূল তাৎপর্য্য যদি সংক্ষেপে কাহারো জানিবার ইচ্ছা থাকে, তিনি এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন।

হিন্দুরঞ্জিকা বলেন,—"যতীন্দ্র বাবু এই পুস্তকখানি লিখিয়া একটী মহৎ কার্য্য করিয়াছেন। হিন্দুসমাজে আজকাল এইরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার আবশ্যক। ইহাতে সাকার উপাসনার আবশ্যকতা অতি উৎকৃষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। আমরা আশা করি এই পুস্তকখানি হিন্দুমাত্রেই পাঠ করিয়া দেখিবেন। সাকার উপাসনার আবশ্যকতা যতীন বাবু যেমন বুঝিয়াছেন, যদি সকলে এইরূপ বুঝে, তাহা হইলে এক দিন হিন্দুসমাজ আবার সোৎসাহে মস্তকোত্তোলন করিবে আশা করা যায়।"

এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ বলেন,—

"এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া একান্তই প্রীতিলাভ করিয়াছি। গ্রন্থকার

আর্য শাস্ত্রের মাহাত্ম্য অতি সুস্পষ্টরূপে হৃদ্গত করিতে না পারিলে এরূপ সুচা রূপে ই হ. দেখাইতে পারিতেন না। ভাল মনে অনেক যত্ন করি , ক পড়িয়া ও বুঝিয়া এই গ্রন্থখানি বিরচিত করিয়াছেন।"

* * *

হিন্দু পত্রিকা বলেন,— "* যতীন্দ্র বাবু গ্রন্থখানির জন্য খাটিয়াছেন ভগবৎকৃপায় তাঁহার এ শ্রমও নিষ্ফল হইবে না, ইহাই আমাদের বিশ্বাস হইয়াছে। পাশ্চাত্য দর্শন ও আর্য্য-শাস্ত্র ম া করিয়া ইনি উপাসনা-তত্ত্ব-বিষয়ে যে সিদ্ধান্তামৃত উদ্ধার করি-ছেন, তাহা নব্য শিক্ষিত সমাজ আস্বাদন করিয়া আনন্দিত ও উপকৃত ন, ভগবচ্চরণে আমাদের এই প্রার্থনা। হিন্দু পত্রিকার সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় সন্দর্ভখানির সম্যক্ আলোচনা সম্ভাবিত নহে। ফলে ব্রাহ্ম সমাজের মত ও নগেন্দ্রবাবুপ্রমুখ নিরাকারবাদী লেখকগণের যুক্তিতর্ক খণ্ডন সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য নাস্তিক্যবাদ নিরসনপূর্ব্বক ভারতের সিদ্ধ র্ষিসেবিত সাকারোপাসনা-তত্ত্ব গ্রন্থখানিতে সুন্দর প্রতিপাদিত হই ছে। * * * *"

ন্যব্যভ রত বলেন,— "* * * এ পুস্তকে তাঁহার যে মৌলিক চিন্তা, গভীর ান ও গবেষণার পরিচয় রহিয়াছে, তাহা এ দেশে বড়ই দুর্ল পুস্ র ভাষা সরল, সহজ, মধুর এবং পরিশুদ্ধ। আমরা তাঁহ নিকট শেষ কৃতজ্ঞ। আমাদের বিশ্বাস, এ পুস্তক সর্ব্বত্র আদৃত হই বিধ গ্রন্থকারকে আশীর্ব্বাদ করুন।* * * * *"

চট্ট াম কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল্ (Principal

Chittagong College) দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিচন্দ্র রায় এম্. এ. বলেন,—

"I had long felt the want of a work of the kind you have produced and was therefore mightily pleased to find that the gauntlet thrown at Hinduism by our misguided friends the so-called Brahmos was at last taken up by you. Very naturally therefore I went through the book with avidity and was most agreeably surprised to find that my views on almost all the important questions of religion were identical with yours. This is all the more to be wondered at in as much as your line of study has been, I presume, some-what different from mine. The manner in which you have dealt with the various abstruse questions reflects great credit on you and the Hindu community has reason to be grateful to you for yuor able championship. The insight you have displayed into some of the obscure corners of the most metaphysical of all religions is hardly to be met with in any one else of your age. What is often nare in controversial works of the kind in question is good taste & moderation. But in this respect too you have set an example worthy of the religion you profess.

———o———

বাহুল্য ভয়ে অন্যান্য মতামত উদ্ধৃত করা গেল না।

———o———